
মৈত্রীর সেতু
দেব
সম্পাদনা ঃ দিলীপ দাস



সংকলক দিলীপ দাম কর্মচারী তথা গণ-আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী। জন্ম ১৯৩৫ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার গোলগাঁও গ্রামে। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে গ্রামের স্কুল থেকে ১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেই চাকুরীর সন্ধানে আসেন আগরতলায়। যুক্ত হন সাপ্তাহিক 'সেবক'-পত্রিকার সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে প্রথমে নির্বাচন দপ্তরে এবং পরে জেলা জর্জ কোর্টে চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরিতে প্রবেশ করার পর কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতির নেতৃত্বের আসনে চলে আসেন।

চাকুরিরত অবস্থায় ১৯৬৬ সালে প্রাইভেটে প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় পাশ করেন। ইতিমধ্যে মা-বাবা ভাইবোন সহ ১০ জনের পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে আগরতলায় চলে আসায় একদিকে প্রচণ্ড পারিবারিক আর্থিক চাপ এবং অন্যদিকে দুর্বার কর্মচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় উচ্চশিক্ষার আশা ছেড়ে দিতে হয়। কর্মচারী সমিতির মুখপত্র 'আমাদের কথা'-র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ৩৬ বছর। তিনি ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি'র সভাপতি এবং 'ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)'-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মচারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে তাঁকে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থাকালে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারায় চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল । বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সাসপেনশন, শাস্তিমূলক বদলি, পদাবণতি ইত্যাদি আক্রমণের শিকার হতে হয়। ১৯৯৫ সালে তিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরার গণ আন্দোলন ও সরকারী কর্মচারী সমিতি' শীর্ষক বইটি পাঠক মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত।



দশরথ দেব

জন্ম : ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ মৃত্যু : ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৮

মৈত্রীর সেতু

দশরথ দেব

সম্পাদনা

দিলীপ দাম

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
আগরতলা, ত্রিপুরা

MAITRIR SETU DASARATH DEB
By
Dilip Dam

প্রথম প্রকাশ
আগরতলা বইমেলা
ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১
ফোন : (০৩৮১) ২৩২ ৬৩৪২ / ২৩২ ৩৭৮১

প্রচ্ছদ
অপরেশ পাল

আলোকচিত্র
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, মঞ্জুলা দেববর্মা,
দীনমালা দেববর্মা, রবিন সেনগুপ্ত ও বিজন বণিক

মুদ্রণ
এস ডি প্রিন্টার্স
৩২ এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
১৬ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : (০৩৩) ২৩৬০ ৪৯৮১

ISBN : 81-8266-070-X

মূল্য : একশো পঞ্চাশ টাকা

নতুন প্রজন্মের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের
কর্মীদের উদ্দেশে

সংকলকের কথা

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, গণমুক্তি পরিষদের আজীবন সভাপতি, জাতি-উপজাতি মানুষের ঐক্যের জ্বলন্ত প্রতীক, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী, সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড দশরথ দেব ১৯৯৮ সনের ১৪ই অক্টোবর প্রয়াত হয়েছেন।

রাজ্যের আপামর জনগণের প্রিয় নেতা, জাতি উপজাতি জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক কমরেড দশরথ দেব প্রয়াত হবার পর এবং তাঁর জীবদ্দশায়ও সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর বৈচিত্র্যময় সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পত্র পত্রিকায় তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ কমরেড দশরথ দেবের জীবনের বহুমুখী ঐতিহ্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান প্রজন্মের কর্মীদের কিছুটা ধারণা দেবার লক্ষ্যে বর্তমান সংকলন প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এটা প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের জীবনী নয়। তাঁর বহুমুখী সংগ্রামী জীবনের কয়েকটি দিক মাত্র এই সংকলনে ফুটে উঠেছে। এই সংকলন অতীত দিনের গৌরবময় গণতান্ত্রিক তথা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দিতে সাহায্য করবে বলে আশা রাখি।

রাজ আমলে এই রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে, উপজাতি ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রাজন্য শাসনের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমরেড দশরথ দেব ছিলেন অগ্রণী যোদ্ধা ও সেনাপতি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সামন্ত রাজাদের রুদ্ররোষ উপেক্ষা করে রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যুগান্তকারী জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং উপজাতি জনসমাজে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেবের আত্মপ্রকাশ। ত্রিপুরার গণসংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত লড়াকু সংগঠন উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের তিনিই অন্যতম প্রধান স্থপতি — আজীবন সভাপতি।

আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে একটি অসীম প্রেরণাদায়ক অধ্যায় যুক্ত হয়ে আছে কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৯৪৮-৫০)। এই সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেব এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ত্রিপুরার উপজাতি জনজাগরণের সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ ত্রিপুরার রবিন হুড, জনমানসে তুফান তোলা নায়ক কমরেড দশরথ দেব কিভাবে উপজাতি জনগণের একান্ত আপনজন ও মুকুটহীন রাজা হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সকলের রাজা, কিভাবে পরিণত হয়েছিলেন কিংবদন্তি পুরুষে, কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রবাদপ্রতিম জননেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন

তা জানার দুর্নিবার আকর্ষণ নিয়েই পাঠকগণ এই পুস্তকে মনোনিবেশ করবেন এটাই বিশ্বাস করি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও এই সংকলন একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলেও আশা রাখি।

আত্মগোপন অবস্থায় মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে কিভাবে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সারা দেশকে অবাক করে দিয়ে তিনি লোকসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তার লোমহর্ষক কাহিনী আছে বিভিন্ন লেখায়। কিভাবে তিনি রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষকে মার্কসবাদ- লেনিনবাদের শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে শ্রেণীসংগ্রামে ও গণ-সংগ্রামে একজোট করেছিলেন তার চমকপ্রদ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে সংকলনের বিভিন্ন লেখায়, প্রবন্ধে।

এই সংকলন প্রকাশে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'গণশক্তি', 'আজকাল' এবং আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি দেশের কথা', 'দৈনিক সংবাদ' এবং 'পূর্বাভাস' সাময়িক পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এইসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আলোকচিত্র সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন প্রয়াত দশরথ দেবের কন্যা মঞ্জুলা দেববর্মা, পুত্রবধূ দীনমালা দেববর্মা, রাজ্যের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক রবীন সেনগুপ্ত, আলোক চিত্রশিল্পী বিজন বণিক এবং তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই বইটি প্রকাশে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা দীনেশ দেববর্মা, 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার সম্পাদক গৌতম দাশ প্রমুখ। ডেইলি দেশের কথার সম্পাদক গৌতম দাস নানাভাবে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রুফ সংশোধনের কাজে ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা লেখক দিলীপ চৌধুরী। তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে লেখা লেখকদের প্রবন্ধগুলো কোনরকম পরিবর্তন না করে হুবহু ছাপা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রেও কোন রকম পরিবর্তন করা হয়নি।

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী বইটি প্রকাশ করার পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সংস্থার সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশক সহ এই সংস্থার সকলের আন্তরিক প্রয়াস ও উদ্যোগ ছাড়া সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যে সমস্ত বন্ধু ও সংগ্রামী সাথী বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দিলীপ দাস

আগরতলা
২৩শে জানুয়ারি, ২০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগ্রণী নায়ক এবং জাতি-উপজাতি মৈত্রীর সেতু রচনার কুশলী স্থপতি ত্রিপুরার ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের নিকট ত্রিপুরাবাসী ও গণতন্ত্রপ্রেমী দেশবাসীর ঋণ অনেক। এই বই প্রকাশের মধ্যে নিহিত রইল সেই ঋণেরই আংশিক পরিশোধের প্রয়াস। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকমাত্রেই সংকলনটির নানাবিধ রচনার মধ্যে খুঁজে পাবেন 'ত্রিপুরার রবিন হুড' এই কিংবদন্তি নায়কের জীবনের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

মহৎ ব্যক্তির জীবনকাহিনী ও চারিত্র্য পরিচয় আমাদের সর্বদাই উজ্জীবিত করে এবং কল্যাণকর্মে প্রেরণা জোগায়। আমাদের প্রত্যাশা, এই সংকলনটির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবেনা।

আগরতলা

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬



১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আত্মগোপন থাকা অবস্থায়
দশরথ দেব লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে
দিল্লীতে পৌঁছান। দিল্লীতে সাংসদ হিসাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।



১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পার্লামেন্টে আত্মপ্রকাশ করে আগরতলায় ফিরে
আসার পর সেন্ট্রাল রোডে পার্টি অফিসে জয়ের মালা গলায় দশরথ দেব ও বীরেন দত্ত।



১৯৫৮ মস্কো লেনিন স্কোয়ারে
সস্ত্রীক দশরথ দেব



মস্কোতে লেনিন মুসোলিয়ামে
সস্ত্রীক দশরথ দেব



১৯৫৮ সোভিয়েত রাশিয়ায় সেন্ট পির্টাসবাগ
গীর্জার সামনে সস্ত্রীক দশরথ দেব



১৯৫৮ সালে মস্কোতে
সস্ত্রীক দশরথ দেব



৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮- শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দশরথ দেবকে শপথ বাক্য
পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল এল পি সিং



৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর
রাজভবনে রাজ্যপাল এল পি সিং-এর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেবসহ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ



১৯৮৩ইং নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের পর রাজভবনে
রাজ্যপাল এস এম এইচ বার্নির সঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবসহ মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ।



১০-৪-৯৩ইং তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিচ্ছেন দশরথ দেব। শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি।



১০ এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং - দশরথ দেবের নেতৃত্বে তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের পর রাজভবনে রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডির সঙ্গে মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ।



১৯৯৩ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের পর রাজভবনে রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডির সঙ্গে সস্ত্রীক দশরথ দেব।



১৯৯৩ - স্পেশাল আর্মড ফোর্স-এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। পাশে আছেন শ্রী সমর চৌধুরী।



চার মুখ্যমন্ত্রী। ১০-৪-৯৩ দশরথ দেবের নেতৃত্বে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, প্রাক্তন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী, সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক মানিক সরকার।



১১-৪-৯৩ আগরতলা আস্তাবল ময়দানে বামফ্রন্টের বিজয় সমাবেশে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী, পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, পঃ বঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান বিমান বসু।



প্রয়াত কমরেড দিগ্বিজয় ভট্টাচার্যের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব



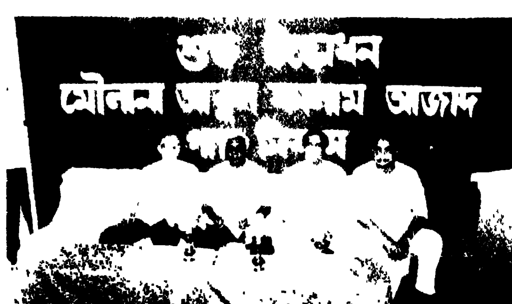
১৪-১২-৮৫ ইং - টি জি ই এ -র নবনির্মিত কেন্দ্রিয় অফিস উদ্বোধন করছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব।



১৪-১২-৮৫ইং - টি জি ই এ-র নবনির্মিত অফিস ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব



১৯৯৪- রাজ্যপাল রমেশ ভান্ডারী ও মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব



অফিস লেনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পান্থ নিবাসের উদ্বোধন। বাঁ দিক থেকে দশরথ দেব, সমর চৌধুরী, ফয়জুর রহমান ও সহিদ চৌধুরী



১৯৯৪- উমাকান্ত ময়দানে
শিশু উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব



মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের
শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব, পাশে শিক্ষামন্ত্রী
অনিল সরকার



খোয়াই পদ্মবিলে কুমারী-মধুতী-রূপশ্রী
শহীদ দিবস- '৯৪ উদযাপন অনুষ্ঠানে
বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব।
পাশে বসে আছেন অঘোর দেববর্মা ও
বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা



১১-১৪ ফেব্রুয়ারী, ৯৪ইং আগরতলা টাউন
হলে টি জি ই এ-র ৪১তম রাজ্য সম্মেলন
উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব ।



৪-৭-৯৫ দিল্লীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব



১৯৯৫- ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব। পাশে উপবিষ্ট রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ, চেয়ারম্যান মংসাজাই মগ, মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা



এন এল এফ টি সদস্যের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান



কুমারী-মধুতী-রূপশ্রী দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

বিষয়সূচী

সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক কমরেড দশরথ দেব

জ্যোতি বসু



মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অবিচল আস্থা, জনগণের প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা, যে কোন সমস্যার মুখে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখা ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য তিনি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। কমরেড দেব ছিলেন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। ত্রিপুরায় সমস্ত রকম অবিচার, নিপীড়ণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে কমরেড দশরথ দেব দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন বিরাট মাপের কমিউনিস্ট নেতার যে গুণাবলী থাকা দরকার সে-সব তাঁর ছিল। তাঁর জীবন ও কর্মধারার নানাদিক আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমাদের দু'জনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি আমার শরীর ও স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন। আমিও তাঁর খোঁজখবর রাখতাম।

বরাবরই তিনি পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি অন্যতম স্থপতি। ত্রিপুরায় সি পি আই (এম)-কে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার মনে আছে, নৃপেন চক্রবর্তী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হবার পর ত্রিপুরায় পার্টির মধ্যে ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য তিনি অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনগণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ছিল বলেই তিনি কখনই এমন কোন সিদ্ধান্ত নেননি যাতে জনগণের ক্ষতি হতে পারে।

মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি অবিচল আস্থা, জনগণের প্রতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা, যে কোন সমস্যার মুখে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখা ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য তিনি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। কমরেড দেব ছিলেন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। ত্রিপুরায় সমস্ত রকম অবিচার, নিপীড়ণ, বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

এই মুহূর্তে তাঁর সম্পর্কে আমার অনেক কথাই মনে পড়ছে। এক সময় তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার পাহাড়ী এলাকাগুলি নিবিড়ভাবে ঘুরেছি। তাঁর জন্যই সেখানকার উপজাতি মানুষজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি তাঁদের আশা-আকাঙক্ষা সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলাম। আর দেখেছিলাম সেখানকার উপজাতি জনগণের মধ্যে কমরেড দশরথ দেবের বিস্ময়কর যাদুকরী প্রভাব।

ত্রিপুরায় উপজাতি ও অনুপজাতি জনগণের মৈত্রীবন্ধনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর

অবদান অনস্বীকার্য। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান প্রগতিশীল মানুষের মনে আশা-ভরসা জাগিয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কমরেড দেব উগ্রপন্থী শক্তির মোকাবিলায় ও রাজ্যের মানুষের কল্যাণে যে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে গেছেন তা অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবনাবসানে আমাদের পার্টি এবং দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হলো। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নেবার অনেক কিছুই আছে এবং সেটাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে ভালো পথ।

আমি বিস্মিত হই, দশরথ দেব কিভাবে ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতি এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অনুপ্রাণিত হলেন। কারণ ঐ সময় সামন্তপ্রভুদের ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলতো সবসময়। অশিক্ষা অত্যাচার বঞ্চনার মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি কিন্তু সেদিন মানবমুক্তির অভ্রান্ত নিশানা খুঁজে পেয়েছিলেন। আসলে জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁকে আলোড়িত করেছিল। জনগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ থেকেই তিনি সাহস অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাই এই সংবেদনশীল অথচ ইস্পাতদৃঢ় মানুষটি অকুতোভয়ে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে সারাজীবন উৎসর্গ করে গেছেন এবং রেখে গেছেন সংগ্রামের বিজয়ের উজ্জ্বল গৌরবগাথা। আমাদের তরুণরা নিশ্চয় তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হবেন। চারের দশকের গোড়ার দিকে ত্রিপুরার বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ যুবক অনুভব করেন যে, উপজাতি জনগণকে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ করতে হবে এবং সেই অধিকার অর্জন করার জন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ কাজে প্রথমেই চাই শিক্ষা ও চেতনার প্রসার। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ যুবকেরা ত্রিপুরায় ১৯৪৫ সালে গঠন করেন জনশিক্ষা সমিতি। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন ঐ সাহসী ও দূরদর্শী যুবকদের অন্যতম এবং অবশ্যই অগ্রগণ্য। এখান থেকেই ত্রিপুরার রাজার শোষণ, নিপীড়ণের বিরুদ্ধে উপজাতি জনগণের একজোট হওয়া এবং সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠে মুক্তি পরিষদ। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে মুক্তি পরিষদ। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনের নাম হয় ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, দশরথ দেব যার আমৃত্যু প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজার সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড দেব। সেই সময়কার বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের বহু কাহিনী এখনও পাহাড়ী এলাকার জনপদগুলিতে মুখে মুখে ফেরে। এই লড়াই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে কমরেড দেবকে।

এই লড়াই এবং জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাবের ফলেই কমরেড দশরথ দেবের মনে কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন কমরেড দশরথ দেব এবং গণমুক্তি পরিষদের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। ১৯৫১ সালে তিনি সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে যান। ১৯৫২ সালে তিনি প্রথম লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সাংসদ হন। তিনি চার বার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে ভাগ হবার পর তিনি যোগ দেন সি পি আই (এম) দলে। ১৯৬৪ সালে পার্টির সপ্তম কংগ্রেস থেকেই তিনি সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। ষোড়শ কংগ্রেসে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অবসর নেন।

ত্রিপুরায় ১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কমরেড দশরথ হলেন শিক্ষামন্ত্রী এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট্র সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৯৩

সালে তিনি ত্রিপুরার তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক।

জনগণ ও তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তিনি ছিলেন একাত্ম। মানুষকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন বলেই তিনি তাঁদের সমস্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে পারতেন। আর সমাধান-সূত্র তৈরি করার সময় তিনি কখনোই ভাবাবেগ বা সংস্কারবোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদে তাঁর আস্থা ছিল অটুট অবিচল। সারাজীবন তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শ ও পার্টি-শৃঙ্খলার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি পার্টির মধ্যে যৌথ কর্মপদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। বিরাট মাপের নেতা ছিলেন তিনি। প্রশাসনের উচ্চতম পদেও ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোন দিনই আত্মম্ভরী হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন সহজ-সরল অকৃত্রিম নিরহঙ্কার। কথায় ও কাজে তাঁর ফাঁক ও ফাঁকি ছিল না। তাঁর এই চমৎকার গুণটি আমাকে বরাবর টেনেছে। তিনি ছিলেন সব অর্থেই সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন, তাঁদের প্রাণের রাজা, মুকুটহীন রাজা।

মনে রাখতে হবে ত্রিপুরার কৃষক আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

কমরেড দশরথ দেব অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত ত্রিপুরার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সংগ্রামে, শিক্ষার প্রসারে, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সংগ্রামের ও জনগণের চেতনার বিকাশে ধারাবাহিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি তাঁর কর্মময় ও আত্মোৎসর্গের জীবন আমাদের নিশ্চয় অনুপ্রাণিত করবে। আজ ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। ত্রিপুরার বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হাজির হয়েছে। এই মুহূর্তে এই চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলা করেই কমরেড দশরথ দেবের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হবে। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন জনগণের সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। সে কারণেই তিনি আমাদের মধ্যে বরাবর বেঁচে থাকবেন। ●

' ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



১৯৯৭ — টাউনহলে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

কমরেড দশরথ দেব ঃ মৃত্যুঞ্জয়ী এক কিংবদন্তি



হরকিষেণ সিং সুরজিৎ

পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের পিছনে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিশাল সংখ্যায়। আর কমরেড দশরথ দেব, কমরেড বীরেন দত্ত ও নৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা।

১৩ই অক্টোবর ('৯৮) আমি নয়াদিল্লি ফিরেছিলাম কলকাতায় পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের কাজ সেরে। ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ ই অক্টোবর সকাল ৬-৩০ মিনিটে টেলিফোনে পেলাম গভীর বেদনার এক সংবাদ — কমরেড দশরথ দেব আর আমাদের মধ্যে নেই। ত্রিপুরার উপজাতি ও অনুপজাতির প্রবাদপ্রতিম নেতা ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। কিন্তু ঐদিন ততক্ষণে কলকাতাগামী প্রথম বিমানটি চলে গেছে। তাই আমি পরদিন আগরতলার উদ্দেশে গুয়াহাটিগামী বিমানে চাপলাম। কিন্তু গুয়াহাটি থেকে আগরতলার মধ্যে যাতায়াতকারী বিমানটি আবার আড়াই ঘণ্টা দেরি করে ছাড়লো। তখন বেলা ১২টা। ফলে আগরতলায় আমি পৌঁছাই দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে। বিমানবন্দর থেকে আমি সরাসরি কমরেড দশরথ দেবের গ্রামে চলে যাই। যেখানে ইতিমধ্যে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য বিমান বসু ও অনিল বিশ্বাস, পার্টির আসাম রাজ্য সম্পাদক হেমেন দাস এবং আরও কয়েকজন নেতা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে আগরতলা পৌঁছে গিয়েছিলেন।

জনগণের প্রিয় নেতা

কমরেড দশরথ দেবের জীবনাবসানের খবর আমাদের সকলের কাছেই এবং সামগ্রিকভাবে গোটা পার্টির কাছেই গভীর বেদনার। যে সব নেতা আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস তাঁদের অন্যতম হলেন কমরেড দশরথ দেব। আমরা সকলেই জানি তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন। জীবনের শেষ ক'দিন তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তবুও আমরা আন্তরিকভাবে আশা করেছিলাম, তিনি নিশ্চয় পার্টি ও আন্দোলনের জন্য যতটা সম্ভব কাজ করতে পারবেন। কিন্তু তা আর হলো না। পার্টি কংগ্রেস সমাপ্ত হবার তিনদিন পরেই তাঁর জীবনাবসান হলো।

কমরেড দশরথ দেব যে জনগণের কতটা শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তা অনুধাবন করা যায় যখন

আমরা দেখি, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যই তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে উপজাতি ও অনুপজাতি মানুষের অবিরাম স্রোত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে। এই জনস্রোতে ছিলেন সব অংশের মানুষ - - শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, শিক্ষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী। শুধু রাজধানী আগরতলা নয়, আশেপাশের এলাকাগুলি থেকেও আবাল বৃদ্ধ বনিতা এসেছিলেন কমরেড দশরথ দেবের প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে। বৃষ্টির মধ্যেও অসংখ্য মানুষ ঐ জায়গা ছেড়ে যাননি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কার্যত সবাই বাড়ি ছেড়ে এসেছিলেন।

পরের দিন কমরেড দশরথ দেবের মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় রামচন্দ্রঘাটের কাছে তাঁর নিজের গ্রাম আমপুরায়। এই শেষ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন হাজার-হাজার পার্টিকর্মী সমর্থক ও জনগণ। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় খোয়াইয়ের আমপুরা গ্রামে। তাঁর নিজের গ্রাম বলেই নয়, তাঁর এই শেষ ইচ্ছার পিছনে মূল কারণ ছিল ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমা বরাবরই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। এই খোয়াই মহকুমারই একটি গ্রাম হলো আমপুরা। সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হওয়ার পর শেষ যাত্রা পাহাড়ী পথ পেরিয়ে ঐ গ্রামে পৌছায় বিকালে ৩-১৫ মিনিট নাগাদ। পুরো রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ৯৬ কিমি। এই শেষ যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পার্টি নেতৃবৃন্দ। পথিমধ্যে মরদেহ খোয়াই মহকুমার সদর শহরেও রাখা হয়েছিল। সেখানে অগণিত মানুষ তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

আগরতলা থেকে আমপুরা পর্যন্ত ৯৬ কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য মানুষ আবেগ-বিহ্বল অবস্থায় সারিবদ্ধ হয়ে তাঁদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। অনেক জায়গায় মরদেহবাহী বিরাট কনভয়কে জনতার অনুরোধে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়। শোকার্ত গ্রামবাসীদের বুকভাঙা কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে যখন কমরেড দশরথ দেবের মরদেহ গ্রামে পৌছায়।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই মানুষ সেদিন কমরেড দশরথ দেবের প্রতি ভালোবাসায় আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। কমরেড দশরথ দেব সাধারণ মানুষের যে কত আপনজন ছিলেন তার প্রতিফলন ঘটেছে সেদিন। ত্রিপুরার জনগণের কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ কমিউনিস্ট, যিনি পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম করে গেছেন, নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

প্রথম জীবন

১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাটের কাছে আমপুরা গ্রামে এক সাধারণ উপজাতি পরিবারে কমরেড দশরথ দেবের জন্ম। খোয়াই সরকারি বিদ্যালয়ে তাঁকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। সেখান থেকেই ১৯৪৩ সালে তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরেই তিনি বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে সেই কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন।

তাঁর কলেজ জীবনেই গঠিত হয়েছিল জনশিক্ষা সমিতি। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। প্রথম থেকেই এই জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হন কমরেড দশরথ দেব।

নিপীড়িত-অনগ্রসর উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য এই সীমিত উদ্যোগকেও ত্রিপুরার তৎকালীন রাজা ভালো চোখে দেখেননি। কঠোর হাতে তিনি এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না। সংলগ্ন কুমিল্লা জেলাতে সে সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভালো প্রভাব ছিল। দেশবিভাগের পরে ত্রিপুরা জমিদারির একটি বড় অংশ সহ ঐ কুমিল্লা জেলা পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুমিল্লা জেলাতে ততদিনে আমাদের প্রিয় কাকাবাবু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ পার্টির কয়েকটি শাখা তৈরি করে ফেলেছেন। সমগ্র এলাকায় পার্টির বিকাশ ঘটাতে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্ত ছিলেন ঐ এলাকায় পার্টির নেতৃস্থানীয় সংগঠক। সে সময়ে জনশিক্ষা সমিতি কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সংগঠন ছিল না। তবু পার্টি সমর্থন করত সমিতিকে। ত্রিপুরার তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী সমিতির সঙ্গে পার্টির এই যোগাযোগ সম্পর্কে ভালোই অবহিত ছিল। তাই সেই জায়গায় পার্টি শাখাকেও আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছিল। কমরেড দশরথ দেব সহ সমিতির বেশির ভাগ নেতাকেই তখন আত্মগোপন করতে হয়েছিল।

এই সময়েই ১৯৪৮ সালে তৈরি হয় গণমুক্তি পরিষদ, যার সভাপতি হন কমরেড দশরথ দেব।

গণ জাগরণের পর্ব

১৯৪৮ সালেই কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কংগ্রেসে পার্টি গণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জঙ্গী পথ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গোটা দেশেই গণ আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। আমাদের দেশ সে সময়ে একের পর এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন, বাংলার তেভাগা আন্দোলন, সুর্মা উপত্যকার সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রের ওরলিতে আদিবাসী আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ প্রদেশ, বিহার, কেন্দ্রীয় প্রদেশ, রাজস্থান এবং পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়নে কৃষক আন্দোলন, আজকের কেরালার কিছু অংশে কায়ুর ও পুন্নাপ্রা-ভায়ালার সংগ্রাম এবং সর্বোপরি প্রথমে নিজামশাহী ও পরে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াই। তেলেঙ্গানা, ত্রাভাঙ্কোর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাবে যেসব আন্দোলন হয়েছে, সেরকম আরও বেশ কিছু আন্দোলন হয়েছে রাজন্যশাসিত বিভিন্ন রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধেও।

এই গণ-আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল ত্রিপুরাতেও। বস্তুত, এই প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই তৈরি হয়েছিল গণমুক্তি পরিষদ। স্বাভাবিকভাবেই গণমুক্তি পরিষদ ও জনশিক্ষা সমিতির সমস্ত নেতা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, ত্রিপুরার স্বৈরাচারী রাজার আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতেও তাঁরা বাধ্য হন।

সশস্ত্র সংগ্রামের এই পর্ব চলে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। অবিস্মরণীয় এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামের পরিণতিতেই ত্রিপুরায় স্বৈরাচারের অবসান হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালে কমরেড দশরথ দেব কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

ঐ সময়ে পার্টির পক্ষে গণ সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল, যদিও পার্টি তখন বেআইনী বলে ঘোষিত। ফলে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পার্টিকে তখন যেতে হয়েছে। সেই সময়ে নৃপেন চক্রবর্তীকেও ত্রিপুরায় পাঠানো হয়েছিল। ক্রমে তিনি, কমরেড বীরেন দত্ত ও কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুরায় পার্টির প্রধান সংগঠক হয়ে ওঠেন।

পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের পিছনে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিশাল

সংখ্যায়। আর কমরেড দশরথ দেব, কমরেড বীরেন দত্ত ও নৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষের অবিসংবাদিত নেতা।

আরেকটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ

এই সময়কালে পার্টিকে আরও একটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় এবং তা ছিল বেশ গুরুতর। দেশভাগ হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিরাট সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায় চলে এলেন। ফলে ত্রিপুরায়, যেখানে এক সময়ে উপজাতিরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে গেলেন।

এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এক অভূতপূর্ব জটিলতা সৃষ্টি করলো এবং পার্টি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল যে কিভাবে ভাষাগত সংঘাত এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে কৃতিত্ব হলো কমরেড দশরথ দেব ও তাঁর সহকর্মীদের। তাঁদের নেতৃত্বে উপজাতি-অ-উপজাতি ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হলো। যদিও কায়েমী স্বার্থ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের স্থানীয় সাকরেদরা এবং পাকিস্তানের আই এস আই আজও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, তবু ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক অনন্য রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা আত্মপ্রকাশ করেছে। কমরেড দশরথ দেব এই ঐক্যকে চোখের মণির মতো লালন করেছেন, রক্ষা করেছেন।

সংসদের ভিতরে

এইসব কাজকর্মের প্রতিফলন দেখা গেল ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে। এই নির্বাচনে পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ নির্বাচনে লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টিই দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ত্রিপুরায় লোকসভার দুটি আসনেই পার্টি ভাল ব্যবধানে জয়ী হয়। কমরেড বীরেন দত্ত জেতেন ত্রিপুরা পশ্চিম (সাধারণ) আসন থেকে এবং কমরেড দশরথ দেব জেতেন ত্রিপুরা পূর্ব (উপজাতি সংরক্ষিত) আসন থেকে। দশরথ দেব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আত্মগোপন অবস্থায় এবং সংসদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেই আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে সরকারকে তাঁর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করতে হয়। কমরেড দশরথ দেব ঐ আসন থেকে ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৭১ সালেও জেতেন। কিছুদিনের জন্য তিনি লোকসভায় পার্টির ডেপুটি লিডারও হয়েছিলেন।

সংসদে থাকাকালীন কমরেড দেব সাংসদ হিসাবেও তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেন। গণ-আন্দোলন পরিচালনা করার পাশাপাশি সংসদে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জরুরি দাবিগুলি তিনি উত্থাপন করতে থাকেন। এর ফলে তিনি দ্রুত উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক কিংবদন্তিতে পরিণত হন। ১৯৫৩ সালে তৃতীয় (মাদুরাই) কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন এবং ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন।

১৯৫৫ সালে সারা ভারত কিষান সভা ১৫ জনের এক প্রতিনিধিদলকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে পাঠায়। কমরেড দশরথ দেব ঐ প্রতিনিধি দলের অন্যতম ছিলেন। ঐ সফরের সময় আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে মেশার সুযোগ পাই এবং দেখি তিনি এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। সেই প্রথম তিনি বিদেশে গেছেন এবং সব কিছু দেখেছেন অত্যন্ত কৌতূহলী চোখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া সফরের পর তিনি আমার কাছে গ্রেট ব্রিটেন যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। লন্ডনের অ্যালবার্ট হলে শ্রমজীবী জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়েছিল। সেখানে দশরথ দেব সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্য যথা বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে সততার মনোভাব, অর্থনীতি, ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছিলেন। একজন সদ্য প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা

থেকেই ভাষণ দিয়েছিলেন কমরেড দশরথ দেব। এই সফর তাঁর মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সমাজতন্ত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। এরপর তিনি আরও উদ্দীপনা নিয়ে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অবিভক্ত পার্টির একটি অংশের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনলে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয় ও জেলে কাটাতে হয় কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

স্বাভাবিকভাবেই ১৯৬৪ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় যখন পার্টিকে পুনর্গঠিত করা হলো তখন দশরথ দেব সি পি আই (এম)-এ যোগ দেন এবং কখনোই কোনও রকম দোদুল্যমানতা দেখাননি।

সন্ত্রাসের সময়ে

১৯৭৮ সালে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তিনি রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ঐ কেন্দ্রে তিনি ১৯৮৩, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৩ সালেও জেতেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন এবং নিজের প্রশাসনিক দক্ষতা প্রমাণ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি হন উপ মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৯৩ সালে তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং এবছরের গোড়া পর্যন্ত ঐ দায়িত্বেই ছিলেন।

এরই মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য পার্টিকে এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে আসন জিততে না পেরে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। তারা একাজ করেছিল সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায়। এর পরই শুরু হয় আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের জমানা— যা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছিল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে। ত্রিপুরায় এই সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে পার্টির শত শত মূল্যবান কমরেড শহীদ হয়েছেন। ১৯৮৮-র নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের মদতপুষ্ট টি এন ভি আমাদের শত শত কর্মী ও নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বামফ্রন্ট সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট করা।

১৯৮৮ সালে, এই কঠিন সময়ে কমরেড দশরথ দেব পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন এবং ঐ সন্ত্রাসের কালো দিনগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁরই উদ্দীপনাময় নেতৃত্বে গোটা রাজ্যের জনসাধারণ যেন একটি মাত্র সত্তা নিয়ে রুখে দাঁড়ান এবং ১৯৯৩-র সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করে সন্ত্রাসরাজের অবসান ঘটান। যদিও ১৯৯৮ সনে স্বাস্থ্যের অবনতিতে তিনি স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেননি এবং নিজেকে পার্টি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

কমরেড দশরথ দেব ছিলেন কাজের মানুষ। দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিটি বাঁক ও মোড়ে তিনি ছিলেন অবিচল, অচঞ্চল। তিনি তাঁর বিরাট সাংগঠনিক, সংসদীয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। কখনও কোনও ব্যক্তিগত ঝোঁক দেখাননি, সব সময় ছোটখাটো ব্যাপারেও যৌথ নেতৃত্বে কাজ করেছেন। তাঁর সময়েই ত্রিপুরা রাজ্য পার্টিতে বেশ কিছু তরুণ নেতাকে তৈরি করেছেন এবং এর ফলে খুবই সহজভাবে পার্টিতে নেতৃত্ব বদলও সম্ভব হয়েছে। কমরেড দশরথ দেব বরাবরই সমগ্র পার্টির পক্ষে একজন অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ ছিলেন এবং কর্মীদের কাছে ছিলেন বিরাট প্রেরণাস্বরূপ। এই ক'টি কথা লিখে আমি আমার এই সহযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যাঁর স্মৃতি আমার কাছে চির-অক্ষয়। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

উপজাতি-অনুপজাতি মৈত্রীর সেতু

শৈলেন দাশগুপ্ত



অন্ধ্রে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে তেভাগার আন্দোলন আর ত্রিপুরায় উপজাতি কৃষকদের সংগ্রাম যেন এক সুতোয় গাঁথা। মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই কমরেড দশরথ দেব এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তিনি। কমিউনিস্ট চেতনাকে সাথী করেই পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরায় উপজাতি অনুপজাতি মৈত্রীরও সেতু।

এমন একজন মানুষ ছিলেন তিনি, যাঁকে দেখলে ভালো না বেসে উপায় থাকত না। কোনদিনও তাঁকে রাগতে দেখিনি আমি। অসম্ভব বিনয়ী ও নম্র এই মানুষটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল এই কলকাতাতেই। সেটা ১৯৫২ সাল। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসন থেকে সংরক্ষিত আসনে জয়ী হয়েছিলেন কমরেড দশরথ দেব কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে। ঐ একই কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে সাধারণ আসনে জিতেছিলেন বীরেন দত্ত। তখনকার নির্বাচনে এই রকমই ডবল মেম্বার কনস্টিটিউয়েন্সি হতো। আমাদের রাজ্যে যেমন ছিল ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে সাধারণ আসনে জিতেছিলেন কমল বসু আর সংরক্ষিত আসনে কংসারি হালদার।

১৯৫২-র সেই নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরার সংরক্ষিত আসন থেকে আত্মগোপন অবস্থায় জিততে হয়েছিলো কমরেড দশরথ দেবকে। ভোটে জেতার পর কমরেড দশরথ দেব এসেছিলেন কলকাতায়। আমি তখন কলকাতায় ৬৪ এ লোয়ার সার্কুলার রোডে আমাদের পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অফিসে বসতাম। কমরেড দশরথ দেবকে প্রথম দেখি সেদিনই ঐ পার্টি অফিসে। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন আরেক জয়ী প্রার্থী বীরেন দত্ত এবং চিকিৎসক ডা বি কে বসু। ডাঃ বি কে বসু সম্পর্কে একটু জানানো দরকার। ইনি চীনে যে মেডিক্যাল মিশন গিয়েছিলো, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন চিকিৎসক হিসাবে। ত্রিপুরায় যখন কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চলছে, তখনও এই চিকিৎসক ছিলেন দেবের সঙ্গেই, পাহাড়ে-জঙ্গলে সশস্ত্র যোদ্ধাদের পাশেই। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট প্রার্থীদের হয়ে তিনি কাজও করেছেন প্রচারে। সেই ভোটে জেতার পরও দশরথ দেব কলকাতায় এসেছিলেন আত্মগোপন অবস্থাতেই। তখনও তাঁর ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেয়নি কেন্দ্রের নেহেরু সরকার। তাঁর দিল্লি যাওয়ার কর্মসূচী ছিল শপথ নেওয়ার জন্য।

'৫১ সাল থেকেই কমরেড দেব ছিলেন পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এখন যেমন দিল্লি-আগরতলা বিমান চালু হয়েছে, তখন অনেকদিন পর্যন্ত তা ছিল না। ত্রিপুরা থেকে যাঁরা দিল্লি যেতেন, তাঁদের কলকাতা হয়েই যেতে হতো। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বা সাংসদ হিসাবে দিল্লি গেলে কমরেড দশরথ দেবও স্বভাবতই কলকাতা হয়ে যেতেন। কলকাতায় এলে তিনি পার্টি অফিসে আসতেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে প্রতিবারই দেখা হয়ে যেত। কলকাতায় তখন ৬১নং কড়েয়া রোডে ছিল পার্টির কমিউন। কাকাবাবু সহ অন্যান্য পার্টি নেতা এই কমিউনেই অনেকে থাকতেন। অন্য রাজ্য থেকে পার্টির নেতৃবৃন্দ এলেও এই কমিউনেই উঠতেন। কমরেড দশরথ দেবও কখনও কখনও থাকতেন এই কমিউনে। এই কমিউনে আর পার্টি অফিসেই সেই সময় আমার দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হতো কমরেড দশরথ দেবের।

আগেই বলেছি, উনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করতো। সব সময় স্মিতহাসি লেগে থাকতো তাঁর মুখে। বিনয়ী এবং নম্র ব্যবহার। এতবড় নেতা ছিলেন, কিন্তু তা বোঝার উপায় ছিল না। এই মানুষটিকে আমি শেষবার দেখি গত বছর কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে। তখন তিনি বেশ অসুস্থ। এস এস কে এম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁকে। ত্রিপুরা ভবনে সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। কমরেড দশরথ দেব তখন এত অসুস্থ যে, সামান্য দু'একটি শারীরিক কুশলতার কথা ছাড়া আর কোনও কথা বলার উপায় ছিল না।

কমরেড দশরথ দেব এখন প্রয়াত। কিন্তু তিনি অমর হয়ে থাকবেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্য। ত্রিপুরায় উপজাতি-অনুপজাতি মৈত্রীর সেতু তিনি। সামন্ত রাজা শাসিত ত্রিপুরায় সেই সময় শিক্ষা স্বভাবতই ছিল চূড়ান্ত অবহেলিত। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড দশরথ দেব জনশিক্ষা সমিতি গঠন করে শোষিত-বঞ্চিত অনগ্রসর উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াবার উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। চারের দশকের সেই সময়ে ত্রিপুরায় এ কাজ যে কত কঠিন ছিল তা বোঝা যায় যখন স্বয়ং তৎকালীন মহারাজা এসে দশরথ দেবকে শিক্ষার নামে রাজনীতি করলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যান। জনশিক্ষা সমিতির কাজ তবুও থামেনি। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দশরথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগতভাবে অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। চারের দশকে ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতির কাজের গর্ভেই জন্ম নেয় কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। অন্ধ্রে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে তেভাগার আন্দোলন আর ত্রিপুরায় উপজাতি কৃষকদের সংগ্রাম যেন এক সুতোয় গাঁথা। মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই কমরেড দশরথ দেব এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা তিনি। কমিউনিস্ট চেতনাকে সাথী করেই পরবর্তীকালে তিনি ত্রিপুরায় উপজাতি-অনুপজাতি মৈত্রীরও সেতু। তাঁর জীবনাবসানের অর্থ একটি বিশেষ সময়ের অবসান। কিন্তু বেঁচে থাকবে তাঁর অবদান। আদর্শে । থেকে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পাদনে ব্রত থাকলে কমরেড দশরথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকৃত প্রদর্শন হবে সেটাই।

[গণশক্তি ২১ অক্টোবর, '৯৮]

দশরথদা লাল সেলাম



বিমান বসু

"একজন কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তিনি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান নিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি যৌথ কাজের ধারা পুষ্ট করতে সকল সময় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। .... তিনি সর্বদা মনে করতেন ব্যক্তি থেকে পার্টি বড়।"

কমরেড দশরথ দেব আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ১৪ই অক্টোবর '৯৮ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

দশরথদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিনয়দার সঙ্গে আমি এবং অনিল আগরতলার উদ্দেশে রওনা হই। আগরতলা বিমানবন্দর এলাকা ছেড়ে শহরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখি কয়েক হাজার শোকাহত মানুষের চলমান মিছিল। সোজা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) -র রাজ্য দপ্তরে পৌঁছে সব সংবাদ নিয়ে চলে যাই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী হলের দিকে, সেখানে দশরথদার নিথর শরীর শায়িত রয়েছে। তখন হলের বাইরে শোকাচ্ছন্ন কয়েক হাজার মানুষ অপেক্ষা করছেন। বিশাল এক লাইন একটু একটু করে হলে ঢুকছে। আমাদের অন্য একটা বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। আগরতলার মানুষের মধ্যে দশরথদার সুউচ্চ অবস্থান দেখলাম। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নারী-পুরুষ দশরথদাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শেষবারের মতো দেখতে কি আকুতি প্রকাশ করছেন তা প্রত্যক্ষ করলাম। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শোকে স্তব্ধ। সত্যি এ এক অনন্য দৃশ্য, যা না দেখলে বোঝা যায় না। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হিসাবে ভাবছিলাম দশরথদাকে এ মানুষগুলো কত আপনজন মনে করতেন। কত শ্রদ্ধা করতেন, কত ভালবাসতেন। একবার হল থেকে বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। আর তখন দেখলাম কিছু নারী-পুরুষ আপনজন হারানোর ব্যথায় চোখের জল আটকাতে পারছেন না।

১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্রঘাটে রামপুরা গ্রামে এক ত্রিপুরী উপজাতি পরিবারে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি সমাজের অন্ত্যজ মানুষজনসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষের হৃদয়ের মণি হলেন কি করে ? এ প্রশ্নের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হলে দেখা যায়, কমরেড দশরথ দেববর্মা ছাত্রজীবন থেকেই সামন্তবাদী সমাজের নাগপাশে আবদ্ধ থাকা সমাজের সব থেকে নিপীড়িত-শোষিত বঞ্চিত মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে যুক্ত হন। কুসংস্কারের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষজনকে মুক্ত চিন্তার শরিক করার জন্য দশরথদা সমাজ সংস্কারের এক মহান ব্রতে নিজেকে যুক্ত করে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেন। একে একে সব পাহাড়ী ছড়া ও নদীর ধারা মিলে দশরথদা পাহাড়ের মানুষের ঘুম ভাঙাতে ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। যুগ যুগ ধরে

সামন্ত শোষণের শিকড় শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষজনকে সংগঠিত করে মুক্তির লড়াই পরিচালনার মধ্য দিয়ে এক কিংবদন্তি নেতা হিসাবে সমস্ত ত্রিপুরার জনগণের কাছে পরিচিত হন। সেই সময়ে দশরথদার এক কথায় বা তাঁর ইশারায় ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর যে কোনো নারী-পুরুষ নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে শোষণ-অত্যাচারের অবসানের লড়াইতে নিজের জীবন সঁপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এই কাজের ধারার মধ্য দিয়ে ৪০-এর দশকের শেষ প্রান্তে ও ৫০-এর দশকের শুরুতে সাধারণ মানুষের কাছে দশরথদা হয়ে উঠলেন এক মুকুটহীন রাজা।

এই মুকুটহীন রাজা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বীরেন দত্তের সহকর্মী হিসেবে সমগ্র ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে যুক্ত থেকে জনগণের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে পার্টি নেতৃত্বের অংশ হিসাবে শুরু করলেন ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতি মানুষের সেতুবন্ধনের কাজ— যা আজ সমগ্র দেশ ও সমাজের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। তিনি নিজে জীবনের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করে সমগ্র সমাজের স্বার্থে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে চির জাগরুক থাকবে।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দশরথদা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আত্মগোপনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে সংসদে প্রবেশ করেন এবং নিপীড়িত-শোষিত মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা সংসদে পেশ করতে শুরু করেন, যা এখনও সংসদের রেকর্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারপর ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর চারবার রামচন্দ্রঘাট উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮ ও ১৯৯৩ সালে বিপুল ভোটে ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের মানুষের উন্নতি ও ঐক্যের স্বার্থে কাজে যুক্ত থেকেছেন। ইতিপূর্বে দশরথদা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে প্রসারিত ও সংহত করতে আত্মনিয়োগ করেন। '৭০ ও '৮০-র দশকে দশরথদা নিজেকে একজন প্রথম সারির পার্টির দক্ষ সংগঠক ও যোগ্য প্রশাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সমগ্র ত্রিপুরায় শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী সময়ে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী রূপে এক যোগ্য প্রশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষদিকে শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার যন্ত্রণা নিয়ে দশরথদাকে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হয়েছে।

দশরথদার অমায়িক ব্যবহার এবং সরল জীবনযাত্রা যে কোনো মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করতো। একজন কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তিনি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান নিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি যৌথ কাজের ধারা পুষ্ট করতে সকল সময় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে অনেক সময় অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও সকলের সঙ্গে আলোচনা করতেন। তিনি সর্বদা মনে করতেন ব্যক্তির থেকে পার্টি বড়। তাই যৌথ কর্মধারাই পার্টির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উন্নত করতে পারে বলে তরুণ ও নবীন কর্মীদের শিক্ষা দিতেন। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার স্বার্থে দশরথদার কর্মময় জীবনধারা লিখিতভাবে অবিলম্বে তৈরি করা জরুরি প্রয়োজন বলে মনে হয়। দশরথদার মৃত্যুতে ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে খানিকটা শূন্যতা দেখা দিল এবং সমগ্র দেশের মানুষের কাছে এক জীবন্ত উদাহরণের অভাব হলো। তাই শোকাচ্ছন্ন সমগ্র ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে আগরতলা থেকে খোয়াই হয়ে আমপুরা গ্রাম পর্যন্ত ৯৬ কিলোমিটার পথপার্শ্বে সমগ্র মানুষের চাপা ক্রন্দন আর শ্লোগান 'কমরেড দশরথদা অমর রহে, কমরেড দশরথদা লাল সেলাম।' আমরাও বলছি— কমরেড দশরথদা লাল সেলাম। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

জনগণের মুকুটহীন রাজা কমরেড দশরথ দেব



অনিল বিশ্বাস

"আমার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে স্বচ্ছ ও দৃঢ় করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে কমরেড দশরথ দেব অন্যতম। .... প্রতি সভাতেই দেখেছি — কমরেড দশরথ দেব ভারতের জাতি-উপজাতি ইস্যু, অনগ্রসরতার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনবদ্যভাবে বিজ্ঞানসম্মত জোরালো বক্তব্য রাখতেন।"

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিসংবাদী সেনাপতি, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিছু কিছু মানুষ থাকেন এবং ইতিহাসে এরকমই ঘটে যে, মৃত্যু তাঁদের গ্রাস করতে পারে না। জনগণের স্বার্থে তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্যই তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন গণমানসে। তাঁরা সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন, মুকুটহীন রাজা। কিংবদন্তি হয়ে তাঁরা অনুপ্রেরণা যোগান পরবর্তী প্রজন্মকেও। কমরেড দশরথ দেবও এরকম মহান মানুষ। শত সমস্যার মুখেও তিনি ছিলেন অবিচল, স্থিতধী। সারাজীবন ধরেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন জনগণের জন্য।

আমার কৈশোরে আমি যখন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলাম, তখন থেকেই আমি ত্রিপুরার কমিউনিস্ট হিসেবে দশরথ দেব নামটির সঙ্গে পরিচিত। ধীরে ধীরে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ হলো। তাঁর আপসহীন সংগ্রামী জীবন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অবিচল প্রত্যয় এবং ভয়ঙ্কর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জনগণের পাশে থাকার কাহিনী আমাকে প্রচণ্ড অভিভূত করেছে। আমি আবেগ-রুদ্ধ হয়েছি, আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাবার বল পেয়েছি। তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। গোড়া থেকেই আমি ত্রিপুরার কমরেড দশরথ দেবকে আলাদা করে দেখতে পারিনি। ত্রিপুরা আর কমরেড দশরথ দেব আমার কাছে বরাবরই সমার্থক। আমার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে স্বচ্ছ ও দৃঢ় করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে কমরেড দশরথ দেব অন্যতম। যদিও তিনি কলকাতা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তবুও তাঁর অকুতোভয় সংগ্রামী জীবন আমাকে বারে বারেই টেনেছে। প্রিয়জন বিদায় নিলে মানুষ হয়তো এভাবেই ফিরে ফিরে তাকায় অতীতের পানে এবং অনিবার্যভাবেই তার হাতে উঠে আসে বিশ্বাসের-বোধের-প্রত্যয়ের দুর্লভ মুক্তামালা।

ছাত্র আন্দোলনের সেই ঝোড়ো দিনগুলিতে আমি যখন কমরেড দশরথ দেব নামটির সঙ্গে পরিচিত হই, তখন তাঁর সম্পর্কে অনেক ভালোবাসার বিশেষণ শুনেছি। যেমন তিনি গণ-আন্দোলনের

জাদুকর, তিনি জাতি-উপজাতি মানুষের মধ্যে সেতু-বন্ধন, তিনি ত্রিপুরার রবিন হুড। পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে যখন আমার সরাসরি আলাপ হলো তখন যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি ইনিই সেই জনমানসে তুফান-তোলা নায়ক দশরথ দেব। কারণ প্রথম দর্শনেই আমি দেখলাম তিনি অমায়িক, শান্ত, স্বল্পবাক। সেদিন তাঁকে সামনাসামনি দেখে বিস্ময়াভূত হয়েছিলাম। তার কারণ ছিল একটাই। সেদিন আমার মনে হয়েছিল, দশরথ দেব প্রবল আত্মবিশ্বাসী এবং জনগণের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধ বলেই এত বিনয়ী, আত্মবিশ্বাসী। প্রকৃত শক্তি মানুষকে এরকম বিনয়ী করে তোলে। জনগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসাই এই সংহত আর সমুদ্রের মতো গভীর চেতনার জন্ম দেয়। শুনেছি, সমুদ্র যত গভীর হয়, ঢেউ তত কম হয়। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন এরকমই এক মহান মানুষ। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমিও সমৃদ্ধ হয়েছি।

পরবর্তী সময়ে নয়াদিল্লিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাগুলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। প্রতি সভাতেই দেখেছি, কমরেড দশরথ দেব ভারতের জাতি-উপজাতি ইস্যু, অনগ্রসরতার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে অনবদ্যভাবে বিজ্ঞানসম্মত জোরালো বক্তব্য রাখতেন। তাঁর সম্পর্কে পলিটব্যুরো তাই বলেছে, একজন বিরাট মাপের কমিউনিস্ট নেতার সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন কমরেড দশরথ দেব।

তাঁর জীবন তরুণদের নিশ্চয় আকৃষ্ট করবে, অনুপ্রাণিত করবে। কারণ ত্রিপুরার পাহাড়ী এলাকা খোয়াইয়ে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নিজেকে একটি স্মরণীয় স্তরে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। কলকাতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ অসমাপ্ত রেখে রাজ্যের নিরক্ষর পশ্চাৎপদ ও শোষিত উপজাতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি জনজাগরণের, সংগ্রামের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি গণতান্ত্রিক মৈত্রীর সেতু। উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চেতনায় সমৃদ্ধ করে শ্রেণীসংগ্রামে ও গণসংগ্রামে একজোট করেছিলেন। দশরথ দেব কোন সময়ই সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বরাবরই দৃপ্তকণ্ঠে বলে গেছেন, শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া উপজাতিদের সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলে গেছেন, শত্রুর আক্রমণের মুখে বিচলিত হলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ গঠনের আসল লড়াইয়ে জয়ী হতে। এজন্য জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের জনগণের মধ্যে গড়ে তোলা ঐক্য রক্ষা করার আহ্বান তিনি সবসময় জানিয়েছেন। এই ঐক্যের মধ্যে দিয়েই ত্রিপুরায় আমাদের পার্টিভিত্তি গড়ে উঠেছে।

সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থীদের ধারাবাহিক আক্রমণ এবং নানা কুটিল চক্রান্তে ত্রিপুরা বহুবার রক্তাক্ত হয়েছে। কিন্তু দশরথ দেবকে কোন কিছুতেই আমরা বিচলিত হতে দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি অনেকবার কলকাতায় এসেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার পরিস্থিতি আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন দেখেছি, তিনি সবসময় ইস্যুগুলিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে বিশ্লেষণ করতেন। তাঁকে বারে বারেই বলতে শুনেছি, জাতি-উপজাতি জনগণের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন ঘটিয়ে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ঘটাতে হবে। সম্প্রদায়গত সন্ত্রাস কোন মুশকিল আসান নয়। মানুষকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় ও শিক্ষায় আলোকিত করতে হবে।

কিভাবে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে, কিভাবে কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালান প্রবাদপ্রতিম মানুষেরা, তা জানার দুর্নিবার কৌতূহল আগ্রহ সবারই থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের সর্বোচ্চ নেতা। শুনেছি তিনি বহুবার পাহাড়ে-জঙ্গলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মুখে পড়ে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করেছিলেন।

তাঁর সেই অসম সাহসের নানা কাহিনী আজ পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে। বড়মুড়ার জঙ্গলে আত্মগোপন অবস্থায় বাঘের মুখে পড়েও দক্ষ হাতে বন্দুক চালিয়ে সেই বাঘকে জখম করেছেন।

স্বাধীন ভারতেও পুলিশ তাঁর মাথার দাম দিয়েছিল দশ হাজার টাকা। সেটা ১৯৫২ সাল। সেবারেই লোকসভা নির্বাচনে তিনি পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ঠিক করেছিল যে তাঁকে শপথ নেবার আগেই গ্রেপ্তার করা হবে এবং সংসদে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তিনি পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে দিল্লি গিয়ে সংসদে শপথ নেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ। তাঁর সম্পর্কে এরকম বহু শিহরন জাগানো কাহিনী রয়েছে। এভাবেই বোধ হয় গড়ে ওঠে বীরদের গৌরবগাথা, কিংবদন্তি। আর সব কিংবদন্তিই জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন দশরথদা, তার হদিশ পেয়েছিলাম ১৫ই অক্টোবর। সেদিন খোয়াইয়ের আমপুরায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। জাতি উপজাতির অগণিত মানুষের মাঝেই শেষ বিদায় নিলেন কমরেড দশরথ দেব। আগরতলা থেকে খোয়াই হয়ে আমপুরা দীর্ঘ ৯৬ কিলোমিটার পথে হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধা ভালোবাসা অশ্রু ফুলমালায় শেষ বিদায় জানালেন তাঁদের প্রবাদপ্রতিম প্রাণের রাজা, প্রিয় নেতাকে। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্জয় ঘাঁটি কুমারী-মধুতী-রূপশ্রীর রক্তঝরা খোয়াইয়ে আমপুরায় সেদিন শোকাকুল মানুষের জনস্রোত দেখে আমিও আবেগে আপ্লুত হয়েছিলাম। চোখের কোণে আমার জল চিকচিক করছিল। সেদিন ৯৬ বছরের এক উপজাতি বৃদ্ধ গর্বের সঙ্গেই স্মরণ করেছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট দশরথ দেবের নানা কথা। বৃদ্ধ কান্নাজড়ানো গলায় বলেছিলেন, দশরথ যখন আমপুরায় ফিরতেন তখন গ্রামজুড়ে উৎসবের মেজাজ টের পাওয়া যেত। কারণ মানুষের প্রাণের রাজা যে আজ তাদের মধ্যে এসেছেন। কাঠের বিশেষ আসন তৈরি করে সেখানে বসানো হতো জনগণের মুকুটহীন রাজা দশরথ দেবকে।

সেদিন শোকমিছিলেও ছিল মানুষের ঢল, তাঁদের চোখে তখন শোকাশ্রুর বাদলধারা। হাতে ফুলের মালা, মেয়েদের আঁচলে ভোরের ফুল। রাস্তার দু'পাশে বৃষ্টির মধ্যেও মানুষের উপচে পড়া ভিড়। হাজারো কণ্ঠে মাঝেমধ্যেই শ্লোগান উঠেছে— জাতি-উপজাতি মানুষের সংহতির সেতু কমরেড দশরথ দেব অমর রহে।

সেদিন দেখেছি মানুষের চোখের জল যেন হার মানিয়েছে মেঘঝরা জলকে। বহু জায়গায় — যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্যও আছে— প্রতিটি ঘরে মানুষ শাঁখ, কাঁসরঘণ্টা, খোল-করতাল নিয়ে শেষবারের মতো দেখতে এসেছেন তাঁদের প্রাণের রাজাকে। শেষের দিনেও রাজা গ্রামের পর গ্রামে ঢুকলেন বীরের মতো। তাঁর ললাটে যেন চন্দনচর্চিত বিজয় তিলক। এসব দেখে সত্যিই হৃদয়ের একূল-ওকূল দু'কূল ভেসে যায়। মানুষের এই বিস্ময়জাগানো কূলপ্লাবী ভালোবাসা শ্রদ্ধা একদিনে তৈরি হয়নি। সেদিন পাহাড়ঘেরা গ্রামগুলির ঘ[illegible] ঘরে ছিল অরন্ধন। সেদিন ত্রিপুরার মানুষের যে ভালোবাসা দেখলাম তাঁদের 'রাজার' প্রতি তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। তিনি যে সবসময় গরিব মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন, দিয়ে গেছেন রাজনৈতিক শিক্ষা। মানুষের শোকের সর্বব্যাপী আস্তরণের নিচে ছিল এক মহান আদর্শের প্রতি তাঁদের [illegible] আস্থা, প্রিয় নেতা সম্পর্কে উথাল-পাথাল ভালোবাসা [illegible] গৌরববোধ। দশরথ দেব আমাদের মধ্যে জেগে থাকবেন নিরন্তর। দশরথদার মতো বিরাট মাপের মানুষের মূল্যায়ন করার মতো স্পর্ধা আমার নেই। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে আমি শুধু বলতে পারি কমরেড দশরথ দেব অমর রহে।

●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

কমরেড দশরথ দেব ঃ সম্প্রীতি ও ঐক্যের দিশারী



বৈদ্যনাথ মজুমদার

"কমরেড দশরথ দেব-এর চেতনার মধ্যে এটা ছিল যে, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে জাতি-উপজাতির শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রাম মূল শত্রুকে বাদ দিয়ে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হলে সফল হবে না। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।"

কমরেড দশরথ দেব আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের অবিসংবাদী নেতা। কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তিনি কখনও আত্মগোপন করে, কখনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, কখনও বা সংসদীয় পদ্ধতিতে ত্রিপুরার জনগণের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

১৯৪৫ সালে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গঠিত 'জনশিক্ষা সমিতি'র তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। সেই কারণে কমরেড দশরথ দেব তদানীন্তন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মনের কোপানলে পড়েন। মহারাজা 'জনশিক্ষা সমিতি'র প্রভাব খর্ব করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেও ব্যর্থ হন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরায় মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর চেয়ারম্যানশীপে রিজেন্সী কাউন্সিল গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত দেওয়ান উপাধিধারী আই সি এস অফিসার কাউন্সিল পরিচালনা করেন। বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরায় দেওয়ানী শাসন চালু হয়। কমরেড দশরথ দেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র 'জনশিক্ষা আন্দোলন'-এর মাধ্যমে দরিদ্র ও পশ্চাদপদ উপজাতিদের পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করা যাবে না। তাই কমরেড দশরথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যথা— প্রয়াত কমরেড হেমন্ত দেববর্মা, কমরেড অঘোর দেববর্মা ও প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্তের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ১৯৪৮ সালের মে মাসে 'ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ' গঠন করেন। কমরেড বগলা দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মাকে সদস্য করা হয়। কমরেড দশরথ দেববর্মাকে প্রেসিডেন্ট, অঘোর দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক এবং হেমন্ত দেববর্মাকে কোষাধ্যক্ষ করে এই সংগঠন করা হয়। ('মুক্তি পরিষদের ইতিকথা'র সৌজন্যে)।

মুক্তি পরিষদ প্রজার ভোটে সরকার গঠন করা, দেওয়ানী শাসন বাতিল করা, পুলিশী জুলুম বন্ধ

করা সহ কয়েকটি দাবিতে উপজাতিদের সংগঠিত করে গণ আন্দোলন শুরু করে। তাছাড়া মহাজনী শোষণ ও তিতুন প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে গোলাঘাটিতে মহাজনের ষড়যন্ত্রে পুলিশের গুলিতে ছয়জন উপজাতি ও একজন বাঙ্গালী কৃষক নিহত হন। কমরেড দশরথ দেব আরো আগে থেকে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন ১৯৫০ সালে। গোলাঘাটির ঘটনার পর সংগ্রামের গতি যাতে ভুল পথে চলে না যায় — তার জন্য মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৯ সালে খোয়াই-এর পদ্মবিলে পুলিশের গুলিতে কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী দেববর্মা নিহত হন। ঐ বৎসরই খোয়াই বিভাগ সহ ত্রিপুরার একাংশে সামরিক শাসন জারি হয়। সামরিক বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক গণহত্যা, ব্যাপক গৃহদাহ ও অকথ্য অত্যাচার প্রতিরোধ করতে এবং উপজাতিদের জীবন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য কমরেড দশরথ দেব ও অন্যান্য নেতৃবর্গ হাতে অস্ত্র তুলে নেন ও গেরিলা বাহিনী গঠন করে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা খুবই কঠিন কাজ। কমরেড দশরথ দেব শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী গঠন করে দক্ষতার সঙ্গে এই সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি বরাবরই দৃঢ়চেতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ও বাগ্মী ছিলেন। গেরিলা বাহিনীকে তিনি কঠোর অনুশাসনের মধ্যে রেখেছিলেন। প্রয়োজনে ঐ বা কে জনহিতকর কাজেও ব্যবহার করেছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় মুক্তি পরিষদ উপজাতিদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং সমাজ সংস্কারের বিধি প্রণয়ন করে ও চালু করে। খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করে। কমরেড দশরথ দেব-এর চেতনার মধ্যে এটা ছিল যে, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে জাতি-উপজাতির শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রাম মূল শত্রুকে বাদ দিয়ে কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হলে সফল হবে না। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। ফলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার দু'টি আসনে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি ও কমরেড বীরেন দত্ত জাতি-উপজাতির বিপুল ভোটে জয়ী হন। এই সময়েই তিনি 'মুকুটহীন রাজা' হিসেবে আখ্যায়িত হন। তিনি আজীবন জাতি-উপজাতির মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করেছেন। তিনি লোকসভাতে উপজাতিদের স্বার্থে যেমন লড়াই করেছেন, তেমনি রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থেও কাজ করেছেন। রাজ্য প্রশাসনে থাকার সময়ও পার্টির সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করেছেন। পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করার কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবে উপজাতিদের মধ্যে তিনি যে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি করেছেন—যার ওপর ভিত্তি করে জাতি-উপজাতির ঐক্য গড়ে উঠেছে— তার নজীর দেশের অন্য কোথাও নেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র দৃঢ় মূল জাতি-উপজাতি জনগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে তাঁর অবদান অপরিসীম।

শত্রুপক্ষ অসত্য অভিযোগ এনে তাঁর ভাবমূর্তি বার বার কলুষিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। জাতি-উপজাতির ঐক্যের ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এসেছে।

বিদেশী শক্তির মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি একযোগে জাতি-উপজাতি ঐক্য ভাঙ্গার জন্য বিগত দুই দশক ধরে দাঙ্গা, খুন, সন্ত্রাস, গৃহদাহের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা জাতি-উপজাতির নিরপরাধ মানুষের অমূল্য প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের খুন করেছে।

উগ্রবাদীরা একবার কমলপুরের লালছড়িতে কমরেড দশরথ দেবের গাড়ী অ্যাম্বুশ করে তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। তিনি রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু তাঁর সিকিউরিটির কয়েকজন জওয়ান মারা যান। আর একবার ধূমাছড়াতে তাঁর গাড়ীতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল। গ্রেনেডটি গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে গাড়ীর ভিতরে পড়ে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটেনি। তাই তিনি সেবারেও বেঁচে গিয়েছিলেন। ওরা ত্রিপুরার জনগণের সুমহান ঐক্য ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিয়ে আবার জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণ কমরেড দশরথ দেব যে ঐক্য গড়তে অপরিসীম অবদান রেখে গিয়েছেন তাকে ধরে রাখবে এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



১৯৯৬ — মহাকরণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের সঙ্গে আলোচনারত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

কমরেড দশরথ দেব সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তুলনাহীন



মানিক সরকার

(গণশক্তি ২১ অক্টোবর ১৯৯৮ বুধবার)

যে কোন রাজনৈতিক, সাংগঠনিক জটিল পরিস্থিতি, বাঁক ও মোড়ের মুখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দশরথ দেব ছিলেন তুলনাহীন। মঙ্গলবার আগরতলায় এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা।

***প্রশ্ন ঃ** কমরেড দশরথ দেবের জীবনাবসানে 'আমরা একজন নির্ভরশীল অভিভাবককে হারালাম' বলে আপনি মন্তব্য করেছেন। কেন নির্ভরশীল অভিভাবক ?*

মানিক সরকার ঃ কমরেড দশরথ দেব ছিলেন সুদীর্ঘ গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামে পোড় খাওয়া এক অসাধারণ নেতা। ত্রিপুরার জল, মাটি, মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বচ্ছ ধারণা। ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে থেকে মানুষকে নিয়ে সংগ্রাম করেই দশরথ দেব— দশরথ দেব হয়েছেন, কিংবদন্তির নায়ক হয়েছেন। একই সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অন্যতম হিসাবে দশরথ দেবের আন্তর্জাতিক ও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল স্বচ্ছ। দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তা, সুদীর্ঘ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক কর্মধারার সমন্বয়ে দশরথ দেবের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্বের সব গুণগুলোর প্রতিফলন ঘটেছিল। তাই যে কোন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক জটিল পরিস্থিতিতে, বাঁক ও মোড়ের মুখে সঠিক পরামর্শ দিতে ও সঠিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। এ কারণেই তাঁর প্রয়াণে বলেছি, আমরা একজন নির্ভরশীল অভিভাবককে হারালাম।

***প্রশ্ন ঃ** কমরেড দশরথ দেবের সবচেয়ে বড় অবদান কি ?*

মানিক সরকার ঃ গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ত্রিপুরার উপজাতি জনজাগরণের সংগ্রামের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম সারির পথিকৃৎ ও স্থপতি। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তনের বিশেষ পর্যায় থেকে ক্রমবিকাশ ধারায় তাঁর রয়েছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাণপুরুষের ভূমিকা।

দোর্দণ্ড প্রতাপ সামন্ত রাজ শাসনের রুদ্ররোষ উপেক্ষা করে 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠন ও তার পরিচালনায় প্রধানত উপজাতি জনসমাজে জনশিক্ষার প্রসার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের ময়দানেই দশরথ দেবের আত্মপ্রকাশ। সে সময়ে তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। তখন ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের প্রভাব এবং ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন কুমিল্লা

জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টির সেলগুলো।

কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল হলেও প্রথম থেকেই জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের সাথে ছিল একাত্ম। ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্ত ছিলেন জনশিক্ষা সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার যোগসূত্র বা সেতু।

দেশ স্বাধীন হবার পর, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি লাইনের (বি টি আর — লাইন নামে যা খ্যাত ছিল) পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সারা দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ নেমে আসে। ত্রিপুরাও এই আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি। ছোট কমিউনিস্ট সেল ও তার নেতৃত্বের পাশাপাশি সেদিন জনশিক্ষা সমিতি ও তার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের উপরও আক্রমণ নেমে আসে। কমিউনিস্টদের পাশাপাশি দশরথ দেব সহ জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বও আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হন। সে সময়ে জনশিক্ষা সমিতির জঠর থেকে জন্ম নেয় ত্রিপুরার গণসংগাম ও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগঠন 'গণমুক্তি পরিষদ'। দশরথ দেব নির্বাচিত হন তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বৃত ছিলেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রামের ময়দানে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হতে থাকে। দশরথ দেব জীবনের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট দর্শনকে নিজের জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। কমিউনিস্টদের প্রদর্শিত পথই সমাজের সর্বাধিক অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত, উপজাতি জনগণসহ শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির পথ বলে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তিনি ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। গণমুক্তি পরিষদকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তায় উদ্ভাসিত করেন। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় শোষকদের হটিয়ে শোষিতদের স্বার্থের রক্ষকদের ক্ষমতায় বসিয়ে শোষিত, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির সাথে উপজাতি জনজীবনের বহুমুখী মৌলিক — সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে বলে যে বিশ্বাস দশরথ দেবের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছিল সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমির উপর দাঁড়িয়েই দশরথ দেব ত্রিপুরায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনার যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে গেছেন। উপজাতি-অনুপজাতি অংশের শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্রোতোধারায় তিনি যে গণতান্ত্রিক ঐক্য ও শ্রেণী ঐক্য গড়ে তুলেছেন, ত্রিপুরায় গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশে এবং সারা দেশের গণসংগ্রামের অসম বিকাশের মধ্যে তা এক মূল্যবান অবদান ও উজ্জ্বল নিদর্শন।

***প্রশ্ন ঃ** 'কমরেড দশরথ দেব একজন সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন' — এই বক্তব্যের সপক্ষে আপনি কী বলবেন ?*

মানিক সরকার ঃ জনশিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি এবং পরবর্তী সময়ে গণমুক্তি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে সংগঠন ছাড়া কোন আন্দোলন যে সঠিক ধারায় পরিচালিত হতে পারে না ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না এই স্বচ্ছ ধারণা থেকেই বিশেষভাবে গণমুক্তি পরিষদের শুরুর দিন থেকে কমরেড দশরথ দেব সংগঠন গড়ে তোলার কাজে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ্য ভূমিকায়। ঝড় ঝঞ্ঝা, ষড়যন্ত্র ও শত্রুর বহুমুখী ঘৃণ্য আক্রমণের মধ্যেও রক্ত পিচ্ছিল পথে হেঁটে চলা আজকের গণমুক্তি

পরিষদ ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অর্জিত শক্তি এবং ক্রমবিকাশই তিনি কেমন সংগঠক ছিলেন তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রশ্ন ঃ *সাংসদ, মন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কমরেড দশরথ দেবের ভূমিকা কেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ? ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলবেন ?*

মানিক সরকার ঃ বাইরের গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামকে সংসদের ভিতরে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সমসাময়িক অন্যান্য কমিউনিস্ট সাংসদদের মত দশরথ দেবও সংসদের ভেতরে যথাযোগ্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বিশেষ করে জনস্বার্থে ত্রিপুরার ভূমিব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প, পরিবহণ সহ সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে সংসদের অভ্যন্তরে দশরথ দেবের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জনস্বার্থে ত্রিপুরাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপকারের ভূমিকা পালন করে গেছেন। বিশেষ করে শিক্ষা সম্প্রসারণ, গ্রামোন্নয়ন ও উপজাতি, তফসিলি জাতি সহ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ *কমরেড দশরথ দেব শোষক শ্রেণীর এজেন্টদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিলেন কেন ?*

মানিক সরকার ঃ শোষকদের মুখোশ খুলে দিয়ে শোষিতদের শোষকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রামে অগ্রণী নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে।

দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী কায়েমী স্বার্থের রক্ষকরা উপজাতি এবং অনুপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করে এক থেকে অপরকে আলাদা করে রেখে উভয় অংশের গরিব মানুষকে যেভাবে ঠকাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে কমরেড দশরথ দেব সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। উপজাতিদের শত্রু অনুপজাতি বা বাঙালী নয়, বাঙালীর শত্রু উপজাতি নয় — উভয় অংশের ভূমিহীন, খেতমজুর, গরিব নিঃস্ব শ্রমজীবী মানুষের শত্রু হচ্ছে মুষ্টিমেয় শোষক যারা অন্যায় পথে মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফা লুটে। এদের বিরুদ্ধে জাত, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল অংশের শোষিত, বঞ্চিত, শ্রমজীবীদের এক হয়ে লড়তে হবে। কমরেড দশরথ দেব এই চেতনা দেবার কাজে যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীদের এত আক্রমণ।

প্রশ্ন ঃ *ত্রিপুরায় পশ্চাৎপদ উপজাতি জনগণসহ শোষিত, বঞ্চিত মানুষের সুরক্ষা ও বিকাশের প্রশ্নে দশরথ দেবের ভূমিকা ইতিহাস কীভাবে স্মরণ করবে ?*

মানিক সরকার ঃ তাঁর দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সাংগঠনিক কর্মধারার সমন্বিত প্রতিফলন ঘটিয়ে উপজাতি— অনুপজাতি নির্বিশেষে সকল অংশের দেশপ্রেমিক, শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের সম্মিলিত গণসংগ্রামে অব্যাহত বিকাশ ধারার মাধ্যমেই তাঁকে স্মরণ করার এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হতে পারে।

জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির সাঁকো



শচীন্দ্রলাল সিংহ

সমকালীন রাজনীতিতে দশরথ দেবের অবদানকে অস্বীকার করা, এসময়ের ত্রিপুরার ইতিহাসকে অস্বীকার করার নামান্তর। আজীবন সংগ্রামী, শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, দশরথ দেবকে সংগ্রাম করতে দেখি অশিক্ষার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে দেখি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে দেখি জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির পক্ষে।

সুদীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে একটানা জনসাধারণের স্নেহ-ভালবাসা-আশীর্বাদ পাওয়া খুব বেশি রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যে জোটে না। যাঁদের জোটে তাঁদের শুধুমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি বা ভাগ্যবান রাজনৈতিক নেতা বললে ঘটনা বিশ্লেষণে ফাঁক থেকে যাবে। অন্য গুণ না থাকলে শুধু ভাগ্যের জোরে ৪০ বছর ধরে একজন সর্বভারতীয় দলের নেতৃত্ব করে যাচ্ছেন একথা বললে লোকে হাসবে।

আমার রাজনৈতিক জীবনে যে কয়েকজন বিশিষ্ট সংগ্রামীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অন্যতম দশরথ দেব। সমকালীন রাজনীতিতে দশরথ দেবের অবদানকে অস্বীকার করা, এ সময়ের ত্রিপুরার ইতিহাসকে অস্বীকার করার নামান্তর। আজীবন সংগ্রামী, শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, দশরথ দেবকে সংগ্রাম করতে দেখি অশিক্ষার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে দেখি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করতে দেখি জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির পক্ষে। রাজন্য ত্রিপুরায় শাসন ব্যবস্থা ছিল অগণতান্ত্রিক, পরিবেশ ছিল শ্বাসরুদ্ধকারী, প্রজার ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকত জোতদার, মহাজন ও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শোষণ ও নিপীড়ন। এই বিরূপ পরিবেশে সংগ্রাম করেছেন দশরথ দেব। তিনি সংগ্রাম করেছেন জোতদার ও মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে, আমলাতান্ত্রিক শাসনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে। শুধু সংগ্রাম করেছেন বললে সবটা বলা হয় না— তিনি সংগ্রাম করেছেন শোষিত নিপীড়িতের মধ্যে জাগৃতি সৃষ্টি করার জন্য এবং তিনি তাঁদের সংগ্রামকে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে মহাজনী শোষণের সবচেয়ে কলঙ্কময় দিনটি হল ১৯৪৮ সালের ৯ অক্টোবর। সেদিন মহাজনী শোষণের শিকারে প্রাণ হারান ত্রিপুরার ৭ জন কৃষক বা কৃষিমজুর। বিশালগড়ের এক মহাজন পুলিশের মদতে উজান গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর পাড়ায় এই নারকীয় কাণ্ড টি ঘটিয়ে ত্রিপুরার বুকে এক চিরস্থায়ী কলঙ্কের দাগ এঁকে দেয়। এই নারকীয় ঘটনায় শুধু প্রতিবাদ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি দশরথ দেব, তিনি ত্রিপুরার কৃষকদের, বিশেষত উপজাতিদের মধ্যে এক

ব্যাপক গণচেতনার হাতিয়ার হিসাবে এই ঘটনাকে ব্যবহার করেন এবং সফল হন। ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট দশরথ দেবের যে পরিচয় ত্রিপুরাবাসী পায় তা পূর্বে কেউ কল্পনায়ও আনতে পারেনি। সেদিন তিনি আগরতলা শহরে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেন। মিছিলে অংশগ্রহণ করে উপজাতি জনতা। এই উপজাতি সমাজের যে এতখানি রাজনৈতিক চেতনা আছে তা তখনকার শাসককুলের বা আগরতলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের ধারণার মধ্যে ছিল না। ভারতে লোকসভা সদস্যপদে দীর্ঘকাল ধরে থাকার যে ক'জনের রেকর্ড আছে, তাঁদের অন্যতম দশরথ দেব। তিনি সি পি এম সাংসদীয় দলের 'ডেপুটি লিডার' ছিলেন। ত্রিপুরার অশিক্ষিত উপজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে দশরথ দেবের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাঁর শিক্ষাবিস্তারের কর্মকাণ্ড। তিনি ত্রিপুরার 'জনশিক্ষা সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উপজাতি সমাজে শিক্ষা বিস্তারে জনশিক্ষা সমিতির ভূমিকা যে কোন সমাজ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের কাছে আদর্শ হতে পারে। উন্নতির প্রথম সিঁড়ি শিক্ষা। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন দশরথ দেব। শিক্ষা প্রসারে প্রচলিত ধারা বদলিয়ে তাকে গণশিক্ষায় রূপান্তরিত করার একটা প্রচেষ্টা দশরথ দেবের মন্ত্রিত্বকালে লক্ষ করা গেছে। তিনি ৮০টিরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্গম অঞ্চলে স্থাপন করেন। প্রায় ৪০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁর মন্ত্রিত্বকালে স্থাপিত হয়েছিল। এ সময়ে 'ককবরক' ভাষাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় এবং ৮৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা চালু হয়। উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি বা আত্মিক তৃপ্তির জন্য পূজার্চনা করা আর পূজার্চনার নামে শোষিত হওয়া এককথা নয়। পূজার্চনার নামে এই শোষণের ক্ষেত্রটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন দশরথ দেব। কিছুটা সফল হয়েছেন। আজও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির সাঁকো দশরথ দেব। সাঁকোটি ত্রিপুরার বুকে অক্ষয় থাকুক। ●

[আজকাল ১৪-৪-৯১]



মণিপুরীদের চিরাচরিত পোষাকে দশরথ দেব

এলিট ভাইরাসে আক্রান্ত হননি



বীরেন দত্ত

শুধু উপজাতিদের মধ্যেই নয়, হিন্দু এবং মুসলমান — সবার মধ্যেই উনি দারুণ জনপ্রিয়। আমার তো মনে হয়, এককভাবে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে উনিই সবচাইতে বড় 'ক্রাউড পুলার'। লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দশরথবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৪৫ সালে। মঙ্গলেশ্বরীদের বাড়িতে। কামালঘাটে। তখনও ওদের বিয়ে হয়েছে কিনা মনে করতে পারছি না। মঙ্গলেশ্বরীর বাবাও ছিলেন আমাদের পার্টি কমরেড। কামালঘাটে মঙ্গলেশ্বরীদের বাড়িতে সেদিন আমাদের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল — কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জনশিক্ষা সমিতির সম্পর্ক কী হবে। তখন অবিভক্ত কুমিল্লা জেলা কমিটির অধীনে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির একটা লোক্যাল সেল ছিল। আমি তার সদস্য ছিলাম। দশরথবাবু তখনও পার্টিতে আসেননি। যাই হোক, সেই বৈঠকে দশরথবাবু জনশিক্ষা সমিতিকে সরাসরি একটি পার্টি সংগঠনে পরিণত করার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, এর ফলে সংগঠনটির গণচরিত্র নষ্ট হবে। আমাদের অন্যান্য কমরেড অঘোর দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মার ছিল অন্যমত। আমি কিন্তু দশরথবাবুর যুক্তিটাকেই সমর্থন করলাম। এতে ওঁরা আমার ওপর একটু বিরক্ত হন। পরবর্তী ঘটনা কিন্তু তাঁর বক্তব্যকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। এই হল দশরথ দেব। আবেগে চলেন না, যুক্তি ছাড়া ওঁকে কিছু বোঝানো কঠিন। ওঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠাকে সময় সময় বাইরে থেকে মনে হয় গোয়ার্তুমি। বাঙালি কমরেডদের অনেকের তাই প্রথমে ওঁকে বুঝতে অসুবিধা হয়। জাতিগত প্রশ্নের সমাধান ছাড়া ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শিকড় ছড়ানো মুশকিল। দশরথবাবু ত্রিপুরায় এই সমস্যা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সাধারণভাবে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন উপজাতি-জাতি সমস্যা এখনও অবধি সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু দশরথবাবু ব্যতিক্রম। কমিউনিস্ট আন্দোলনের একেবারে গোড়ার দিকে ত্রিপুরায় উপজাতিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৯ শতাংশ। ওঁর সঠিক নেতৃত্বে আমরা হয়ে উঠলাম তাদের 'আনি ববর' (কাছের মানুষ)। আমার মনে হয়, দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মহল যদি সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে ওঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন, তাহলে আমরা আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারতাম। বর্ণ হিন্দু শভিনিজম আমাদের সর্বনাশ করল। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতেই জাতি-উপজাতি সমস্যা,

বিদ্রোহ, অসন্তোষ, শোষণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের উর্বর জমি তৈরি করে রেখেছে। আমার তো মনে হয়, এই সমস্যাগুলি সমাধানের মধ্য দিয়ে এই বিরাট এলাকায় আমাদের পার্টিকে প্রসারিত করার কাজে দশরথবাবু একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যাকে তুলে ধরার জন্য উনিই সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। ওঁকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারায় আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আজও আমরা তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, সংগঠন ক্ষমতা তো রয়েছে। কিন্তু ওঁর রাজনৈতিক জ্ঞান, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা কারও থেকে কম নয়। আমার রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা[illegible] [illegible]েছি অনগ্[illegible]ন, পিছিয়েপড়া সম্প্রদায় থেকে আসা শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতারা এক ধরনের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আক্রান্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টিতেও এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু উনি কোন এলিট ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। শ্রেণীচরিত্র ত্যাগ করেননি। একটা ঘটনার কথা বলি। ৫২-তে আমরা দুজনেই লোকসভায় নির্বাচিত হবার পর দিল্লি গেলাম। কমিউনে থাকি। রান্নার তদারকির দায়িত্বে ছিলেন সুন্দরাইয়ার স্ত্রী লীলা। আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গেছি। খাওয়ার অভ্যাস আলাদা। দক্ষিণী রান্না সবার মুখে রোচে না। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে মুখ ফুটে কিছু বলেও না। দশরথবাবু কিন্তু একদিন পরিষ্কার বলে দিলেন, আমাদের 'ফুড হ্যাবিট' আলাদা। আমাদের সবাইকে একই রান্না খেতে বাধ্য করা ঠিক না। যারা অন্যরকম খেতে চায় তাদের নিজের মত রেঁধে খেতে দেওয়া হোক। এরপর থেকে সেই নিয়মই চালু হয়ে গেল। ক্যাবিনেট মিটিং কিংবা পার্টি মিটিংয়েও দেখেছি উনি নিজের বক্তব্য জোর গলায় বলছেন। শুধু উপজাতিদের মধ্যেই নয়, হিন্দু এবং মুসলমান- সবার মধ্যেই উনি দারুণ জনপ্রিয়। আমার তো মনে হয়, এককভাবে গোটা উত্তর পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে উনিই সবচাইতে বড় 'ক্রাউড পুলার'। লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাইরে থেকে কেউ ওঁকে চাপিয়ে দেয়নি। কাকদ্বীপের হিরো কংসারি হালদার-নৃপেন চক্রবর্তী, ময়মনসিংহের হিরো মণি সিং। কিন্তু ত্রিপুরার হি[illegible] বীরেন দত্ত নয়, দশরথ দেব। ●

[আজকাল ১৪-৪-৯১]



১৯৯৭— মহাকরণে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের সঙ্গে আলোচনারত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব। পাশে আছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শেষ আশা পূর্ণ হলো না



বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা

ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষাদীক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য দশরথ দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা জনশিক্ষা সমিতির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই আন্দোলনের ফলে জনশিক্ষা আন্দোলন ত্বরান্বিত ও গতিশীল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের মঙ্গলের জন্য চিরদিনই তিনি কাজ করে গেছেন।

রাজ্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা প্রয়াত দশরথ দেবের সহপাঠী ছিলেন আশারামবাড়ী কেন্দ্রের প্রাক্তন-বিধায়ক বিদ্যা দেববর্মা। তিনি প্রয়াত দশরথ দেবের সাথে ৪০ এবং পঞ্চাশের দশকে বহু আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ জন্য বিদ্যা দেববর্মাকে সামরিক বাহিনীর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। প্রয়াত দশরথ দেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, বিদ্যা দেববর্মাকে সামরিক শাসনের আমলে মিলিটারিরা তাকে দারুণভাবে মারধোর করে ক্যাম্পে নিয়ে বেল গাছে দড়ি বেঁধে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে। জ্ঞান ফিরে এলে আবার মারে। এইভাবে দুইদিন সমানে তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন করা হয়। আধা পঙ্গু অবস্থায় মিলিটারি ক্যাম্প থেকে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

স্কুলজীবনের সহপাঠী দশরথ দেব সম্পর্কে আজ বিদ্যাবাবু বলেন, একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তারা। খোয়াই হাইস্কুলে দুজনই একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন। দশরথ দেব বয়সে বিদ্যাবাবুর চেয়ে ছিলেন ছোট। কিন্তু স্কুলজীবন থেকেই দশরথের নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়েছিল তাদেরকে। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই ভাল। কুলেশ চক্রবর্তী, নরেশ সাহা, ভোলা চ্যাটার্জী, মণীন্দ্র মজুমদার প্রমুখরাও দশরথবাবুর স্কুলমিট ছিলেন। ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে দশরথবাবু ব্রিটিশ অবিভক্ত হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি আই এ এবং বি এ পাশ করেন। স্কুলজীবন থেকেই অর্থাৎ খোয়াই হাইস্কুলে পড়াশুনা করাকালীন সময় থেকেই দশরথবাবু জাতি-উপজাতি ছেলেমেয়েদের জন্য জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলেন। সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা প্রমুখরা এই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। তখন শিক্ষা আন্দোলনের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। তাতে খোয়াই বিভাগের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তৎকালীন সময়ে খোয়াই, কল্যাণপুর, আগরতলা উমাকান্ত ও কৈলাসহরে সরকারীভাবে স্কুল ছিল। অন্যান্য স্থানে বেসরকারীভাবে গোটা কয়েক স্কুল থাকলেও শিক্ষাকে জনগণের কাছে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো কোনো গতি ছিলনা।

ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যাতে শিক্ষাদীক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য দশরথ দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা জনশিক্ষা সমিতির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই আন্দোলনের ফলে জনশিক্ষা আন্দোলন ত্বরান্বিত ও গতিশীল হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের মঙ্গলের জন্য চিরদিনই তিনি কাজ করে গেছেন। আমাদের অনেককেই তিনি প্ল্যান করিয়ে আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক বুঝিয়ে দিতেন। আন্দোলন করতে গিয়ে তাকে জীবনের এক বৃহৎ অংশ এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। তার নামে দীর্ঘদিন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। তবে তাকে কারাবাস করতে হয়নি। তিনি অভিভাব : ...তেমন সহযোগিতা না পেলেও তৎকালীন উপজাতি যুব সমাজ তাকে দেবতাসম বলে মনে করত। ফলে সারা ত্রিপুরাব্যাপী তিনি সক্রিয়ভাবে সার্বিক সহযোগিতায় সংগঠন গড়ে তুলে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার উপরই সংগঠনের সমস্ত দায়ভার ন্যস্ত ছিল। দশরথবাবু বিদ্যাবাবুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সদর দক্ষিণ, সিমনা, সোনামুড়া, সাব্রুম ও বিলোনীয়ার।

কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর বিদ্যাবাবু দশরথবাবুর নেতৃত্বেই ১৯৬৫ সাল নাগাদ কল্যাণপুরের দায়িত্ব পান। ১৯৭৩ সালে তিনি নিজ এলাকা আশারামবাড়িতে দায়িত্ব পেয়ে ফিরে আসেন। বিদ্যাবাবু তার অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে জানালেন, এক সংকটময় মুহূর্তে দশরথবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর এক-একটি কথা উপজাতি জনসমাজের কাছে খুবই গুরুত্বের বিষয় ছিল। প্রতিটি মানুষকে সচেতন করে তুলতে তিনি সারাজীবন চেষ্টা করে গেছেন। শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় তার অবদান রাজ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আংশিক ক্ষতি হলেও বড় ধরনের কোনো ঢল নামবে না বলে তিনি জানান।

বিদ্যাবাবু আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, গতকালই তিনি দশরথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলেন। সেজন্য সকাল নয়টায় স্নান করে তৈরিও হয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেননি। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদে তিনি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েন। আজ দুপুরে খোয়াই থেকে তিনি আগরতলায় তাঁর মৃতদেহ দেখতে ছুটে যান। তিনি আরও জানান, গতকাল গে... তার সঙ্গে হয়তো বা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতো। কিন্তু তার সেই শেষ আশা পূর্ণ হলো না। ●

[দৈনিক সংবাদ ১৫-১০-৯৮]



কখনও তাঁকে কোন কিছুতেই বিচলিত হতে দেখিনি



দীনেশ দেববর্মা

দশরথদা আমাদের বরাবরই বলতেন, শত্রুর আক্রমণের মুখে পিছু হটলে চলবে না। শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠনের মূল লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

১৯৪৪ সাল। জনশিক্ষা আন্দোলনের আগে আমরা কমলপুরে তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। সেই খবর পেয়ে কমরেড দশরথ দেব আমাদের সাথে দেখা করতে মহারানী গ্রামে যান। তখন যাতায়াতের তেমন কোন রাস্তা ছিলনা। গাড়ীর তো প্রশ্নই ওঠে না। খোয়াই থেকে আঠারোমুড়া পাহাড়ের পেত্রামুড়া দিয়ে দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে তিনি আমাদের গ্রামে আসেন। তাঁর সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম দেখা। সেদিন সন্ধ্যা হয় হয়। আমাদের লংতরাই ক্লাবের বত্রিশ জন সদস্য সভায় মিলিত হই। কত তারিখ সভাটি হয়েছিল তা আজ মনে পড়ছে না। তবে মাসটি ছিল আশ্বিন। দশরথদা আমার কাছ থেকে সব বিষয় জেনে নিয়ে বললেন, আন্দোলন শুধু কমলপুরেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তা সমগ্র ত্রিপুরাতে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর সেই সভায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য দায়িত্ব ভাগ হয়ে যায়। পরবর্তী সময় তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে কমলপুর, কৈলাসহর-সহ সর্বত্র। কমলপুর তখন কোন আলাদা ডিভিশন ছিলনা। ছিল কমলপুর থানা। এই আন্দোলন চলাকালেই গঠিত হয় জনশিক্ষা সমিতি। দশরথদা ছিলেন তার পুরোধা নেতৃত্ব।

সেই থেকে দশরথদার সাথে আমার রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন, আমার প্রতি ছিল তাঁর অসীম আস্থা ও বিশ্বাস। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম শুধুমাত্র পার্টি নেতা হিসাবেই নয়, বড় ভাইয়ের মত। কি প্রকাশ্যে কি গোপনভাবে এ রাজ্যে গণ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। আমি যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলাম তখনও সে সম্পর্ক অটুট ছিল। একজন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে কাজ করতে গিয়ে কোথাও সমস্যা হলে দশরথদার পরামর্শ নিতাম।

আমি দশরথদার মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। আমি তাঁর শোকার্ত পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য সহযোদ্ধাদের প্রতি জানাচ্ছি সমবেদনা। আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন। আজ স্মৃতিচারণায় অনেক কিছু ভেসে এলেও লেখার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নই।

কমরেড দশরথদাকে কোনদিন অন্যায়ের কাছে, এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মাথা নোয়াতে দেখিনি। এ রাজ্যে জনশিক্ষা আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্য তৎকালীন মহারাজা ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ণ চালিয়েছিলেন। সেই সময়ে মহারাজা

দশরথদাসহ আরও কয়েকজন নেতাকে ডেকে নিয়ে শাসিয়ে বলেন, শিক্ষার আন্দোলনের নামে রাজনীতি করলে গুলি করে মেরে ফেলব। কিন্তু দশরথ দেব সেদিন বীরদর্পে বেরিয়ে এসে আন্দোলন আরও বেগবান করে তোলেন। প্রবল আন্দোলনের চাপে মহারাজা জনশিক্ষা সমিতির ৪৮৮টি স্কুলকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন।

১৯৫১ সালের ১৫ই আশ্বিন আগরতলা শিশুউদ্যানে প্রজামণ্ডলের আহ্বানে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক বিরাট জনসমাবেশ সংগঠিত হয়। সমাবেশ চলাকালে কমরেড সুধন্ব্যা দেববর্মা গ্রেপ্তার হন। প্রতিবাদে পাঁচ হাজার মানুষ তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। সে সময় পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ করা ছিল কঠিন। শেষ পর্যন্ত সুধন্ব্যা দেববর্মাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনের এক সন্ধিক্ষণে প্রজামণ্ডলের নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ আমরা গঠন করি। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন তার সভাপতি। সম্পাদক ছিলেন সুধন্ব্যা দেববর্মা। পরবর্তী সময় পার্টি ভাগের পর মুক্তি পরিষদও ভাগ হয়। আমরা ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ গঠন করি কমরেড দশরথ দেবকে সভাপতি করে।

১৯৫০ সালে দশরথদা সহ আমরা পার্টির সভ্যপদ লাভ করি। তখন কংগ্রেসী রাজত্ব। গণআন্দোলন দাবিয়ে দিতে ব্যাপক দমন-পীড়ণ নামিয়ে আনা হয়। চীফ কমিশনারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, ত্রিপুরার জন্য আলাদা বিধানসভার দাবিতে যে আন্দোলন সংগঠিত হয় তার সামনের সারিতে ছিলেন দশরথদা।

আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করার সময় পার্টি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবুও আন্দোলনের খবর, জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে দশরথদার কাছে ছুটে যেতাম। প্রসঙ্গত ১৯৫০ সালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কমলপুরে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল। দাঙ্গাবাজরা কুলাই, লাটিয়াবিল (আভাঙ্গা)-র ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপক লুটপাট চালায় হালাহালিতে। আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে সীমান্ত চাম্পারাই বাগান দিয়ে মুসলিম জনগণকে পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলাম। একজনকেও আমরা খুন হতে দেইনি। দাঙ্গাবাজরা চেয়েছিল কমলপুর ছেড়ে খোয়াইতে আসতে। আমরা তা প্রতিরোধ করি। আমি খোয়াইতে এসে দশরথদাকে এসব ঘটনা জানালে তিনি খুব খুশি হন এবং আমাদের কাজের প্রশংসা করেন।

পার্টি গঠন, পার্টি ভাগ, জেল খাটা, আত্মগোপন ইত্যাদি নানা সময়ে দশরথদা ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। চীন ভারত যুদ্ধের সময় রাজ্যের ৬৮ জন নেতাকে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমি ছাড়াও কমরেড ভানু ঘোষ, সাধনা চক্রবর্তী, বীরেন দত্ত, বেণু সেন, যোগব্রত সেন, দেবব্রত চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হই। কল্যাণপুরে পার্টি সম্মেলনের পর কমরেড দশরথ দেব সহ আরও কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হন। আমাদের হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের পাঠানো হয় দুমকা জেলে। কোন সময়েই তাঁকে বিচলিত হতে দেখিনি। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের স- । দশরথদা সহ আমি কমলপুরের বলরামে একটি সমাবেশে যাচ্ছিলাম। গণ-দুশমনরা ওত পেতেছিল আমাদের শেষ করে দিতে। পথে এম্বুশ থেকে আমরা বেঁচে গেলেও ড্রাইভার সহ একজন কনস্টেবল প্রাণ হারান। সম্প্রীতির শত্রুরা ধূমাছড়ার পথে গ্রেনেড ছুঁড়ে দশরথদাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। গ্রেনেড না ফাটায় তিনি বেঁচে যান।

দশরথদা আমাদের বরাবরই বলতেন, শত্রুর আক্রমণের মুখে পিছু হটলে চলবে না। শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠনের মূল লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য জাতি-উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। পার্টির ভিত গড়ে উঠেছে এই ঐক্যের মধ্য দিয়েই। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

কমরেড দশরথদা স্মরণে



অঘোর দেববর্মা

এই জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমাজে শিক্ষার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। সমাজের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করে।

কমরেড দশরথদার প্রয়াণে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত মর্মবেদনা বোধ করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের লোকজনদের প্রতি আমার অন্তরের মর্মবেদনা জানানোর ভাষা নেই। তবে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি এই সান্ত্বনাটুকু দিতে চাই কমরেড দশরথদা আর নেই এই বাস্তবতাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

২) কমরেড দশরথদার প্রয়াণে ত্রিপুরার আপামর জনতা রাজ্যের সবচাইতে জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে হারাল। জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে হারানো একটা দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই।

৩) ১৯৪২ সন পর্যন্ত কমরেড দশরথদা পুরাতন ত্রিপুরা ছাত্রাবাস থেকে উমাকান্ত' একাডেমীতে পড়াশুনা করেছিলেন। তখনই দশরথদার সাথে আমার পরিচয়। আমি তখন নতুন ত্রিপুরা ছাত্রাবাস থেকে উমাকান্ত একাডেমীতে পড়াশুনা করতাম। কিন্তু গত ১৯৪২ সালে বোর্ডিং ছাত্রদের আচমকা বোর্ডিং ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তৎকালীন মহারাজ প্রয়াত বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পুরোনো ত্রিপুরা ছাত্রাবাসটিই বন্ধ করে দেন। তখন ঐ বোর্ডিং-এর গার্জিয়ান প্রয়াত রামকুমার ঠাকুর, কমরেড দশরথদা ও দ্বারিকবাবুকে টি সি সার্টিফিকেট দিয়ে খোয়াই হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন।

৪) ১৯৪৫ সালে কমরেড দশরথদা যখন সিলেট ডিস্ট্রিক্ট-এর হবিগঞ্জ কলেজে পড়তেন তখন আমি ও ডাক্তার নীলমণি দেববর্মা সেখানে গিয়ে তিনজনে একসঙ্গে বসে দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে উপজাতি ছাত্র-যুবকদের সম্মেলন আহ্বান করার তারিখ ঠিক করি। যথাসময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমঃ সুধন্বা দেববর্মা প্রেসিডেন্ট ও কমরেড হেমন্ত দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কমরেড দশরথদা সহ-সভাপতি ও অঘোর দেববর্মাকে কার্যকরী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর জনশিক্ষা সমিতি নামকরণ করা হয়। এই জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমাজে শিক্ষার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। সমাজের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করে। কমরেড দশরথবাবু ও কমরেড অঘোর দেববর্মা জনশিক্ষা সমিতির সক্রিয় কর্মী হিসেবে উভয়ই

খুবই ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন।

৫) গত ১৯৪৮ সালে কলকাতার মহম্মদ সফী পার্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করার সময় কমরেড দশরথবাবুও তখন কলিকাতায় এম এ পড়তেন। তখন কমরেড দশরথদার সাথে বসে জ্যৈষ্ঠ মাস বন্ধের সময় তিনি বাড়ীতে এলে কি কি করা হবে তার রূপরেখা ঠিক করা হয়। তখন জনশিক্ষা সমিতির সমস্ত নেতৃত্ব ও কর্মীদের প্রজামণ্ডল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। প্রজামণ্ডলের আন্দোলনের দাবি দাওয়া জনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং পি ডি এ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ইত্যাদি আন্দোলনের প্রোগ্রাম ছিল। দশরথদা ও আমি এলাকা ভাগ করে নিয়েছিলাম। তিনি সদর উত্তর থেকে খোয়াই ও কমলপুর। আমি সদর দক্ষিণ থেকে উদয়পুর ও বিলোনীয়া ইত্যাদি। প্রজামণ্ডলের প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে গিয়ে জনমতের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। তখন সদর উত্তর লেফুঙ্গা গ্রামের স্কুলে গত ১৯৪৮ সালে রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়। রাজ্যের মুসলমান মণিপুরী ও হিন্দুস্থানীরাও এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠনের সময় কমরেড বীরেন দত্তও উপস্থিত ছিলেন। কমরেড দশরথদা প্রেসিডেন্ট ও অঘোর দেববর্মা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তারপর আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৬) এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কমরেড দশরথদাকে একবাক্যে প্রায় সবাই এ রাজ্যের জাতি-উপজাতির মিলনের সেতু হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি নিজেও এ রাজ্যে জাতি-উপজাতির মিলনের সেতু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য কমরেড দশরথদার জাতি-উপজাতির মিলনের সেতু আজ মরণের ফাঁদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। রাজ্যের জাতি-উপজাতির পরস্পরের আস্থা, বিশ্বাস, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংহতির চূড়ান্ত বিপর্যয়। কাজেই কমরেড দশরথদা সারাজীবন জাতি-উপজাতির মিলনের সেতুটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সংগ্রাম করে গেছেন সেই মিলনের সেতুটিকে সামগ্রিকভাবে মেরামত বা পুনর্গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। মূল কথা হচ্ছে এখন কমরেড দশরথদার প্রতি শ্রদ্ধা, তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকের উচিত রাজ্যের জাতি-উপজাতির মিলনসেতুর মধ্যে যে মরণ ফাঁদ তৈরি হয়ে আছে সেই মরণ ফাঁদকে অপসারণ করা অর্থাৎ রাজ্যের জাতি-উপজাতির মধ্যে যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে আছে তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত সংগ্রাম করে জাতি উপজাতির মধ্যে পরস্পরের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান অ- ীয় ও উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার সংগ্রাম করাই আমাদের সকলের কর্তব্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এটাই প্রয়াত কমরেড দশরথদার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখার একমাত্র উপায় বলে আমি মনে করি। ●

[দৈনিক সংবাদ ১৫-১০-৯৮]

[লেখক সি পি আই রাজ্য পরিষদের সদস্য ছিলেন]

কমরেড দশরথ দেব চির অম্লান হয়ে থাকবেন



রঞ্জন রায়

দশরথ আজ মরেও অমর। ত্রিপুরার হাজার হাজার পাহাড়ী-বাঙালীর বুকে বুকে চোখে চোখে তিনি চির অম্লান — চির ভাস্বর।

সদর উত্তরে বড়মুড়ার উপর হলং সিকী নামক জুমিয়া গ্রামে গণমুক্তি পরিষদের নেতাদের নিয়ে এক সভা হয়। পার্টির পলিটব্যুরো থেকে কমরেড প্রাণেশ বিশ্বাসকে সভায় পাঠানো হয়। আমিও সিলেট থেকে এসে এই সভায় যোগ দিই। এই সভাতেই আমি প্রথমবারের মতো কমরেড দশরথ দেব-কে দেখি। সবুজ লুংগী তাঁর পরনে। গায়েও সবুজ-রংয়ের হাফহাতা শার্ট। পিঠে একটি দো-নলা বন্দুক ঝোলানো। সভাস্থলের পাশেই আমাদের জন্য রান্নার কাজ চলছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই খবর এলো মিলিটারীরা নাকি এদিকে আসছে। মিলিটারী আসার সংবাদে কমরেড দশরথ দেব উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সবাই উঠে দাঁড়ালাম। দশরথ দেব পিঠের ঝোলানো বন্দুকটি নিজের হাতে নিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এক এক জন করে আমার পেছন পেছন আসুন।" আমরা সবাই নিজ নিজ অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম। শুরু হলো ছোট আঁকাবাঁকা পথে আমাদের নিঃশব্দ যাত্রা। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। এরমধ্যে আবার শুরু হয়ে গেলো বৃষ্টি। গভীর অন্ধকারে পথ চলতে অসুবিধা হচ্ছিল— তবুও টর্চলাইট জ্বালানো নিষেধ। আমাদের মধ্যে কে জানি একজন আবার পাহাড়ী জোঁকের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করলো সবাইকে।

এভাবে অনেকক্ষণ পথচলার পর নীরব মিছিল হঠাৎ থেমে গেল। থামার কারণ আর কিছুই নয়, একটি বাঘ। আমাদের সামনে দিয়েই একটি বাঘ রাস্তা পার হচ্ছে। বাঘ কিন্তু নিশ্চিন্তে পথ অতিক্রম করে সে রাস্তা পার হয়ে গেল। আমাদের যাত্রাও আবার শুরু।

ভোরের আলো ফুটে উঠার সাথে সাথেই আমরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের অসমাপ্ত সভা সেখানেই করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই সভার মাধ্যমেই কমরেড দশরথ দেব সহ গণমুক্তি পরিষদের অন্য কয়েকজন নেতা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন।

এরপর থেকে শুরু করে দীর্ঘ চার দশকের বেশী সময় তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করেছি।

আজ দশরথ দেব নেই— কিন্তু অতীতের টুকরো টুকরো ছবিগুলি স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে। হয়তো বা বিচলিতও করছে।

১৯৫২ ইং সনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গহন-অরণ্যে কত যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি তার কোন গোনাগাঁথা নেই। কিছুদিন বাদেই নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেল। তখন দশরথ একদিন আমাকে এক গুরুদায়িত্ব দিয়ে বসলেন। জানালেন— "খোয়াই হইতে একজন অনুপজাতি প্রার্থী দেওয়া হইবে। কাকে প্রার্থী করা যায় তুমি জানাইও।" আমি কোনদিন খোয়াই শহরে যাইনি। কাউকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনিও না। এরপর অবশ্য খোঁজ করে কমরেড সতীশ চক্রবর্তীকে প্রার্থী করা হয়েছিল।

পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে দশরথ দেব প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু মনোনয়ন দাখিল করার সময়ে কংগ্রেস আপত্তি তুলল। তাদের বক্তব্য দশরথের পদবী দেববর্মা। কিন্তু মনোনয়ন পত্রে লেখা হয়েছে দশরথ দেব। অতএব মনোনয়নপত্র বাতিল করা হোক। ভোটার লিস্ট বের করে কংগ্রেস দলের আপত্তিকারীকে দেখানো হল এবং সেখানে দশরথ দেব-ই লেখা ছিল। প্রথমবারের মতো তারা ব্যর্থ হয়ে আবার আপত্তি তুললো। এবারে তাদের অভিযোগ যে— দশরথ দেব মারা গেছেন। মনোনয়নপত্রে তাঁর স্বাক্ষর নাকি জাল। যদিও পরে তাঁদের এই আপত্তি বাতিল হয়ে যায়। ঠিক এইরকমই কমরেড রামচরণ দেববর্মা ও কমরেড রবীন্দ্র দেববর্মার প্রার্থী পদে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও তারা আপত্তি তোলে। যদি ও অহেতুক আপত্তি বাতিল হয়ে যায়।

সেই নির্বাচনে দশরথ দেব বিপুল ভোটে পার্লামেন্টে বিজয়ী হন ! কিন্তু তখনো তাঁর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হয়নি। Warrant বাতিলের দাবিতে আমরা মিছিল বের করি। মিছিল করার সময়েই আমরা খবর পাই warrant প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এরপর খোয়াই-এর লালছড়ার মাঠে জনসভা হয়। দশরথ, হেমন্ত, রামচরণ এরা সবাই এই জনসভার মধ্য দিয়ে জনগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁদের দেখার জন্য মানুষের কী অসীম আগ্রহ ! হাজার হাজার নর-নারী সেদিন জমায়েত হয়েছিলো। এই জনসভার পর থেকেই মূলত পার্টির প্রকাশ্য কাজকর্ম শুরু হয়। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবার পর প্রথম দিকে দশরথ রাজঘাটে তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে থাকতেন। এরপর তিনি আগরতলায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। এখানেই তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। রাজ্য কমিটির সভা সেরে খোয়াই ফেরার পথে আমি তাঁকে দেখতে যাই। তখন তিনি আমাকে বললেন —"তুমি কি খোয়াই চলে যাচ্ছ ?" আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন — "যাও আমি মরে গেলে তোমাদের কি !" আমি বললাম— "আপনি মরবেন কেন ?" তিনি বললেন— "আমার স্ত্রী টাইফয়েড রোগের নার্সিং সম্পর্কে কিছুই জানে না।" আমি তখন বললাম— "আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমি থেকে যাব।" তিনি বললেন, "ব্যাস, তাহলে তো ভালই।" এরপর আমি থেকে যাই।

ঐ সময় তাঁর রাশিয়া যাবার কথা ছিল। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি রাশিয়া যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী তখন তাঁর চিকিৎসা করতেন। নন্দলালবাবু দশরথ দেবকে প্রতিদিন একটি করে মোরগের জুস খাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি প্রতিদিন দু'টি করে মোরগের জুস খাওয়াইবে। আমি দ্রুত আরোগ্য হতে চাই।" তাই আমাকে বললেন, "তুমি আমাকে দিল্লি পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।" দু'দিন পর আবার তিনিই বললেন, "না, আমি একাই যেতে পারব।" তখন তিনি একাই দিল্লি গিয়েছিলেন।

আত্মগোপন করে থাকার সময় দেখেছি মুলিবাঁশের জঙ্গলের ভিতরে জনসভা ডাকা হতো। চারিদিক থেকে হাজার হাজার লোক এসে সমবেত হত। সভা শেষ করেই দশরথ চলে যেতেন। জঙ্গলের ভিতরে এতবড় সভা। পুলিশ কিন্তু কিছুই জানতে পারেনি। উপজাতি এলাকাতে কমিউনিস্ট ধরার নামে যখন মিলিটারী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে তখন দেখেছি এই নির্ভীক সেনাপতি আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন। এলাকার তীব্র খাদ্য- সংকটের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ শহরের অফিস-আদালত ঘেরাও করেছে খাদ্যের দাবিতে। সরকার বাধ্য হয়েছে টেস্টরিলিফের কাজ দিতে। লেভীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দশরথ জেলে গেছেন। এইসব আন্দোলনের মাধ্যমে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে পরমবন্ধু রূপে আস্থা অর্জন করে। দশরথকে উপজাতিরা মুক্তিদাতা রূপে মনে করতো। তখন উপজাতি এলাকায় দশরথ নামের অবলুপ্তি ঘটেছে। তখন তাঁর নাম হয়েছে লাম্প্রা। সংক্ষেপে লাম্প্। অনুপজাতি এলাকাতেও এই নামে ডাকা হতো। তখন কৃষক সমিতি, উদ্বাস্তু সমিতি ইত্যাদি গঠিত হয়। উদ্বাস্তুরা তাদের বিভিন্ন দাবিতে আগরতলা অভিযান করে। উদ্বাস্তুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে তখন রাস্তায় রাস্তায় গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে ক্যাম্প করা হতো। উপজাতিরা বিভিন্ন সময়ে উদ্বাস্তুদের মিছিলেও যোগ দেয়। এইসব কারণে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে অনুপজাতিদের ভ্রান্ত ধারণা বহুলাংশে কেটে যায়। ফলে অনুপজাতি এলাকাতেও দশরথের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করতে হলে গণমুক্তি পরিষদকে আগে দুর্বল করতে হবে এটা কংগ্রেস উপলব্ধি করেছিল। তাই উপজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা পাল্টা উপজাতি সংগঠন, আদিবাসী কংগ্রেস, উপজাতি উন্নয়ন সমিতি ইত্যাদি গঠন করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। উপজাতিদের তাদের দলে টানতে পারেনি। কিছু শিক্ষিত উপজাতি যুবক মিলে যুব সমিতি গঠন করে। তারা প্রথমে গণমুক্তি পরিষদ ও দশরথের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালায়। গত পঞ্চাশ বছরের গণমুক্তি পরিষদ এবং কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস যারা জানে না এই নতুন প্রজন্মের মধ্যেই তারা কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তাদেরই দলে টানতে পেরেছে। কিন্তু দশরথের নেতৃত্ব অটুট রয়েছে। গত দুইটি নির্বাচনই তার প্রমাণ।

আজ যখন দশরথ দেবের মতো নেতার খুব প্রয়োজন— তখনই তিনি বিদায় নিলেন। দশরথের মৃত্যুতে ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়লো।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর মতো নেতার সম্পর্কে সব লেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতিও নেই। আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের এই সাথীকে শেষ দেখা দেখতে পারিনি। এই জন্য আমি মর্মাহত। তিনি পাহাড়ী-বাঙালীদের কত বড় নেতা ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর শোকাহত হাজার হাজার জনতার শোকযাত্রাই তার প্রমাণ।

দশরথ আজ মরেও অমর। ত্রিপুরার হাজার হাজার পাহাড়ী-বাঙালীর বুকে বুকে চোখে চোখে তিনি চির অম্লান — চির ভাস্বর। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

লড়াইয়ের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন



সমর চৌধুরী

ত্রিপুরায় বামফ্রন্টকে রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় এনেছে উপজাতি-অনুপজাতি মেহনতি শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের ঐক্য। এই ঐক্য গড়ে তুলতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন কমরেড দশরথ দেব।

১৯৫২ সালের জুনে যখন ত্রিপুরায় এলাম তখন দশরথদা দিল্লিতে। ঐতিহাসিক নির্বাচনী সংগ্রামে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের সব চাইতে প্রিয় নেতা তখন ত্রিপুরার লড়াইকে জাতীয় স্তরে নিয়ে গেছেন।

কেন্দ্রের নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় ত্রিপুরা উপজাতি কৃষক ও জুমিয়াদের স্বার্থে এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের স্বার্থে বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবী উত্থাপন করে তিনি লড়েছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনে টেরিটোরি ত্রিপুরা সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তার মাথার উপর ঝুলছে। তাঁকে ধবে এনে দেবার জন্য তাঁর মাথার দাম ১০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে সরকার। রাজ্যে কমিউনিস্ট এবং গণমুক্তি পরিষদের শতশত নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে অসংখ্য সাজানো মামলা ঝুলছিল। সরকারের সকল শক্তি প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে আছে। রাজনৈতিক বন্দীসহ জেলে আটক শত শত। গ্রামে গ্রামে আক্রমণ হামলা তখনও চলছে বিশেষ করে উপজাতি নেতা ও কর্মীদের ঘরে ঘরে। সারা দেশে ১৯৪৮ সালে নেহেরু সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলির সকল নেতা ও কর্মী আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণের পরও বহু নেতা ও কর্মীর প্রকাশ্য কাজের সুযোগ আসে নি। আগরতলায় জুন মাসেরই একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। আমার গ্রামে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরার পার্টি নেতা সুধন্বাদার (কমরেড সুধন্বা দেববর্মা) সাথে কামান চৌমুহনী পার্টি অফিস থেকে রওয়ানা হয়েছি। বটতলা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসে উঠে বসেছি। হঠাৎ পুলিশ এসে সুধন্বাদাকে তুলে নিয়ে গেল। কোন্ অভিযোগে আমরা তার কিছুই জানতে পারলাম না। নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা চলছিল। গ্রামে ও শহরে রাজ্যের সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। দুই এম পি কমরেড দশরথ দেব এবং কমরেড বীরেন দত্ত ত্রিপুরায় এই স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে নেহরু

সরকারকে চেপে ধরলেন। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম দিল্লিতে কথা বলার জন্য গণতন্ত্রের সংগ্রামে আইনের ক্ষমতায় নির্বাচন করে পাঠানো হয়েছিল। জনগণের আত্মরক্ষার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের লড়াই ময়দান থেকে সরাসরি জাতীয় সংসদে উপস্থিত হয়ে কমরেড দশরথ দেব স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবীতে দৃঢ় কণ্ঠে লড়েছেন। লোকসভার সদস্য পরিচিতির প্রথম ভাষণেই নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে তার চ্যালেঞ্জ রেকর্ড হয়ে আছে। ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ থেকে জনগণ তাকে শক্তি যুগিয়েছেন। চার বার লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে ত্রিপুরার উপজাতি-জাতি সকল মেহনতি জনগণকে সংগঠনে ও গণ-আন্দোলনে সংগঠিত করতে নিজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনে মন্ত্রিসভায় অংশ নিয়ে এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নেতৃত্ব দিয়ে ত্রিপুরার গণআন্দোলনকে জনবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছেন। পরিষদীয় গণতন্ত্রের সংসদীয় রীতিনীতির মধ্যে যদিও তিনি যুক্ত ছিলেন কিন্তু শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী হারান নি। উপজাতি জনগণের আত্মবিকাশ ও উন্নয়নে ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রই প্রধান শত্রু এই শিক্ষা তিনি দিয়েছেন। শত্রুদের শক্তি বিশ্লেষণ করে উপজাতি-অনুপজাতি সকলের কাছে তাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "দুইটি পৃথক জাতিগোষ্ঠী উপজাতি এবং বাঙালী অংশের মধ্যে একতাকে রক্ষা এবং শক্তিশালী না করে ত্রিপুরার কৃষক আন্দোলন বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। বিশেষভাবে প্রায় সমস্ত বিভেদমূলক শক্তিগুলি এ রাজ্যে যখন খুবই সক্রিয়। বুর্জোয়া জমিদার স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেস ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বাধা। কংগ্রেসের বরাবরের পলিসি হলো বাঙালী এবং উপজাতীয়দের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং এই অনৈক্য থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে তারা যখন বৈরী মনোভাব দেখাত তখন তারা দেখত বাঙালীদের স্বার্থের প্রতি খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন। এটা করা হত একটিমাত্র উদ্দেশ্যে যাতে বাঙালীদের সমর্থন আকর্ষণ করা যায়। বাঙালীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশ।"

ত্রিপুরার প্রতিটি মার্ক্সবাদী কর্মী এবং গণতন্ত্র সচেতন মানুষ বার বার নূতন ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণের আঘাত থেকেই টের পাচ্ছেন লড়াইটা সহজ নয়। ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে ভাঙ্গার জন্য ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ এনেছিল ১৯৮০ সালে। সংখ্যালঘু উপজাতি জনগণের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যখন এগিয়ে এলো আমরা বাঙালী দল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে শুরু করলো। টি এন ভি উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী দলের জন্ম দিলো উপজাতি যুব সমিতি। এদের লক্ষ্য দুই জাতিগোষ্ঠীর ঐক্য ভেঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে খতম করা। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামফ্রন্ট জনগণের সাথে থেকে দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০'র জুনের জাতি দাঙ্গার আগুন নিভিয়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই উপজাতি-অনুপজাতি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কমরেড দশরথ দেব এই ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে গৌরবজনক নেতৃত্ব দিয়েছেন। গণমুক্তি পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস (আই) টি এন ভি-কে দিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ত্রিপুরায় সেনা নামিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রাজ্য

সরকারের ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। প্রহসনে পরিণত হয়েছিল সেই নির্বাচন। কংগ্রেস (আই) - যুব সমিতি জোট এভাবেই ক্ষমতায় বসে। জোটের পাঁচ বছর আধা ফ্যাসিস্ট রাজত্বে আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল উপজাতি জনগণ এবং অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষ। ত্রিপুরার ঐক্য ও সম্প্রীতি আবার ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে পড়ে। ১৯৯৩ সালে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামফ্রন্ট উপজাতি-অনুপজাতি ঐক্যের শক্তিতেই জনগণের সাথে থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামে জয়ী হয়ে ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বামফ্রন্টকে পুনরায় সরকারের ক্ষমতায় এনেছে।

ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে নেই। বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দুই জাতিগোষ্ঠীর ঐক্য ও সম্প্রীতিকে ভাঙ্গার জন্য বিভেদকামী শক্তিগুলি তৎপর। এর সাথে হাত মিলিয়েছে বাঙালী সাম্প্রদায়িক উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি। মৃত্যুর পূর্বেও কমরেড দশরথ দেব এই চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন— সি পি আই (এম) এবং গণমুক্তি পরিষদের নেতা ও কর্মীদের আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করে এই সকল ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। ঐক্য ও সম্প্রীতির নেতাদের এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন না করে ওরা গণ আন্দোলনের ঐক্য ভাঙতে পারবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের চিনিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে জনবিচ্ছিন্ন করেই ওদের পরাস্ত করতে হবে ভুল পথ থেকে বিভ্রান্ত যুবকদের ফিরিয়ে আনতে হবে। অধিকার হিসাবেই বন্দুকের আক্রমণ থেকে জনগণের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য আদায় করে আনতে হবে।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্টকে রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় এনেছে উপজাতি-অনুপজাতি মেহনতি শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের ঐক্য। এই ঐক্য গড়ে তুলতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। উপজাতি কৃষক সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তির একটি প্রধান স্তম্ভরূপে কয়েক দশক ধরে উপজাতি জনগণের একটি সুসংগঠিত শক্ত ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই কাজের শুরু। গণমুক্তি পরিষদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ সংগঠন শিল্পে কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। হিন্দুস্থানী এবং হিন্দু ও মুসলিম বাঙালী গরিবদের সাথে উপজাতি জনগণের ঐক্য এবং সম্প্রীতি দৃঢ় হয়েছে। রাজ্যে গণতন্ত্রের জন্য গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটেছে। দায়িত্বশীল শাসনের দাবি ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে বিধানসভা এনেছে। গণ-আন্দোলনের মধ্যেই জনগণ শত্রু মিত্র চিনেছেন। ভোটের অধিকারকে শক্তিশালী করেছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে ধনী জমিদারদের কর্মসূচীর বিকল্প একটি বামপন্থী কর্মসূচী নিয়ে এখন ত্রিপুরা লড়ছে। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পা[illegible] এই সমগ্র লড়াই সংগ্রামে প্রধান ভূমিকায় রয়েছে।

কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর সংগ্রামী জীবনধারা থেকে শিক্ষা ও পথ নির্দেশ নিয়ে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও মার্ক্সবাদীদের সামনে এগোতে হবে। ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যেই কমরেড দশরথ অমর হয়ে থাকবেন। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

জাতি-উপজাতি মানুষের ঐক্যের জ্বলন্ত প্রতীক



ভানু ঘোষ

"কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে গণমুক্তি পরিষদই উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন সহ অন্যান্য দাবিতে লড়াই করছিল। গণমুক্তি পরিষদের অবস্থান ছিল উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরা থেকে তাড়ানো যাবে না। এখানেই ওদের পুনর্বাসন দিতে হবে। ......"

কমরেড দশরথ দেবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৫১ সালে খোয়াই-র একটি গ্রামে পার্টির কর্মী সভায়। তখন পার্টিতে বাঙ্গালী অংশের মানুষ কম ছিলেন। আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানে পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম তারাই এখানে এসে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজকর্ম শুরু করি।

পার্টির ঐ কর্মীসভায় কমরেড দশরথ দেব আমাকে ডেকে নিয়ে জানতে চাইলেন আমি এর আগে কোথায় কাজ করেছি এবং কোন্ গণ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি বললাম— আমি কুমিল্লা জেলার পার্টির নেতৃত্বে তপশীলি অংশের গরিব শ্রমজীবী মানুষ এবং বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৫০ সালে আত্মগোপন অবস্থায় আগরতলায় এসেও আমি প্রথমে বিড়ি শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করি। তখন আগরতলায় সূর্য বিড়ি, কালীঘাট বিড়ির রমরমা বাজার ছিল। দশরথ দেব খুব দরদ দিয়ে আমাকে বললেন 'কমরেড, আপনাকে এখানেও একই কাজ করতে হবে'। কেননা বাঙ্গালী অংশের মানুষের মধ্যে আমাদের তেমন কোন সংগঠন এখনও গড়ে উঠেনি। উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে।'

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হিসাবে যারা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন গরিব অংশের মানুষ। কিন্তু সুবিধাবাদী এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষীরা তখন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই বলে অপপ্রচার করছিল যে এটা তিপরাদের পার্টি, এদের সঙ্গে যাবেন না। আরও অনেক অপপ্রচার ছিল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে গণমুক্তি পরিষদই উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন সহ অন্যান্য দাবিতে লড়াই করছিল। গণমুক্তি পরিষদের অবস্থান ছিল উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরা থেকে তাড়ানো যাবে না। এখানেই ওদের পুনর্বাসন দিতে হবে। একই অবস্থান ছিল সংখ্যালঘু মুসলিম ও হিন্দুস্তানী শ্রমিকদের সম্পর্কে। এই মূল বক্তব্যকে সামনে রেখেই গড়ে উঠে 'ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি' নামে একটি সংগঠন।

সদর মহকুমার গান্ধীগ্রাম, নতুননগর, পটুনগর, বড়জলা, চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জ, চাম্পামুড়া প্রভৃতি অঞ্চল এবং জিরানীয়া, চম্পকনগর প্রভৃতি এলাকায় গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে জঙ্গল কেটে শুরু হল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও গণমুক্তি পরিষদ কর্মীরা অনুরূপ উদ্যোগ নিলেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতির উদ্যোগে শুরু হল উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করার কাজ। দশরথ দেবের নেতৃত্বে শুরু হল আন্দোলন।

উদ্বাস্তুদের শুধু বাস্তুভিটার সংস্থান করা নয়। জীবন-জীবিকার প্রশ্নে অনশন ইত্যাদি আন্দোলনেও গণমুক্তি পরিষদের ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। এই অনশন আন্দোলনের সময় অনাহারে থেকে থেকে বিশ্বম্ভর নমঃদাস নামে একজন উদ্বাস্তুর অকাল মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুকে ঘিরে গোটা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের আন্দোলন আরো তীব্র চেহারা নেয়। গণমুক্তি পরিষদ তখন সর্বশক্তি নিয়ে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায়।

আজকে পার্টি পরিচালিত গণ-সংগঠনগুলির চেহারা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে গণ সংগঠনের এই ব্যাপক চেহারা সেই সময়ে ছিল না। মূলত গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন ও উদ্যোগের ফলেই আজ কৃষকসভা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, নারী সমিতি, শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন সি আই টি ইউ, ছাত্র-যুব-শিক্ষক-কর্মচারী সহ অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছে।

১৯৫২ সাল। দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নতুননগর, চাম্পামুড়া, কাঞ্চনমালা, মোহরছড় প্রভৃতি এলাকায় গিয়ে দশরথ দেব বললেন— কোন উদ্বাস্তু অনাহারে থাকতে পারবে না, কাউকে না খেয়ে মরতে দেয়া যাবে না। এ কাজে গণমুক্তি পরিষদকে প্রধান ভূমিকা নেয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। নির্বাচনে দশরথ দেব আত্মগোপন অবস্থাতেই বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেন। সাংসদ হিসাবে শপথ নিয়ে আগরতলায় ফেরার পর অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জানানো হল তাঁকে। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু জনসভায় ভাষণ দেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল জাতি-উপজাতির ঐক্য শক্তিশালী করা।

উদ্বাস্তু আন্দোলন থেকে শুরু করে যে ঐক্যের আওয়াজ উঠেছিল আজ পাঁচ দশক পর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও সে শ্লোগান সমানভাবে কার্যকরী। জাতি-উপজাতি ঐক্যের প্রশ্ন বাদ দিয়ে গণ-আন্দোলনের কথা এখানে চিন্তাই করা যায় না। ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির ঐক্য গড়ে গণ-আন্দোলন শক্তিশালী করার প্রশ্নে কমরেড দশরথ দেব ঐক্য ও সংহতির সেতুবন্ধনের যে কাজ করেছেন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এর নজীর নেই।

কমরেড দশরথ দেব আজ আমাদের মধ্যে নেই। পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পৃথিবীতেই মারা যায়। কোন মানুষই অমর হয়ে থাকে না। কিন্তু কিছু মানুষ যারা কমরেড দশরথ দেবের মতো তাঁরা মৃত্যুর পরও মানুষের মধ্যে অমর হয়ে থাকেন। তাঁরা বেঁচে থাকেন তাদের নীতি-আদর্শ এবং কাজের মধ্য দিয়ে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

কিছু স্মৃতি কিছু কথা



খগেন দাস

প্রকৃত মার্কসবাদী হিসাবে তিনি মনে করতেন নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হলে সংগঠন, আন্দোলনের ব্যাপকতা বাধা-প্রাপ্ত হবে— বিলম্বিত হবে সমাজ পরিবর্তনের কাজটিও, এমনিভাবেই তিনি তাঁর জীবনে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

স্পষ্টবাদী, ভাণ-ভণিতার বালাই নেই, দৃঢ়তার সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করা, আদর্শে অবিচল ও লক্ষ্যে অটল, আদর্শ প্রচারে নিরন্তর-মুখর, অগণিত কর্মী গড়ার কারিগর, দক্ষ সংগঠক, মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা— ইত্যাদিসব কিছু মিলে একজন অসাধারণ কমিউনিস্টের গুণাবলী ছিল দশরথদার মধ্যে। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন বলেই দূর-দূরান্তের হাজার-হাজার জাতি-উপজাতি মানুষ দশরথদাকে দেখার জন্য, তার বক্তব্য শোনার আগ্রহে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন সভা-সমাবেশে। দীর্ঘক্ষণ ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন অকাট্য যুক্তি জালে সহজ-সরল ভাষায় কখনো কক্‌বরকে, কখনো বাংলায় শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচারের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা এবং তার প্রতিরোধে, প্রতিকারের উদাত্ত আহ্বান শ্রোতাদের শিরায় শিরায় উত্তেজনা সৃষ্টি করতো।

আমাদের পার্টিতে ব্যক্তিগত আনুগত্য, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। সামন্ত-পুঁজিবাদী সমাজের সহজাত এই কুৎসিত প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়। দশরথদা ছিলেন এ সংগ্রামের সফল প্রতিনিধি এবং আজীবন সংগ্রামী। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, তিনি সংগ্রাম করেছেন অশিক্ষার বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে, জোতদার মহাজনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে। সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম করেছেন জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির পক্ষে। তিনি আজীবন উপজাতি সর্বস্বতা, সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির সেতু।

চিন্তায়, আদর্শে, কর্মে তিনি ছিলেন প্রকৃত বিপ্লবী। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ভারতের মাটিতে সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিচল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শ্রেণীসংগ্রাম, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই, বাঁক-মোড়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেছেন

সংগ্রাম। অবিচল থেকেছেন কঠিন পরিস্থিতিতেও।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি কর্মসূত্রে (শিক্ষকতা) আমি ত্রিপুরায় আসি। ত্রিপুরার 'মুকুটহীন রাজা দশরথ'-এর অনেক গল্প কাহিনী শুনেছি। তখনও পরিচয় হয়নি তাঁর সঙ্গে। শুনেছি রাশভারী প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। দেখার ইচ্ছা ছিল। হঠাৎ একদিন সুযোগ এসে গেল 'মুকুটহীন রাজা' র সাথে দেখা করার। আমার এক বন্ধু এসে খবর দিলেন— দশরথদা আমাকে দেখা করার জন্য ডেকেছেন। ছুটির দিন বটতলায় পার্টির রাজ্য দপ্তরে সকাল ১০: ৩০টার মধ্যে হাজির হলাম। দেখা হল দশরথদার সাথে। প্রথম সাক্ষাতেই কোন ভণিতা না করে বললেন— মাষ্টার, একটি বিষয়ে আলোচনার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমরা তোমাকে একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব দেবার চিন্তা করছি। তিনি সরাসরি কাজটি সম্পর্কে আমার কাছে প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ়তার সাথে আমি বললাম

ত্রিপুরায় এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল। রাজ্যের মানুষ সম্পর্কে, আমার নিজের বিভাগের জনগণের সম্পর্কে কোন ধারণা ও আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠেনি, এই অবস্থায় আপনার প্রস্তাবিত গুরুদায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পার্টির অন্য যে কোন কাজ দিলে তা আমার সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করবো। আমার বক্তব্য শোনার পর চটপট বলে দিলেন— বুকে পাটা না থাকলে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাহস না থাকলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি করা এত সহজ নয়! চেনা-জানা, আলাপ-পরিচয় নেই। প্রথম সাক্ষাতেই এই ধরনের কাটখোট্টা কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মন খারাপ করে পার্টি অফিস থেকে নেমে এলাম। পরবর্তী সময়ে পার্টির কাজকর্ম করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ যখন হয়েছে তখন দেখলাম— এ অন্য এক মানুষ বিশাল হৃদয়, অমায়িক, দরদী দশরথ দেব।

১৯৭৫-৭৬ সাল দেশে জরুরি অবস্থা। আমাদের বেশ কিছু নেতা ও কর্মী জেলখানায় আটক। আরো বেশ কিছু কমরেডদের নামে ঝুলছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমার নামেও ঝুলছে। আত্মগোপন করে আছি। নেতৃত্বের মধ্যে দশরথদা সহ ২/১ জন কমরেড প্রকাশ্যে কাজ করতে পারছেন। একদিন একজন কমরেড ছোট একটা খামে চিঠি নিয়ে আমার গোপন আস্তানায় উপস্থিত। খাম খুলে দেখি দশরথদার হাতে লেখা চিঠি। আত্মগোপন অবস্থায় কিভাবে শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কাজ করতে হবে এই বিষয়ে স্বল্প কথায় সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল এই চিঠিতে। আত্মগোপন থেকে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। দশরথদার এই চিঠি আমাকে গোপন অবস্থায় কাজ করার সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আরেকবার গোপন স্থান থেকে খবর পাঠাই, দশরথদার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তখন পার্টির কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার অস্পষ্টতা ছিল। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে চাই। একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে দশরথদা এলেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনলেন। এখনো সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার অস্পষ্টতা দূর করতে সাহায্য করলেন। তিনি বললেন— "কমিউনিস্ট পার্টিকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে, কখনো আইনী, কখনো বে-আইনী, কখনো গণনির্ভর, কখনো চক্র নির্ভর, কখনো সংসদীয় বা কখনো সংসদ বহির্ভূত পথে, কখনো শান্তিপূর্ণ কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের পথে কমিউনিস্টদের লড়াই চালাতে হয়। শত্রুদের আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্য যেমন যেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে— তেমনিভাবে দ্রুত

পরিস্থিতি অনুযায়ী সংগঠন তৈরি করতে হবে।" সুতরাং মনোবল অটুট রেখে আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে কাজ করে যাও। এই ছিল তাঁর সেদিনের নির্দেশ।

পার্টির প্রবীণ নেতাদের কাছ থেকে বহুবার শুনেছি মতাদর্শগত সংগ্রামে দশরথদার অগ্রণী ভূমিকার কথা। ৬০-এর দশক ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর মতাদর্শগত লড়াই-এর দশক। তখন সংশোধনবাদের প্রাধান্য। এরাজ্যে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম দশরথদা। পরবর্তী সময়ে পার্টির ভেতর অনৈক্য সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ঝোঁকের বিরুদ্ধে সঠিক সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে পার্টিকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার ভূমিকা প্রতিপালন করতে দেখেছি। ৮০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ৯০-দশকের প্রথম দিকে পার্টির কাজকর্মে তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি, তখন তিনি পার্টির রাজ্য সম্পাদক। সে সময় পার্টির ভেতর একাংশ কর্মী পার্টির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির অপপ্রয়াস, গোষ্ঠীবাজী, শৃঙ্খলা বিরোধী ইত্যাদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি বিরুদ্ধ কাজের মাধ্যমে পার্টিকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তখন পার্টির ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য এবং ঐ ভুল প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে দশরথদা ছিলেন অবিচল, অচঞ্চল, লক্ষ্যে অটল। তেমনি আরেকটি ঘটনা। খুব সম্ভবত ৭০-এর দশকের প্রথমদিকে পার্টির বিভিন্ন স্তরের সম্মেলন চলছিল। আমি তখন আগরতলা লোক্যাল কমিটির অধীনে কাজ করছিলাম। পার্টির আগরতলা লোক্যাল কমিটির সম্মেলন হচ্ছে মলয়নগরে একজন কমরেডের বাড়ীতে। সেই সম্মেলনে আমিও একজন প্রতিনিধি ছিলাম। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দশরথদা। যে বাড়ীতে সম্মেলন, সেই বাড়ীর উঠানে অনেক লংকা গাছ। প্রচুর লংকা ধরে আছে। প্রতিনিধিদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা হলো। কয়েকজন কমরেড গাছ থেকে কিছু লংকা তুলে নিল। তা দশরথদার নজর এড়ায়নি। সাথে সাথে সেই কমরেডদের দশরথদা ডাকলেন। বাড়ীর মালিককে না বলে লংকা তুলে নেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে বলে ঐ কমরেডদের সমালোচনা করলেন। সমালোচনার পর তিনি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে গেরিলা যোদ্ধাদের বিপ্লবী শৃঙ্খলা রূপায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। লেনিন মার্কসবাদীদের আচরণে সৌজন্য ও শিষ্টাচারকে অন্যতম গুণরূপে চিহ্নিত করেছেন। এ কথা পড়েছি লেনিনের কথায়, আবার এ কথা শুনলাম দশরথদার মুখে। তিনি বললেন প্রতিটি কমিউনিস্টদের কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে— তার কাজের মাধ্যমে, আচরণে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মাধ্যমেই মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাস, আস্থা অর্জন করতে হবে এবং লড়াই সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে হবে মানুষকে।

বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৯৭৮ সালে সরকারে এলো। দশরথদা হলেন এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী। আমিও সে সময় বিধানসভার একজন নির্বাচিত সদস্য। আমি দেখেছি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা। তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি যৌথ নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা। ৪০-এর দশকে যাঁর নেতৃত্বে এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে পৌঁছেছিল অক্ষরের আলো, সেই মানুষটিকে দেখলাম আরো আগ্রহ নিয়ে তা প্রসার করতে। এ রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য প্রতিটি মহকুমায় গড়ে তোলা হলো মহাবিদ্যালয়। গড়ে তোলা হলো ত্রিপুরার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ানো হলো ছাত্রদের স্টাইপেন্ড, চালু হলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিল, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত (মেয়েদের

জন্য কলেজ স্তর পর্যন্ত) বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, পুনর্গঠিত হল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদে ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়া হলো। গ্রাম-পাহাড়ে, আনাচে-কানাচে গড়ে উঠলো বিদ্যালয়, চালু হলো উপজাতি ছাত্রদের জন্য শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত কক্‌বরক ভাষা। স্বীকৃতি দেয়া হলো মণিপুরী ভাষার। এ রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলন কখনো বিস্মৃত হবে না দশরথদার নাম। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তাঁকে পেয়েছি উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। আমিও সে সময় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। দেখেছি ছোট-বড় কাজেও পার্টির সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে। ওঁর কাছ থেকে অর্জন করেছি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা।

'৯৩ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী দশরথদা। পার্টির সিদ্ধান্ত— মুখ্যমন্ত্রীর কাজকর্মে আমাকে সাহায্য করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম করার নিপুণতা দেখার সুযোগ আমার হয়। শেষের দিকে অসুস্থ শরীর নিয়েও অন্তত নিয়মিত একবেলা অফিসে আসতেন। কোন কাজ ফেলে রাখা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। প্রকৃত মার্কসবাদী হিসাবে তিনি মনে করতেন নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হলে সংগঠন, আন্দোলনের ব্যাপকতা বাধা-প্রাপ্ত হবে— বিলম্বিত হবে সমাজ পরিবর্তনের কাজটিও। এমনিভাবেই তিনি তাঁর জীবনে তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

দশরথদা নেই। কিন্তু যে বুনিয়াদ তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তার উপর দাঁড়িয়ে গণ আন্দোলন,গণ সংগ্রামে গতিবেগ সঞ্চার করার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের স্বভাবে, চরিত্রে মননে আর বিশাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনীর মধ্যে তিনি আমাদের বিরাট প্রেরণা। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক চিত্ত বসুর স্মরণসভায় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব। পাশে রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ

কমরেড দশরথ



অনিল সরকার

মূঢ় ম্লান মূক
বেদনার
অতল আর্তদান থেকে
একদিন একজন মানুষ
জন্ম নিলেন
অগ্নিশিখা হবার জন্য

অরণ্য পর্বত এবং
আর্ত জনপদে
তিনি জন্ম দিলেন
প্রতিবাদ
প্রতিরোধ
একটি নতুন জাগরণ
বুকের ব্যথায় জ্বলে উঠল
দাবানল

চির অসম্মান থেকে
ফুঁসে উঠল বিদ্রোহ।
অবণত আর
অবদমিতেরা জেগে উঠল
অপরাজেয় স্বপ্নের
স্বাধিকারে।

তিনি চলে যাবার পর
জেগে রইল
উত্থানের আরও তীব্র
অগ্নিময় শিখা
এবং
চতুর্ধারে নক্ষত্ররাজির মতো
মৃত্যুহীন উষ্ণতা।

[১৪-১০-৯৮ দিল্লী থেকে]





কমরেড দশরথ দেব

সিতাংশুশেখর দাস

মহাজীবনের পথে দশরথ দেব
মহাজীবনের দীর্ঘ সুখদুঃখের মালা
আমাদের জন্যে বিছিয়ে দিয়ে গেছেন
গভীর অরণ্য আর লুঙ্গার বুকে,
মোরগের অক্লান্ত ডানায়
সকালের কচি ঘাসে বিন্দু বিন্দু শিশিরের জল।

এমন দুরন্ত আশা দশরথ দেব
এমন জীবন্ত ভালবাসা
বিশ্বাসের দৃঢ়তায় মাঠে মাঠে সমুদ্র গর্জন
নামহীন গোত্রহীন মানুষের ঐক্যের সংগ্রামে
বজ্রের গাঁথুনি দিলে দশরথ দেব,
দীপ্তিমান মানুষের জন্যে।

অবিশ্বাসী ! কী হবে বন্দুকে ?
থামাও বন্দুক যদি দেহে থাকে অবশিষ্ট
মাতৃভূমি ত্রিপুরার একফোঁটা জল !
জীবনের মহাশিল্পী মানুষের জন্যে,
দেখে যাও, রেখে গেছে বিশ্বাস অতল।

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

অরণ্য পথিক

প্রদীপ সরকার

তোমার সম্মুখে ছিল
শুধু দুটি পথ,
রাজন্য বৈভব
নতুবা মৃত্যুর ছোবল।

অতি ঘৃণা ভরে
প্রত্যাখ্যান করে
রাজার সম্মান
'জীবিত কি মৃত'
দশ সহস্র মুদ্রার
রাজদণ্ড নিয়ে শিরে,
তুমি হয়েছিলে বিত্তহীন মানুষের —
হৃদয়ের রাজা।

উমেদারী সুখ ছিল অসহ্য তোমার।
এ মাটির পৃথিবীকে তাই
স্বর্গ বানাতে,
তুমি নেমেছিলে মাটির একান্ত বুকে,
প্রোমিথিউস !

ওদের অত্যাচারের
ক্ষত চিহ্ন বয়ে
নিষ্কাশিত তোমার দেহের
রক্ত কণিকা,
আঁধারে জ্বেলেছে দীপ
লক্ষ লক্ষ প্রাণে !

ভাঙে বাস্তিল, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়,
ভাঙে সুরক্ষিত রাজার প্রাসাদ,
কিন্তু ভাঙতে পারেনি তোমার
লক্ষ বাহুর বেষ্টনী
আর রক্তের পরিখায়
সম্প্রীতির দুর্গ আজো আছে
দুর্ভেদ্য অটুট।

এখনো সতর্ক প্রহরায়
সেনানী তোমার,
অতন্দ্র কাটায় কত
দুর্যোগের রাত !

হাতে হাতে জ্বালে মশাল
তোমার বহ্নি শিখায়
আঁধারের বুক ভাঙে
চেতনার ঘা-য়।
বুকের পাঁজর ভাঙে
ভাঙতে দেয়না তবু
তোমার গড়ে তোলা
ঐক্যের ইমারত।

তাই আজ শরতে, বিদায় মেঘের
শেষ যাত্রা-পথে
তোমার নিথর দেহ
করিছে আহ্বান,
এখনো ছুটিছে মানুষ—
উন্মাদের প্রায়
মন্ত্র মুগ্ধের মত !
পেয়েছে নির্ভীক নাবিকের
শেষ নির্দেশ।

জন প্লাবনে ভাসায় সমভূমি
ভাসায় অরণ্যের শীর্ষ প্রদেশ।
জানান দিয়ে যায় সঠিক পন্থার,
সত্য কি ভালবাসায় ?

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

তাঁর সংগ্রামী জীবনই আমার প্রেরণা



মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা

মাঝে মাঝে 'চিরকূট' আসতো— 'তিনি ভালো আছেন'। আর নির্দেশ থাকতো— তিনি কোথায় আছেন সেকথা যাতে কাউকে না বলি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তি পরিষদের কর্মীরা খবর নিয়ে আসতেন। ছাতার বাঁশের বাটের ভেতরে ফুটো করে ঐসব চিরকূট আনা-নেওয়া হতো।

বিয়ের আগেই আমি কমরেড দশরথ দেব-এর নামের সাথে পরিচিত ছিলাম। তখন রাজ্য জুড়ে চলছে জনশিক্ষা আন্দোলন। একদিন খবর পেলাম— আমাদের গ্রাম রাজঘাটে (সদর উত্তরাঞ্চল) একটি সভায় তিনি আসবেন। খবর পেয়ে গ্রামের অন্যান্যদের সাথে আমিও ছুটে গিয়েছিলাম সভায় এবং সেই প্রথম তাঁকে সামনা-সামনি দেখার সুযোগ পাই। তাঁর সুঠাম দেহ এবং সাবলীল ভাষণ আমাদের আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে রাজঘাটে আমার শিক্ষক তারামোহন দেববর্মার বাড়ীতে তিনি আসতেন। আমি এই বাড়ীতেই পড়াশুনো করতাম এবং থাকতাম। আমার শিক্ষকই তাঁর সাথে বিয়ের আলাপ দেন। সালটি ছিল ১৯৪৯। আমার বা আমাদের পরিবারের কারোরই এই বিয়েতে আপত্তি ছিল না। এরকম একজন সুন্দর জ্ঞানী যুবককে বিয়ে করতে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলাম। শেষে ফাল্গুন মাসের কোন এক তারিখে আমরা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হই। বিয়ের খরচ গ্রামবাসীরা মিটিয়েছিলেন। কেউ দিয়েছিলেন— চাল, ধান, কেউবা সব্জি। কমরেড দশরথ দেব এই 'গ্রামের জামাই' হয়েছেন— এটাই যেন গ্রামবাসীদের গর্ব ছিল।

বিয়ের পর চার-পাঁচ মাসের বেশি আমাদের একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয়নি। গণ-আন্দোলন দাবিয়ে দিতে তখন চলছিল মিলিটারী শাসন। কুখ্যাত তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে খোয়াই-র পদ্মবিলে প্রাণ হারান তিন বীরাঙ্গনা কুমারী - মধুতী - রূপশ্রী। আমার স্বামী দশরথ দেব আত্মগোপনে চলে যান। তারপর তাঁর সঙ্গে চার বছর দেখা হয়নি। সেই সময় প্রথম দিকে আমি বাপের বাড়ীতে ছিলাম। এরপর আমাকেও চলে যেতে হয় উত্তরাঞ্চলের বড়কাঁঠাল পেরিয়ে একটি উঁচু টিলায় হলঙসিকিতে। আমাকে দীর্ঘ সময় এখানে আত্মগোপনে থাকতে হয়। আমি যাদের বাড়ীতে থাকতাম তাদের সাথে জুমের ফসল কাটতে জঙ্গলে চলে যেতাম। দুপুরবেলা সবাইকে রান্না-বান্না করে খাওয়াতাম— এই ছিল আমার কাজ। ভীষণ ইচ্ছে করতো তাঁকে দেখার জন্য। কিন্তু কোন সুযোগ ছিল না। মাঝে মাঝে

'চিরকূট' আসতো--- 'তিনি ভালো আছেন'। আর নির্দেশ থাকতো— তিনি কোথায় আছেন, সেকথা যাতে কাউকে না বলি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তি পরিষদের কর্মীরা খবর নিয়ে আসতেন। ছাতার বাঁশের বাটের ভেতরে ফুটো করে ঐসব চিরকূট আনা-নেওয়া হতো। ফুটোগুলি মাটি দিয়ে ভরাট করা হতো— যাতে কেউ বুঝতে না পারেন।

মিলিটারীর শাসন উঠে যাওয়ার পর শান্তি সেনা নিয়ে সেনাপতি দশরথ দেব একবার আমাদের রাজঘাটের বাড়ীতে (বাপের বাড়ী) আসেন। প্রায় চার বছর বাদে এটাই ছিল আমার প্রথম দেখা। ১৯৫২ সালে লোকসভার ভোট হয়। তিনি এম পি হয়ে দিল্লি চলে যান। তখন তাঁর মাথার দাম ছিল দশ হাজার টাকা। দিল্লি যাবার সময় তিনি আমাকে বললেন— "আমি যে দিল্লি যাচ্ছি একথা কিন্তু কাউকে বলবে না। এমনকি তোমার মা-বাবাকেও না।" আমি এই নির্দেশ পালন করেছিলাম। প্রায় একমাস পর তিনি বাড়ী আসেন। যদিও এর আগে দশ হাজার টাকা পাওয়ার লোভে তাঁকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল।

সদর উত্তরাঞ্চলের তমাকারিতে একদিন রাতে কমরেড দশরথ দেবের সভা করার কথা। তিনি সভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় একজন মহিলা এসে খবর দিলেন- -একই স্থানে কংগ্রেসের সভা হবে। তাই পূর্ব নির্ধারিত সভাটি বাতিল করা হয়। সংসদে যাবার আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়ে আগরতলায় ফিরে আসার পর শিশু উদ্যানে পার্টির ডাকে বিরাট সমাবেশ হয়। কমরেড দশরথ দেব-কে এখানে সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর দিল্লি যাবার সময় আমিও তাঁর সাথী হই। ভারতের রাজধানীতে আমি একমাস ছিলাম।

১৯৫৭ সালের আগে আমি আমার বাপের বাড়ী রাজঘাটে থাকতাম। প্রায় তিন বছর আগরতলায় ভাড়া বাড়ীতে ছিলাম। তারপর নিজের বাড়ীতে। দশরথ দেব সব সময় চাইতেন--- আমিও যেন তাঁর মতো রাজনীতি করি। রাজঘাট জে বি স্কুলে চার বছরের শিক্ষকতা জীবনের ইতি ঘটিয়ে আমি সক্রিয় রাজনীতিতে শামিল হই। ১৯৫৩ সালে আমি পার্টির সভ্যপদ পাই। সভা, সমাবেশ সব কিছুতেই আমি যোগ দিতে শুরু করি তাঁর অনুপ্রেরণায়। একদিন যদি কোন সভায় না যেতাম তাহলে ভীষণ রেগে যেতেন। বই কিনে দিতেন --- নন্দন, দেশহিতৈষী এবং অন্য পার্টি সাহিত্য। পত্রিকা পড়ার, খবর শোনার প্রতি তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন। এই তো সেদিনকার কথা। মৃত্যুর দু'দিন আগে তাঁকে রেডিও-র ব্যাটারী কিনে দিতে হয়েছিল। আমার এখন মনে পড়ছে আমার বড় ছেলের বয়স মাত্র দশ মাস। বেহালাবাড়ীতে শান্তি সম্মেলনে আমাকে এই অবস্থাতেই যেতে হয়েছিল তাঁর নির্দেশে।

আমাদের দাম্পত্য জীবনটা আর দশজনের মতো ছিল না। রাজনীতি নিয়েই কমরেড দশরথ দেব ব্যস্ত থাকতেন। আমাকেও ব্যস্ত থাকতে হতো নির্ধারিত কর্মসূচী নিয়ে। এক-দু'দিন বাড়ীতে থাকতেন। বেশির ভাগ সময় থাকতেন বাইরে। মাঝে মাঝেই পার্টির কর্মীদের নিয়ে তিনি বাড়ীতে আসতেন --- আমি তাদের রান্না করে খাওয়াতাম। যতটা বেশি সম্ভব তিনি আমাকে সভা-সমাবেশগুলিতে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাশাপাশি বসে গল্প করার সুযোগ আমাদের ছিল না। গ্রামের বাড়ীতে এলে তিনি লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে আমাকে হুঁকো ধরিয়ে দিতে বলতেন। দেখা যেত আগুন নিভে গেছে— কিন্তু তাঁর লেখা বা পড়া তখনও শেষ হয়নি।

সেই সময় আমি ভীষণ অসুস্থ। দু-দু-বার অপারেশন হয়ে গেছে। '৬৪ সালের কথা বলছি।

তিনি হাজারিবাগ জেলে বন্দী। অনেক চেষ্টার পর প্যারোলে মুক্তি পেয়ে আমাকে নিয়ে রাশিয়ায় যান। সে দিনগুলি আমার খুব ভালো লেগেছিল। চিকিৎসার পাশাপাশি আমরা বেড়াতে চলে যেতাম। এরপর আবার তাঁকে হাজারিবাগ জেলে যেতে হয়। আমি তাঁর সাথে রাজ্যের বাইরে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বোম্বে, ভুবনেশ্বর, দিল্লি, মাদ্রাজ, কেরালা, পুনা ইত্যাদি জায়গায়। এর ফলে পার্টির অনেক নেতার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল।

তিনি আমাকে বই পড়ার পাশাপাশি লিখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন— চেতনা বৃদ্ধি ও বিকাশে এই দু'টিরই প্রয়োজন। উৎসাহিত হয়ে 'কমিচাংবুড়া' (পুরনো বাড়ী) নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। লামায় এবং নন্দনে তা প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের প্রথম ছেলে রণজিৎ দেববর্মা ১৯৫৩ সালে জন্ম নেয়। এরপর প্রথম মেয়ে মঞ্জুলার জন্ম হয়। তিনি যখন হাজারিবাগ জেলে তখন দ্বিতীয় ছেলে টিপুর বয়স প্রায় দুই বছর এবং ছোট মেয়ে জয়া তখন কোলে। ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি তাঁদের সাধ্যমত দেখভাল এবং চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতাম। এখন আমার এক ছেলে দুই মেয়ে। ছোট ছেলে আট মাস আগে মারা গেছে। এর মধ্যেই আমি আমাব স্বামীকে হারালাম।

ছেলে-মেয়েদের তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন। আগরতলায় আসার পর সাইকেলে চড়ে সকালে বাজারে চলে যেতেন। মাছ, সব্জী আবার কোনদিন মাংসও কিনে আনতেন। এরপর স্নান করে পার্টি অফিসে চলে যেতেন। পরম যত্নের সাথে সন্তানদের জামা-কাপড় নিজের হাতে ধুতেন। আবার মাঝে মাঝে নিজেও রান্না করতেন। পুত্রবধূদের দেখতেন মেয়ের মতো। নাতি-নাতনীদের কোনদিন বকুনি দিতেন না। মৃত্যুর দিনকয়েক আগের কথা। টাকা বের করে দিলেন মাছ কিনে আনতে। ছোট ছেলে টিপুর মৃত্যুর পর তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। আমাদের সান্ত্বনা দিলেও তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতেন।

আমি যখন রাজঘাটে থাকতাম হাট-বাজার করার কাজটি অন্যেরা করতো। আগরতলায় আসার পর তাঁর ব্যস্ততার জন্য আমি নিজে বাজার করতাম। রাতে ছেলে-মেয়েদের পড়াতাম। আত্মগোপন, সাংসদ, বিরোধী দলনেতা, শিক্ষামন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ পার্টির সমস্ত কাজে যাতে কোন অসুবিধা না হয়— সেই চেষ্টাই আমি করে এসেছি। তাঁর কাজে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলে তিনি আমাদের বকতেন। তবে তিনি আমার কোন কথাই যে রাখতেন না— এমন নয়। একবার দিল্লিতে তাঁকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলাম 'দো কলিয়াঁ' সিনেমা দেখতে। আমি সিনেমা দেখছি। কিন্তু তিনি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। সিনেমা যখন শেষ— তখন তাঁকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললাম— চলো চলে যাই।

সেদিন তিনি ঘুম থেকে জাগলেও ১৪ অক্টোবর ভোরে জি বি হাসপাতালের ১৭ নম্বর কেবিনে যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন সে ঘুম আর ভাঙ্গেনি। আমার জীবনসঙ্গী, রাজনৈতিক অভিভাবককে হারিয়ে আমি শোকস্তব্ধ। রাজ্যবাসীর মতো আমি জননেতা কমরেড দশরথ দেব-এর প্রতি জানাচ্ছি লাল সেলাম। তাঁর অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা হয়ে রইল তাঁরই দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

মিলন সেতু

বিজন ধর



কমরেড দশরথ দেব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শকে অনুসরণ করে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন, তাকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে যাব সকল বাধা-বিঘ্ন আক্রমণ মোকাবেলা করে।

কলকাতা প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের ত্রিপুরা ভবন। ১৪ই অক্টোবরের সকাল। স্নান না সেরেই বাথরুম থেকে বেরুতে হল। শ্রীশদা আমাদের ঘরে এসেছেন। নির্ঘাত কোনও খারাপ খবর। না হলে এই সাত-সকালে শ্রীশদা আসবেনই বা কেন। ঠিক-ঠিকই খারাপ খবর। কমরেড দশরথ দেব আজ ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী জরুরি সভায় মিলিত হচ্ছে। সেখানেই বিস্তৃত কর্মসূচী গৃহীত হবে— শ্রীশদা জানালেন। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ঘরে অন্য যারা ছিল, তাদের মুখেও কোনও কথা নেই। এত বড় মাপের মানুষটিকে আর দেখব না। পার্টি মিটিং-এ গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনায় ওঁর সুচিন্তিত ও সংক্ষিপ্ত মতামত আর শুনতে পাব না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। কমরেড দশরথদা ভীষণ অসুস্থ ছিলেন, জানতাম। যে কোনও সময় তিনি চলে যেতে পারেন, তা-ও জানতাম। তবু এই নির্মম বাস্তবতাকে মেনে নিতে মন যেন সায় দিচ্ছিল না। পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি, যাঁরা তখন ত্রিপুরা ভবনে ছিলেন — তাঁরা মিলিত হলেন কমরেড দীনেশদা - ভানুদার ঘরে। এক মিনিট নীরবতা। কমরেড দশরথদা-র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালাম আমরা সকলে। চিন্তামগ্ন-চিত্তে পায়ে পায়ে কখন যে নীচে লনে এসে দাঁড়িয়েছি, বলতে পারব না। সম্বিত ফিরে এল পেছন থেকে কারও কণ্ঠস্বরে। 'জানেন, অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসবাদীরা আজ যা করছে ত্রিপুরায়, দশরথবাবু যদি সে-দিন তাই-ই করতেন, তাহলে ওপার বাংলা থেকে বাঙ্গালীদের ঠাঁই হত না ত্রিপুরায়'। কথাটা শুনে চমকে ওঠলাম। কথাটা কে বলছে? কোনও উপজাতি না বাঙ্গালীর কথা এটা ? ফিরে দেখি আগরতলারই এক শহুরে বাঙ্গালী ভদ্রলোক দশরথ দেবের মৃত্যুতে আত্মসমীক্ষামূলক এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন আমাকে লক্ষ্য করে। কী আশ্চর্য ! ঠিক এই কথাটাই বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও বলে থাকে, যদিও অন্য উদ্দেশ্যে। ওরা বলে থাকে 'মুক্তি পরিষদ'-এর অস্ত্র বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। দশরথ দেব নিজে উপজাতি হয়েও উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতি নাকি

বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন বাঙ্গালী বিতাড়ণের কাজটি, ওদের মতে সন্ত্রাসবাদী পথেই করতে হবে। উপজাতিদের জন্য আলাদা রাজ্য করতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবের বিরোধিতা করছে জি এম পি, বিরোধিতা করছে কমিউনিস্টরা। সুতরাং তাদের এক-এক করে সরিয়ে দাও। জাতি-উপজাতি মিশ্র জনবসতি অঞ্চলে এমনভাবে গণহত্যা সংগঠিত কর, যাতে উভয় অংশের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব তৈরি হয়, দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাহলেই কেল্লা ফতে। এই পরিকল্পনার পেছনে বিদেশী আগ্রাসনবাদীরা যেমন রয়েছে, তেমনি এখানকার বামবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এসবের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের হাতে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হওয়ার পর দেশে দেশে জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। তাতে অনুপ্রানিত হয়ে কমঃ দশরথ দেব ও সমসাময়িক অন্য কয়েকজন শিক্ষিত উপজাতি যুবক ত্রিপুরায় উপজাতি জনগণের মুক্তির পথ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। প্রথম কাজ হিসেবে তাঁরা বেছে নেন জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজকে। এটা করতে গিয়ে বাধা পান সামন্ততন্ত্রের কাছ থেকে। লড়াই শুরু হল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন চলল পাশাপাশি। চলল মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পুলিশী জুলুম নেমে আসে এই গণ-সংগ্রামের ওপর। শুরু হয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। গড়ে ওঠে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। আক্রমণ আরও তীব্র হল। প্রতিরোধ সংগ্রামও তীব্রতর হল।

কমরেড দশরথ দেব ও 'মুক্তি পরিষদ' অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলেন যে, সমাজতন্ত্র ব্যতীত বঞ্চিত, অবহেলিত কী উপজাতি কী বাঙ্গালী— কারও মুক্তি আসতে পারে না। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী। তার জন্য সব অংশের নিপীড়িত মানুষের ঐক্য দরকার। দরকার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা। তাঁরা স্পষ্ট বললেন— উপজাতিদের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী ত্রিপুরার রাজারা এবং পরবর্তী সময়ে দেশ ও রাজ্যে বড়লোকদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের জনবিরোধী নীতি। ভারতভুক্তির পর ত্রিপুরায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ঢল নেমেছিল। তাতে উপজাতিদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতেও 'মুক্তি পরিষদ' বরাবর দাবী করেছে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আর উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে তাদের রক্ষাকবচ ও আত্মবিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কংগ্রেস সরকার রাজ্যে যেভাবে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ভেঙেছে, অ-উপজাতিদের পুনর্বাসিত করেছে রাজনৈতিক বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে, কংগ্রেসের এই নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল আসল সংগ্রাম। ওই সংগ্রাম বাঙ্গালী-বিরোধী ছিল না কোনওমতেই। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মহাজন-জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোনওভাবেই বাঙ্গালী-বিরোধী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না।

সুতরাং আজকের এই উপজাতি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সেদিনকার 'মুক্তি পরিষদ' - এর সংগ্রামের মধ্যে কোনরূপ মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং প্রায় সব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হবে। 'মুক্তি পরিষদ' বন্দুক ধরেছিল জনশিক্ষা আন্দোলনকে রক্ষার জন্য, সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য, পুলিশ-মিলিটারীর আক্রমণের হাত থেকে সংগঠন ও জনগণকে বাঁচানোর জন্য, সর্বোপরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। প্রজার ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার চাই। ওই সংগ্রাম ছিল একটা জাতীয় আন্দোলনের মত, সন্ত্রাসবাদ নয়। আর

আজকের বন্দুকধারীদের টার্গেট উপজাতি অঞ্চলের স্কুল, উন্নয়নী কার্যক্রম, জনগণের ভোটাধিকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া। সব কিছু ভন্ডুল করে দাও। এটা সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এদের পেছনে এমনকি উপজাতি জনগণেরও ব্যাপক অংশের সমর্থন নেই। জোর-জবরদস্তি করে মানুষের প্রাণ নেয়া যায়, কিন্তু মন আদায় করা যায় না। এদের লক্ষ্য পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ও মদতে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এদের প্রধান শত্রু সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পরিচালিত গণ-আন্দোলন। তাই পুঁজিবাদের সমর্থক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ এই সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। সে কারণেই পুঁজিপতিদের হাতে জাতীয় সংহতি নিরাপদ হয় না, হতে পারে না।

কমঃ দশরথ দেব এই মত ও পথের একজন নির্ভীক, দ্বিধাহীন সফল রূপকার ছিলেন। কখনও অস্ত্র হাতে, কখনও সাংসদ হিসেবে, কখনও বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা কিংবা মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে, আবার কখনও পার্টির প্রধান কর্মকর্তা রূপে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।

এই বিরাট সংগ্রামী জীবনে বহুবার তিনি উপজাতি-সর্বস্বতার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং প্রতিবারেই এই ভুল প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে গণ-আন্দোলনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করেছেন। জনশিক্ষা আন্দোলনের সময় যে ৪৮৮টি প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু স্কুল ছিল বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায়। আজকের সোনাতলা হাইস্কুল, তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কালীটিলা স্কুল তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এসব স্কুলে শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষকই ছিলেন অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের। গোলাঘাটিতে পুলিশের গুলিতে ছয়জন উপজাতি ও একজন মুসলিম কৃষক নিহত হওয়ার পর 'মুক্তি পরিষদ'-এর কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে বাঙ্গালী বিরোধী চিন্তার উন্মেষ ঘটে। কারণ তখন দেওয়ান ছিল বাঙ্গালী, মহাজন বাঙ্গালী, দারোগা বাঙ্গালী, পুলিশও ছিল বাঙ্গালী। ফলে 'বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাবে না' বলে মুক্তি পরিষদের কর্মী রাজচন্দ্র দেববর্মা প্রকাশ্য সভাতেই বক্তব্য রাখেন। কিছু লোক তাতে হাততালিও দিয়ে ওঠে। কমরেড দশরথ দেব সেদিন যে বক্তব্য রাখেন তা এককথায় ঐতিহাসিক। তিনি বলেন, "কিছু বাঙ্গালী খুন করলে পুলিশ মিলিটারীর অত্যাচার বন্ধ হবে না। বরং ট্রাইবেলদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতে বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা পাবে পুলিশ ও মিলিটারী। ...... মূল শত্রু কংগ্রেস সরকার। গোটা বাঙ্গালী জাত মূলশত্রু নয়। বাঙ্গালীদের ওপর হাত তোলার পরিণতি হবে শত্রুর সংখ্যা বাড়ানো- -- শত্রুর শিবির শক্তিশালী করা। ..... কমরেড রাজচন্দ্র যা বলেছেন তা কখনই মুক্তি পরিষদের আদর্শ হতে পারে না। .... গোলাঘাটিতে পুলিশের গুলিতে আহতদের চিকিৎসা করার জন্য কলকাতা থেকে বাঙ্গালী কমিউনিস্ট ডাক্তার চলে আসেন গোলাঘাটির জঙ্গলে। তাতেই বুঝতে হবে বাঙ্গালী মাত্রই আমাদের শত্রু হতে পারে না। সব জাতের মধ্যেই আমাদের মিত্র এবং সংগ্রামের সহযোদ্ধা রয়েছে এবং থাকবে।" কমরেড দশরথ দেবের এই বক্তব্য হাততালি দিয়ে জনতা সমর্থন জানায়। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের স্রোত যখন ত্রিপুরায় ঢুকছিল, তখনও এই প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতা স্নেহকুমার চাকমা-র নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বৈরী দল 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু করে। বৈরী দলটির নাম ছিল সেংক্রাক। কিন্তু 'মুক্তি পরিষদ'-এর নেতৃত্বে উপজাতিদের ব্যাপক অংশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করে এবং এই 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে।

১৯৭৪ সালে রাজ্যের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার অবশিষ্ট ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা তুলে দেয়। সংগ্রাম শুরু হয় জমি, ভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৭৪ সালের ৭ই এপ্রিল আগরতলায় সর্বদলীয় উপজাতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতি যুব সমিতি ওই কনভেনশনে অংশ নেয়। এই কনভেনশনে সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা ভাবনা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে উপজাতি যুব সমিতি। তাদের বক্তব্য, উপজাতিদের লড়াই উপজাতিরাই চালাবে, বাঙ্গালী তাতে যোগ দিতে পারবে না। এই ভুল প্রবণতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। বক্তব্য রাখেন কমরেড দশরথ দেব। তিনি বলেন, উপজাতি সংখ্যালঘুদের দাবি পূরণ করার জন্য জাতি-উপজাতি উভয় অংশের গণতান্ত্রিক জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম একটি অপরিহার্য শর্ত। এই প্রশ্নে কোনও আপস হতে পারে না। এভাবেই উপজাতি যুব সমিতি, পরবর্তী সময়ে টি এন ভি এবং বিভিন্ন বৈরীদল বিচ্ছিন্নতাবাদী পথে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রিপুরায় অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। একসময় জাতি-উপজাতি উভয় অংশের সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো মিলে বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে নামে। তার পরিণাম আমরা দেখেছি। আজও তা প্রতীয়মান হচ্ছে।

কমরেড দশরথ দেব মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শকে অনুসরণ করে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন, তাকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে যাব সকল বাধা বিঘ্ন আক্রমণ মোকাবেলা করে। উপজাতি জনগণের সঠিক উন্নয়ন বাদ দিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়ন অসম্ভব। এই উভয় সংগ্রাম একসূত্রে গেঁথে জাতি-উপজাতি জনগণের একতাকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ত্রিপুরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। জাতীয় সংহতির আজকের এই মহাবিপদের দিনে কমরেড দশরথ দেব চিরজাগরূক থাকবেন আমাদের হৃদয়ে শিক্ষক হিসেবে, অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



উগ্রপন্থার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার
শপথ নিয়ে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান

‘হতাশ যুবকরা অস্ত্র ধরলে দুদিন পর ডাকাত ছাড়া কিছুই হবে না।’

[উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দশরথ দেবের সঙ্গে ‘আজকাল’ পত্রিকার সাংবাদিক রঞ্জন সেনের সাক্ষাৎকার]

● ***আপনার প্রথম জীবনের কথা কিছু বলুন, মানে ত্রিপুরার মুকুটহীন রাজা হয়ে ওঠার আগের কথা।***

□ মুকুটহীন রাজা-টাজা কিছু নয়, ওসব বাড়ানো কথা। আমার তো নিজেকে কোনদিন রাজা-টাজা বলে কিছু মনে হয়নি। বাবা ছিলেন গরিব কৃষক। গ্রামের উপজাতি কৃষক পরিবারের ছেলেদের জীবন যেভাবে কাটে, আমার ছেলেবেলার একেবারে প্রথম দিকটা সেভাবেই কেটেছে। ১৯১৬ সালে ত্রিপুরার খোয়াই সাব ডিভিশনের রামচন্দ্রঘাট গ্রামে আমার জন্ম। আমরা দু-ভাই, দু-বোন। আমিই বড়। বাবাকে চাষের কাজে সাহায্য করতাম। এভাবেই কেটে গেল প্রায় বছর ১৫। এরপর একটা ঘটনা ঘটল।

● ***কি রকম ?***

□ ছোটবেলায় আমার যাত্রা-কীর্তন-পাঁচালির গান শোনার সাংঘাতিক নেশা ছিল। গান গাইতে পারতাম। ভিড়ে গেলাম কীর্তনের দলে। তখনও অক্ষর পরিচয় হয়নি, কিন্তু দু-একবার শোনার পর গানের পদ মনে রাখতে অসুবিধা হত না। অপূর্ণ চক্রবর্তী বলে গ্রামের এক পুরোহিত ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। উনি বাড়ির লোককে বললেন, ও স্রেফ শুনেই এত মনে রাখতে পারে, ওকে লেখাপড়া শেখাও। কাজ হবে। মার তো বরাবরই ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখি। শেষ অবধি ১৪ বছর বয়সে অ-আ-ক-খ শিখতে শুরু করলাম। খোয়াই মাইনর স্কুলে একেবারে নিচের ক্লাসে ভর্তি হলাম। ওখানে সিক্স অবধি পড়লাম। এরপর এসে ভর্তি হলাম আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমিতে।

● ***এতদূর অবধি তো রাজনীতি ইত্যাদির কোন ব্যাপার নেই। রাজনীতিতে এলেন কীভাবে?***

□ তখন ১৯৩৮-৩৯ সাল। বছরটা আবার আমার একটু গণ্ডগোল হয়। যাই হোক, উমাকান্ত একাডেমিতে তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আবাসিক স্কুল। দুজন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বোর্ডিং থেকে তাড়াতে চাইলেন। ত্রিপুরায় তখন রাজার আমল। বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর রাজত্ব করছেন। শিক্ষামন্ত্রী রানা বুধজং। বোর্ডিংয়ে থাকার সুযোগ না পেলে ছেলে দুটির পরীক্ষা দেওয়া হবে না। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানাল। আমি এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলাম। স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হল। বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানাপত্র-বইখাতা নিয়ে সটান শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। রানা বুধজংকে বললাম, ‘স্কুল থেকে তো তাড়িয়েছ, এবার তোমার বাসা থেকে

তাড়াতে পার কিনা দেখি। আজ থেকে আমি এখানেই থাকব।' উনি তো হতভম্ব। কোন উপায় না দেখে আমাকে নিয়ে গেলেন রাজার কাছে। রাজা বললেন, দেখ এখন আর কিছু করার নেই। তবে তোমার লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা করছি। তুমি খোয়াই হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাও। পড়াশোনায় ভাল ছিলাম বলে বরাবর বৃত্তি পেতাম। রাজা আরও ৫ টাকা বৃত্তি বাড়িয়ে দিলেন। এরপর খোয়াই হাইস্কুল থেকেই স্টার মার্কস পেয়ে ১৯৪৩ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করি। অবশ্য টানা পড়াশোনা আমার কখনই হয়নি। বাব বার গ্যাপ পড়েছে। ইতিমধ্যেই মা মারা গেছেন। সংসারের অভাব। ক্লাস টেনে পড়ার সময় স্কুল ছেড়ে ফৌজিদের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টে ত্রিপুরা রেজিমেন্টের সেকেন্ড র‍্যাঙ্কে আর্টিলারির প্রভিশন্যাল লেফটেন্যান্ট হিসাবে কাজ করেছি। বেশিদিন অবশ্য ছিলাম না। টাকাপয়সা কিছু জমতেই বাড়ি ফিরলাম। মাঝে কিছুদিন ঠিকাদারী সংস্থারও কাজ করেছি। শিলচর এয়ারপোর্ট তৈরির সময় ওখানেও কাজ করেছি।

- ***হাইস্কুলে পড়ার সময় কোনো রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিল ?***

☐ হ্যাঁ, তখনও ছিল। কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। তবে খুব বড় একটা কিছু নয়। ওদের চিঠিপত্র, খবরাখবর দেওয়া ইত্যাদির কাজ করতাম।

- ***কমিউনিস্ট পার্টিতে এলেন কীভাবে ?***

☐ ১৯৪৩ সাল থেকেই কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়তে শুরু করি। ঐ বছরই ম্যাট্রিক পাশ করার পর সিলেটের হবিগঞ্জ কলেজে বি এ পড়তে গেলাম। ওখানে কমিউনিস্ট পার্টির একটা ছোট ইউনিট ছিল। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টিতে সরাসরি যোগ দেবার আগে আরও দুটি পর্ব আছে। তা না বললে খানিকটা মাঝখান থেকে বলা হয়ে যাবে। ত্রিপুরায় উপজাতিদের মধ্যে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ১৯৪৫ সালে আমরা একটি সংগঠন গড়ে তুলি। এর নাম জনশিক্ষা সমিতি। আমি ছিলাম সহ-সভাপতি। জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার ফলে ১৯৪৮ সালে এই সংগঠনকে ভারত সরকার বেআইনি বলে ঘোষণা করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তখনও আমরা কেউ পার্টিতে আসিনি। আমাদের মধ্যে একমাত্র অঘোর দেববর্মা পাটি সদস্য ছিলেন। কিন্তু নিষিদ্ধ হওয়ার পরে গোটা জনশিক্ষা সমিতিই কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল। আত্মগোপন করার পর ১৯৪৮ সালে গণমুক্তি পরিষদ গড়ে তুললাম। আমি হলাম সভাপতি। অত্যাচার আর নিপীড়নের প্রতিবাদে অস্ত্র ধরলাম আমরা। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টিও তখন বেআইনি বলে ঘোষিত। তাঁরাও আত্মগোপন করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বীরেন দত্ত আমাদের সঙ্গে আত্মগোপন করলেন। উনি অবশ্য কিছুদিন পরই ধরা পড়ে যান। রাজেশ্বর রাও পার্টির সেক্রেটারি হওয়ার পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য 'ফিলার' পাঠালেন। আসামের কমিউনিস্ট নেতা ও সেই সময়কার পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য বীরেশ মিশ্রর ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রাণেশ বিশ্বাস ত্রিপুরায় এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পার্টিতে সরাসরি যোগ দেবার প্রস্তাব দিলেন। ১৯৫০-এর অক্টোবর মাসে সি পি আই-তে যোগ দিই আমরা। ১৯৫১-তে সেন্ট্রাল কমিটিতে নেওয়া হয় আমাকে। তখন ছিল ১৬ জনের

সেন্ট্রাল কমিটি।

● ***কলকাতাতেও আপনি কিছুদিন ছিলেন। সেটা কোন্ সময়— আত্মগোপন করার আগে না পরে ?***

☐ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই আমার নামে হুলিয়া বের হয়। জনশিক্ষা সমিতি করার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভর্তি হয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালে। বিষয় ছিল প্রাচীন ইতিহাস। হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থাকতাম। ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতির কাজ আর পড়াশোনা দুটোই একসঙ্গে চলছিল। জনশিক্ষা সমিতি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পর পুলিশ হার্ডিঞ্জ হস্টেলেও রেইড করে। বাধ্য হয়ে ইউনির্ভাসিটি ছাড়লাম।

● ***জনশিক্ষা সমিতি, গণমুক্তি পরিষদ, কমিউনিস্ট পার্টি এই তিন পর্বেই আপনি আত্মগোপন করে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।***

☐ আত্মগোপন করে থাকা ব্যাপারটার আমি মানে বুঝি না। আমরা কেউই কখনও লোকজনের থেকে আলাদা হয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকিনি। লোকের সঙ্গেই ছিলাম। পুলিশ আর প্রশাসনের কাছেই শুধু আমরা নিজেদের গোপন রাখতাম।

● ***আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা অবস্থাতেই তো আপনি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন।***

☐ হ্যাঁ। ত্রিপুরা ইস্ট থেকে ১৯৫২-তে সি পি আই-এর প্রার্থী ছিলাম আমি। জিতেছিলাম। কংগ্রেস আমাকে হারাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর যাতে দিল্লিতে গিয়ে সংসদে শপথ নিতে না পারি সে চেষ্টা করল। এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিল। সীমান্ত বন্ধ। আসাম দিয়েও যাওয়া যাবে না। পুলিশ ছড়িয়ে রেখেছে। শেষ অবধি এখনকার বাংলাদেশ এবং কলকাতা হয়ে দিল্লি পৌঁছাই। আমার যাত্রাপথের সঙ্গী ছিলেন ডাঃ বিজয় বসু। সংসদে শপথ নেবার সময়ই আমি প্রথম আত্মপ্রকাশ করলাম।

জনসঙ্ঘের একজন প্রার্থী থাকলেও সেই নির্বাচনে আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেসের শচীন্দ্রলাল সিংহ। ৫৭, ৬২, ৭১ সালে এই আসন থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছি। মাঝখানে '৬৭-তে অবশ্য হেরে যাই।

● ***আপনাদের এত বছরের সংগ্রামের পরও উপজাতিরা সেই অন্ধকারেই আছেন......***

☐ ঠিক কথা, উপজাতিদের অধিকাংশই এখনও খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। কিন্তু আমরা লড়াই না চালালে ওঁরা একেবারে মুছে যেতেন। গণ আন্দোলনের জন্যই টিকে রয়েছেন ওঁরা। উপজাতিদের স্বার্থে আমরা লড়ছি। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে উপজাতি মুক্তি হবে না। কেন্দ্রে আমরা ক্ষমতায় এলেও ওঁদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে না। এমন কি জ্যোতি বসু প্রধানমন্ত্রী হলেও নয়। এই কাঠামোতে শুধু আমরা ওঁদের একটু রিলিফ দেবার চেষ্টা করতে পারি।

● ***ত্রিপুরায় জাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই খুব ভাল। '৮০-র দাঙ্গার পর থেকে এই সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। এই ফাটল আজও জোড়া লাগেনি। এটা কি আপনাদের ব্যর্থতা নয় ?***

☐ এটা একটা জাতীয় প্রশ্ন। এককথায় এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। অ-উপজাতি বড়লোকের আধিপত্যবাদ এই বিভেদ তৈরি করেছে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে এটা একটা ক্লাস কনট্রাডিকশনও। রাজার আমল থেকেই এখানে মহাজনরা সবই অ-উপজাতি। তখন অবশ্য এই মনোভাব এত তীব্র হয়নি। কারণ রাজা ছিলেন উপজাতি

সম্প্রদায়ের মানুষ। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা আর সচেতনতা তখন এতটা বাড়েনি। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন না হলেও উপজাতিদের মধ্যে এখন শিক্ষার প্রসার হয়েছে। সচেতনতা বেড়েছে। এখন ওরা নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে চাইবেই। বাংলাদেশ থেকে বিদেশি অনুপ্রবেশ সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। এটা বন্ধ করা কেন্দ্রের দায়িত্ব কিন্তু তা করা হয়নি। আসল সমস্যা ধামাচাপা দেবার জন্য কংগ্রেস দু-সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে চাইছে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বড় বড় কথা বলে ক্ষমতায় এলেও উপজাতি কল্যাণে কিছুই করেনি। রাজ্যে প্রায় দেড় লাখ বেকার। এদের সবাইকে চাকরি দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আবার বাঙাল খেদা কিংবা স্বাধীন ত্রিপুরা আন্দোলনেও সমস্যা মিটবে না। কারণ মৌলিক সমস্যা থেকেই যাবে। তবে আমাদেরও ঘাটতি রয়েছে। এই সম্প্রীতি রক্ষায় যতটা এগুনো দরকার ছিল ততটা যেতে পারিনি আমরা।

● *এই ঘাটতি, ব্যর্থতা কি গত বিধানসভা নির্বাচনে আপনাদের পরাজয়ের পিছনে কোন ছাপ ফেলেছিল ? রাজ্যের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কী বলেন ?*

□ আমরা হেরে যাওয়ার মূল কারণ অবশ্যই সন্ত্রাস আর রিগিং। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ক্ষমতায় থাকার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারিনি। অন্যদিকে খোদ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সরকারকে ফেলার চক্রান্ত করেছিলেন। আমরা তা রুখতে পারিনি। এটা সম্পূর্ণ রোখা সম্ভবও নয়। অ-উপজাতির মানুষদের মধ্যে টি এন ভি-র সন্ত্রাসের দরুন যে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছিল, আমরা তা সম্পূর্ণ দূর করতে পারিনি। এসব মিলিয়ে আমাদের জনসমর্থনে একটু ঘাটতি দেখা দিয়েছিল একথা স্বীকার করাই ভাল।

● *এই ঘাটতি পুষিয়ে নিয়ে আগামী নির্বাচনে আবার আপনারা ফিরছেন কি ?*

□ নির্বাচন অবাধ হলে নিশ্চয়ই ফিরব। তবে এবার গণ প্রতিরোধও হবে। একতরফা কিছুই হবে না। তাছাড়া রিগিং করেও সবসময় জেতা যায় না।

● *এই যে গণপ্রতিরোধের ব্যাপারটা বললেন, এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে ঠিক বুঝতে পারছি না। জোট সরকারের শাসনকে আপনারা সন্ত্রাসের রাজত্ব বলছেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিবৃতি, চিঠি, পিটিশন ইত্যাদি ছাড়া আপনাদের তরফে তেমন কোন সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, এটা কিন্তু রাজ্যের মানুষদেরও*

□ বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আমরা কিছুই করছি না একথা ভাবা ভুল। কংগ্রেসী গুন্ডাদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কী করতে হয়, আমরা সেটা ভালভাবেই জানি। কিন্তু তাতে কী হবে ? খুনোখুনি বাড়বে। আমাদের তরুণ কর্মীদের এই রক্তাক্ত রাস্তায় নিয়ে যেতে আমরা চাই না। আমরা মানুষের মধ্যে থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইছি।

● *কিন্তু তরুণরাও তো আজ আর কমিউনিস্ট পার্টিতে সেভাবে আসছেন না। সর্বত্রই বৃদ্ধ আর প্রবীণদের ভিড়।*

□ আমাদের হিসাব তো অন্য কথা বলছে। আমাদের রাজ্য কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশই তরুণ। তাদের বয়স ৪৫-এর নিচে। নতুন মুখ পার্টিতে আসছে। বিশেষ করে মহিলারাও বেশ ভাল সংখ্যায় আসছেন। গত এক বছরে আমাদের পার্টির সদস্য সংখ্যা দু-হাজার বেড়েছে।

- ***কমিউনিজমের সম্ভাব্যতা নিয়েও তো নানা প্রশ্ন উঠেছে।***

□ হ্যাঁ, নানারকম বির্তক তো চলছে। তবে বামপন্থী আদর্শের সংকট ও সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ সব কিছুই অত্যন্ত সরল এবং তরল করে ফেলেছেন। এটা ঠিক নয়। নানা সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু কমিউনিজম আজকের পৃথিবীতে অচল— একথা ভাবা আদৌ ঠিক নয়। কমিউনিজমই ভবিষ্যৎ।

- ***রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আবার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ছে। এর কারণ কী ?***

□ বাড়বেই। কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সন্ত্রাসের জমি তৈরি করে রেখেছে। বিশেষ করে গ্রাম আর পাহাড়ী এলাকায় গরিবদের অবস্থা গত তিন বছরে আরও খারাপ হয়েছে। উপজাতি যুবকদের অনেকেই মরিয়া হয়ে কিছু করে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু এভাবে হয় না। টি এন ভি, টি ইউ জে এস, টি এন এল এফ ব্যর্থ হয়েছে। হতাশ যুবকরা অস্ত্র ধরলে দুদিন পর ডাকাত ছাড়া আর কিছুই হবে না। জনগণকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র খুন-জখম করে গেলে জনসমর্থন হারাতে হয়।

- ***উপজাতি এলাকায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য আপনারা 'ইনার লাইন পারমিট চালু করার কথা বলছেন। কিন্তু আগে আপনারা এই দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। এই মত পরিবর্তনের কারণ কী ?***

□ হ্যাঁ, আগে আমরা এই দাবির বিরোধিতা করেছিলাম। আমাদের দূরদৃষ্টির ঘাটতি ছিল। ক্ষমতায় থাকার সময় আমরা বুঝতে পারিনি উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ হবার পর অনুপ্রবেশ বাড়বে এবং উপজাতিরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। জাতি সমস্যা আমরা সব বুঝে ফেলেছি এমন দাবি করা ঠিক নয়। তবে ইনার লাইনেও সব সমস্যার সমাধান হবে না।

- ***আগেকার বামপন্থী নেতাদের জীবনযাপন ও আচরণের সঙ্গে এখনকার বামপন্থী নেতাদের একটা তফাৎ থেকে যাচ্ছে। অনেকের ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সর্বত্রই এই এক সমস্যা। কারণ কী ?***

□ বুর্জোয়া প্রভাব কোন কোন নেতার ব্যক্তিজীবনে পড়তেই পারে। তবে সাধারণভাবে এটা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না যে, আগের বামপন্থী নেতারা একরকম, আর এখনকার বামপন্থীরা আরেক ধরনের। আমাদের সামাজিক জীবনও তো অনেক বদলে গেছে। আগের আমলের এম পি, এম এল এ-দের তুলনায় এখনকার এম পি, এম এল এ-দের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। তবে আমি কাদের লোক, কাদের জন্য কাজ করছি এটা মাথায় রাখা উচিত। না হলেই গণ্ডগোল হবে। অনেকের হয়েছে।

- ***ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই এখন বর্ণহিন্দু আর 'ভদ্রলোকদের' দাপট। বাম দলগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?***

□ শিক্ষা, সচেতনতার দিক থেকে ঐতিহাসিক কারণেই উপজাতি, আদিবাসী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের তুলনায় ওঁরা এগিয়ে আছেন। সেই কারণেই এটা হচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে যাঁরা এগিয়ে থাকবেন, নেতৃত্ব তো দেবেন তাঁরাই। দশরথ দেব ক্লাস ওয়ান অবধি পড়লে আজ এখানে এসে পৌঁছাতে পারত না। এই অনগ্রসরতা দূর করার জন্য সংরক্ষণ, মণ্ডল কমিশন ইত্যাদি প্রশ্ন আসছে। ●

[আজকাল ১৪ এপ্রিল ১৯৯১]

তিনি বেঁচে থাকবেন মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনায়



অঘোর দেববর্মা

কমঃ দশরথ দেব ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন কমিউনিস্ট। কোনো ছল-চাতুরির স্থান তাঁর অন্তরে ছিল না। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কমিউনিস্ট আদর্শকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সারাজীবন লড়াই করে গেছেন।

১৪ অক্টোবর '৯৮ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল এক নিদারুণ খবর, কমরেড দশরথ দেব আর নেই। জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। জন্মের পর মানুষের মৃত্যু হবে এটি চিরন্তন সত্য। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। জাতি-উপজাতি মানুষের মৈত্রীর সেতু কমরেড দশরথ দেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও তিনি বেঁচে থাকবেন গণতান্ত্রিক চেতনায় শাণিত অগণন মানুষের স্মৃতিতে। উগ্র সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় দেশ যখন জ্বলছে, হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্বের নীতি যখন লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আস্ফালনে রাজ্যের জাতি-উপজাতি মানুষের সম্প্রীতি যখন বিঘ্নিত হচ্ছে— এ ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কমঃ দশরথ দেবকে হারিয়ে আমাদের বিরাট ক্ষতি হল।

কমঃ দশরথ দেব ছিলেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে একজন প্রকৃত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিযোদ্ধা। তিনি নিজের স্বার্থত্যাগ করে শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জাতি সত্তার বিকাশে ও অধিকার আদায়ে লড়াইয়ের ময়দানে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন। নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে পিছিয়ে পড়া উপজাতি অংশের মানুষদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে কমঃ দশরথ দেব, কমঃ সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা প্রমুখ নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন 'জনশিক্ষা সমিতি'। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা ছাড়া মহাজনের শোষণের হাত থেকে শোষিত মানুষকে রক্ষা করা যাবে না। সচেতন করা যাবে না তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে। মূল্যায়ন করা যাবে না অতীত সম্পর্কে। এই বাস্তব কথাটি সামনে রেখেই অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য জনশিক্ষা আন্দোলনকে সুসংগঠিত আন্দোলনের রূপ দেওয়া হয়েছিল। এ ধরনের আন্দোলনকে মহারাজা বীর বিক্রম সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। রাজতন্ত্রের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের অনেক

বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল।

রাজতন্ত্রের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সেদিন চারশ'র বেশি স্কুল শিক্ষার আলো থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছিল। আর এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে উপজাতিদের শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়ে আসার প্রথম প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিলেন কমরেড দশরথ দেব। শুধু যে শিক্ষার আন্দোলন সংগঠিত করেছেন তা নয়, উপজাতি সমাজের কুসংস্কার প্রথা নির্মূল করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। যেমন, 'ঘরজামাই' প্রথা। উপজাতি সমাজের প্রচলিত এই প্রথা অনুযায়ী বিয়ের অনেক আগেই ভাবী স্ত্রীর বাড়িতে মাসের পর মাস ভাবী বরকে বেগার খাটতে হতো। এসব কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন। কমরেড দশরথ দেব চেয়েছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে। রাজতন্ত্রের সময় আরেকটি জনবিরোধী নীতির ব্যবস্থা ছিল— 'তিতুন' প্রথা। এই প্রথায় রাজকর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে সরকারী বেসরকারী কাজে যাওয়ার সময় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের তাদের জিনিসপত্র বহন করতে হতো এবং ভার্কি করে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছে দিতে হতো। এর বিরুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করার কারোর সাহস ছিল না। এভাবে দিনের পর দিন বেগার শ্রম দিতে হতো রাজ্যের নিরীহ প্রজাদের। এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তীব্র সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন কমরেড দেব। সে আন্দোলনে খোয়াইয়ের পদ্মবিলে সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান তিন বীরাঙ্গনা 'কুমারী-মধুতি-রূপশ্রী'। কমরেড দশরথ দেব দেখেছেন রাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের কোন স্থান নেই, জনগণের অধিকার সঙ্কুচিত। সেখানে শুধুমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের মানুষের সরকারী যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত ছিল। শ্রমজীবী মানুষের সে সব সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হওয়ার কোন অধিকার ছিল না। শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম এবং রাজতন্ত্রের চাবুকের জন্য প্রজাদের পিঠ পেতে চলতে হবে— এটা কমরেড দশরথ দেব কখনই মেনে নিতে পারেন নি। তাই এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার গড়ার আন্দোলন গড়ে তুললেন। এসব ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'মুক্তি পরিষদ'। পরবর্তী সময়ে কতিপয় নেতৃত্বের মধ্যে সুবিধাবাদী ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। 'মুক্তি পরিষদ' বিভক্ত হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় 'উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ'। কমঃ দশরথ দেব মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। এর মধ্য দিয়ে উপজাতিদের অস্তিত্বের লড়াই ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছিলেন কমঃ দশরথ দেব। পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন, তাদের শিক্ষা, সাংবিধানিক অধিকারকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও শাণিত করলেন। তিনি দেখেছেন বিশাল ভারতবর্ষে সব অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উপজাতিদের সংগ্রামকে সামিল করতে না পারলে তাদের অধিকার রক্ষা করা যাবে না। তাই এই কাজে তাঁকে কঠিন লড়াই এবং পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ না হতেই আর একটি কঠিন পরিস্থিতি ত্রিপুরার জনজীবনে নেমে এলো। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত হল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ত্রিপুরা। রাজ সেনার বদলে কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী ত্রিপুরার গ্রামে-গঞ্জে ঘাঁটি তৈরি করে। খোঁজা শুরু হলো আন্দোলনের নেতৃত্বদের। গ্রামে গ্রামে সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষের ওপর উৎপীড়ন চালাতে লাগল। বহু উপজাতি মানুষের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল।

ওদের গুলিতে প্রাণ হারাল অনেকে। কমঃ দশরথ দেবকে মৃত বা জীবিত সরকারের কাছে যে বা যারা তুলে দিতে পারবে তাদের জন্য মোটা পুরস্কার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কিছুই কমঃ দশরথ দেবকে আটকাতে পারেনি। তিনি নির্বিঘ্নে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সরকারের কোনো বাহিনীই তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সংগঠিত হয় অস্ত্র বিরতি চুক্তি। সেদিন আপসহীন সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন বলেই জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছিল নির্বাচনের।

আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় কমঃ দশরথ দেব লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। জনগণের জন্য নিজের জীবনকে সঁপে দিতে না পারলে অথবা নিষ্ঠার সাথে জনগণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসেবে যদি দেখতে না পারতেন তাহলে জনগণের এত আস্থা অর্জন করা কখনই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কমঃ দশরথ দেবের মধ্যে এইসব গুণ ছিল বলেই ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের অন্তরে তিনি স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

কমঃ দশরথ দেব ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন কমিউনিস্ট। কোনো ছল-চাতুরির স্থান তাঁর অন্তরে ছিল না। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কমিউনিস্ট আদর্শকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সারাজীবন লড়াই করে গেছেন। সমাজতন্ত্রই মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ — তাই এই পথে অবিচল থেকে দৃঢ়তার সাথে তিনি লড়াই করেছেন। কারাবাসও হয়েছিল তাঁর। এরকম আদর্শ না থাকলে রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠতো না। অথবা রাজ্যের ইতিহাসও অন্যদিকে মোড় নিতে পারত। তিনি যেভাবে উপজাতি অংশের মানুষদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল করেছেন, ঠিক তেমনি কমিউনিস্ট আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিতও করেছিলেন। এর ফলেই সিংহভাগ উপজাতি অংশের মানুষ নিজেদের কমিউনিস্ট হিসেবে মনে করতেন।

কংগ্রেস শাসনকালে কমিউনিস্ট নির্মূল করার নামে উপজাতিদের উপর চরম নির্যাতন সংগঠিত হয়েছিল। উগ্র উপজাতি বিদ্বেষী মানসিকতায় উপজাতিদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। নির্বিচারে উপজাতিদের ধরপাকড়, উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলি ভেঙে দেবার লক্ষ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার নামে সেসব গ্রামগুলিতে কলোনী বসিয়ে দেওয়ার মত জঘন্য কাজ সংগঠিত করেছিল, সরকারের এসব জঘন্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে কমঃ দশরথ দেব লড়াই চালিয়েছিলেন। কংগ্রেস দল শুধুমাত্র প্রশাসনকে ব্যবহার করেই কমিউনিস্ট নিধন করতে চেয়েছিল তা নয়, উপজাতি এবং বাঙালীদের মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্যে অনেক ধরনের কুৎসিত অপপ্রচারও চালিয়েছিল যাতে উপজাতি এবং বাঙালী অংশের শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হতে পারেন। উপজাতি ও গরীব মানুষের ওপর যাতে তাদের শোষণের পথ আরও উন্মুক্ত করা যায়— শাসকগোষ্ঠীর এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সময় ধরে কমঃ দশরথ দেবকে লড়াই করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘকাল কংগ্রেস শাসনে এ রাজ্যের উন্নতি প্রায় শুকিয়ে যেতে বসেছিল। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অগ্রগতির পথ। ফলশ্রুতিতে রাজ্যের সর্বত্র কর্মহীন, নিরন্ন মানুষের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। জনগণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তেমনি জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস ক্রমেই দানা বাঁধতে শুরু করে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে ধারাবাহিক গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উপজাতিদের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল তাকে ভেঙে দেবার জন্য শাসকগোষ্ঠী খুব কূটকৌশলে উপজাতিদের মধ্যে

আরেকটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে ১৯৬৭ সালে। নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য শাসকগোষ্ঠী নকল উপজাতি দরদের মুখোশ পরিয়ে তাদের মুখে বিচ্ছিন্নতার শ্লোগান তোলেন, সেদিন থেকেই ত্রিপুরার শান্তির আকাশে কালো মেঘ তৈরি হয়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ ত্রিপুরার মাটিতে বপণ করা হল। সেদিনের কালো মেঘ আজ আরও ঘনীভূত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে এই পথে না হাঁটলে ত্রিপুরার পরিস্থিতি এ জায়গায় আসতে পারত না।

সেদিন কমঃ দশরথ দেব উপজাতিদের সমস্যার জন্য দায়ী কে, মূল শত্রু কে, সে সম্পর্কে ছোট একটি পুস্তিকা লিখে বিভ্রান্ত উপজাতি যুবকদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি বরাবরই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে যখন লেখার হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখনও মুখে বলে অন্যদের দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সামনে বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা করতেন।

কমঃ দশরথ দেব সারাজীবন লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতি-উপজাতির মানুষের সম্প্রীতির সেতু তৈরি করে গেছেন। তিনি দুর্বলশ্রেণীর জনগণের মুক্তির জন্য যে পথ দেখিয়ে গেছেন সে পথই প্রকৃত পথ। সে পথ ধরেই দুর্বলশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এমন একটি সরকার — বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বামফ্রন্ট সরকারই উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল, উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছিল। উপজাতি জনজীবনে শিক্ষা বিকাশের পাশাপাশি ভেঙে যাওয়া অর্থনীতির মেরুদণ্ড শক্ত হতে সাহায্য করেছিল। ঠিক তেমনি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে সম্প্রীতির মূল শিকড় মাটির অনেক গভীরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে যত আঘাত আসুক এই সম্প্রীতি ভাঙবার ক্ষমতা কারো নেই। বহু পরীক্ষিত এই সম্প্রীতি। যদিও দেশী-বিদেশী শক্তি প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত আঘাত হানার মরিয়া প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কমরেড দশরথ দেব এই শক্তি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আপসহীন লড়াই করে গেছেন। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

(লেখক - সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য)



রাখীবন্ধন

সকলের রাজা দশরথ



বাদল চৌধুরী

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নিপীড়িত, শোষিত জনগণের মুক্তির ঠিকানাই হচ্ছে — লালঝান্ডা। আজ হোক— কাল হোক ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব শোষিত মানুষকে এই ঠিকানায় মিলতে হবেই।

"লেফ্‌ট -রাইট, লেফ্‌ট-রাইট, কমঃ দশরথ দেব লাল সেলাম, লাল সেলাম, লাল সেলাম, লেফট রাইট — সামনে দেখ .... " ব্যান্ডের বাজনার সঙ্গে তাল রেখে খাঁকী প্যান্ট, ব্লু শার্ট, মাথায় লাল টুপি পরিহিত শান্তি সেনার অভিবাদনের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেব-কে নিয়ে যাওয়া হলো সবুজ বনানী ঘেরা সমতল একটি টিলাতে ছন বাঁশের তৈরি এক অস্থায়ী বিরাট প্যান্ডেলের ভিতরে।

ঠিক মনে পড়ছে না— সালটা ৬৮ কি ৬৯ ছিল। শান্তিসেনার রাজ্য সম্মেলন— সদর উত্তরাঞ্চলের চাঁচুতে। ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসেবে আমিও সম্মেলনের প্রধান অতিথি কমঃ দশরথদা-র একজন সঙ্গী। বড়কাঁঠাল, এগ্রাই হয়ে চাঁচু পর্যন্ত মাটি কেটে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ তখনও পুরো শেষ হয়নি। একটি ভাড়া করা যানে অনেক ধকল সহ্য করে কমরেড দশরথ-দার সঙ্গে চাঁচুতে সম্মেলনের প্যান্ডেলের সামনে খোলা মাঠে আমরা পৌঁছে যাই। গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। চারিদিকে ছোটাছুটি। শ্লোগান, ব্যান্ডের আওয়াজের মিল রেখে কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে প্যান্ডেলের ভিতরে তৈরি অপূর্ব কারুকার্যে শোভিত এক সিংহাসনে কমরেড দশরথদাকে — বসানো হলো। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙের কাপড়ে সজ্জিত একদল উপজাতি মহিলা হাতে ফুলের মালা, ধূপধুনা জ্বালিয়ে ধূপতী, মোমবাতি প্রভৃতি নিয়ে প্যান্ডেলে প্রবেশ করল। সন্ধ্যাকালে নিজের ঈপ্সিত দেবতাকে আরতির মাধ্যমে যেভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে— ঠিক একই কায়দায় নিজেদের প্রিয় নেতাকে বরণ করল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। নিজের জীবনে এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। বিরক্তও হচ্ছিলাম মনে মনে। কমিউনিস্ট নেতাকে নিয়ে এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ? সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসূত চিন্তা থেকে নেতা বরণ — মনটা একটু একটু খুঁত খুঁত করছিল বই কি ? সাদর সম্ভাষণ পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়ে গেল।

পরের দিন বিকেলবেলা প্যান্ডেলের সামনে বিস্তীর্ণ খোলা চত্বরে জনসভা। দুপুর ৩টা বাজতেই — চারদিক থেকে ব্যান্ডের, শ্লোগানের সুর ক্রমশ দূর থেকে কাছে ভেসে আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে

সারা মাঠ খাঁকী প্যান্ট, নীল শার্ট, লালটুপিতে ভরে গেল। রঙ-বেরঙের পোষাকে সজ্জিত উপজাতি মা-বোন সহ অন্যান্য মানুষের উপস্থিতির কোন ঘাটতি ছিল না। আধ ঘন্টার মধ্যে ৬/৭ হাজার মানুষে মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যার মধ্যে অধিকাংশ উপজাতি নারী-পুরুষ— ছোট একটা অংশ চা-বাগান শ্রমিক। গতকালের মত আজও উপজাতি মহিলাদের সেই একই উচ্ছ্বাস। জমায়েত দেখে আমি অভিভূত। এত মানুষ এল কোথা থেকে ? কমরেড দশরথ দা-ই ঘোর কাটিয়ে দিলেন। বড়মুড়া পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন— ঐখানে ছিল আমাদের রাজার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র। যে সংগ্রামে উপজাতি জনগণের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। রাজার শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। অন্ধ কুসংস্কার দূর করতে সমাজ সংস্কারে এক দ্যুতি জ্বালিয়েছে। উপজাতি জনগণের নতুন রেনেসাঁসের জন্মদাতা কমরেড দশরথ দেবকে বার বার দেখা, তার কথা বার বার শোনার আগ্রহ থেকে এই জনজোয়ার। শোষণমুক্তি, জাতি বিকাশের, জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহকে কমরেড দশরথ দেব এদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এদের শিখিয়েছেন— এই সমস্ত নীতি একমাত্র রূপায়ণ করতে পারে— লাল ঝান্ডার নীচে শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। উপজাতি জনগণ— তাদের শোষণমুক্তি সংগ্রামের প্রতীকী হিসেবে বেছে নিলেন— লালঝান্ডা।

লাল ঝান্ডা এবং কমরেড দশরথ দেবকে নিয়ে কত কুৎসা, কত রটনা। কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না, মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করে না, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুড়ো মানুষকে গুলি করে হত্যা করে জমির সার তৈরি করে, ওরা মানুষের মাংস খায়— কত না প্রচার। এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি পাহাড়ীয়ার পার্টি। শোষক শ্রেণীর তল্পীবাহক কংগ্রেস (আই) জাতি-বিদ্বেষ ছড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পথ বেছে নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের প্রতি অবিচল থেকেছে উপজাতি জনগণ। তারা বিশ্বাস করতেন— ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতের ঠিকানায়— লাল ঝান্ডার অগ্রগতিকে ঠেকাতে পারবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নিপীড়িত, শোষিত জনগণের মুক্তির ঠিকানাই হচ্ছে— লালঝান্ডা। আজ হোক— কাল হোক ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব শোষিত মানুষকে এই ঠিকানায় মিলতে হবেই।

১৪ই অক্টোবর ১৯৯৮ সাল। খুব ভোরে টেলিফোন বেজে উঠল। মাঝরাত্রি বা ভোরের টেলিফোন প্রায় সব সময় দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসে। এটা জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে জানালেন— ভোর ৪টায় কমরেড দশরথদা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে বললেন— সকাল ৭টায় আমার সরকারী বাসভবনে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভার পর জি বি হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে পার্টির রাজ্য দপ্তর, রাজ্য দপ্তর থেকে মিছিল নিয়ে মহাকরণ, বিধানসভা হয়ে রবীন্দ্রভবন। পরের দিন রবীন্দ্রভবন থেকে খোয়াই শহর হয়ে জন্মস্থান আমপুরা গ্রাম— সর্বত্রই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ যাত্রায় সামিল হয়েছি।

জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই— পাহাড়ী-বাঙালীর প্রশ্ন নেই — দলমত নির্বিশেষে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ব্যাপটিস্ট মিশন, কে না সামিল সেই শেষ যাত্রায়। এক বিপদসংকুল রাস্তায় যখন ত্রিপুরা চলছে — ভ্রাতৃরক্ত ঝরানোর জন্য প্রতি মুহূর্তে বিষাক্ত নিঃশ্বাস পড়ছে, স্বাধীন ত্রিপুরার ধ্বজাধারীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পোষা গুন্ডা সেজে কমিউনিস্ট নিধনে উন্মত্ত— তখন শেষ বারের মতো কমঃ দশরথ দেব আবার জানান দিয়ে গেলেন — পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রধান শক্তি জাতি-উপজাতির ঐক্য সম্প্রীতি। ইতিহাস আবারও প্রমাণ করল— কমঃ দশরথ দেবই জাতি-উপজাতির মিলন সেতু। তিনি সকলের রাজা— 'রাজা দশরথ'। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২২-১০-৯৮]

কমরেড দশরথ দেব

শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের নাম



তপন চক্রবর্তী

সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম শুধু ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি মানুষের ঐক্যের সেতুবন্ধকে সুদৃঢ় করবে তাই নয়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কলকাতায় পার্টি কংগ্রেস শেষ করে ত্রিপুরায় ফিরে আসার দিন ভোর ছয়টায় সেই দুঃসংবাদটি আমরা পাই। কমরেড দশরথ দেব আর আমাদের মধ্যে নেই। সেই মুহূর্তে অনেক কথাই মনে পড়ছিলো। কিছুদিন আগে তিনি নিজেই বলছিলেন, "কথা বলতে চাই কিন্তু বলতে পারিনা, সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আসলে এই শরীরটাই এখন আমার কাছে বোঝা।" আমরা বুঝতে পারছিলাম না সহসাই কমরেড দশরথ-দার জীবনদীপ নিভে যাবে।

ছাত্র আন্দোলনের সময়েই আমাদের সাথে দশরথ দা-র পরিচয় ঘটে। তখন থেকেই তাঁকে নিয়ে নানা প্রশ্ন মনে। কেন তাঁকে রাজা দশরথ বলা হয় ? কি সেই গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন কমরেড দশরথদা— যা তাঁকে কিংবদন্তির পর্যায়ে উপনীত করেছিলো ? কমরেড দশরথ দেবের প্রায় বিরাশি বছরের সুদীর্ঘ জীবন, এক সংগ্রামী জীবনালেখ্য। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

যে সময়ে কমরেড দশরথ দেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রায় সে সময়ই পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছিলেন পৃথিবীর এক অংশের শ্রমিক শ্রেণী, সর্বহারা ও পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মহান বন্ধু কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে। রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়ার এক চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, পার্বতী ত্রিপুরার কোলে নদী-প্রান্তর বনভূমি পার হয়ে আমপুরা, অতল অন্ধকারের বুক চিরে এক উজ্জ্বল আলোক শিখায় উদ্ভাসিত হলো। সে দিনের সে শিশুর মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত যেন চিৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছিলো ভবিষ্যৎ সংগ্রামের দৃঢ় অঙ্গীকার। এই পৃথিবীতে এসে প্রথম জীবনেই পরিচিত হলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে। বেশি বয়সে প্রথাগত শিক্ষা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। একদিকে শিক্ষাগ্রহণ এবং অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন কমরেড দশরথ দেব। নিঃসাড় পাহাড় দেশ আলোড়িত হলো, জুমিয়ার টংঘরেও শিক্ষার প্রদীপ জ্বলে উঠলো। জনশিক্ষা সমিতি পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ কমরেড দশরথ

দেব, কমঃ সুধন্বা দেববর্মা, কমঃ হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখের নেতৃত্বে শিক্ষা প্রসার, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান, তিতুন প্রথার মতো মহারাজার সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শত শত বছরের রাজতন্ত্রের ভিতকে কাঁপিয়ে তুললো। ভয়ের শৃঙ্খলে বন্দী অসহায় নির্যাতিত উপজাতি জনগণ লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর হতাশা থেকে মুক্তির জন্য অগ্রপথিক হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকায় পেলেন কমরেড দশরথ দেবকে।

দেশ বিভাগের রাজনৈতিক সেই সিদ্ধান্তের পরিণতিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙ্গালী জনগণকে এই ত্রিপুরা বুকে গ্রহণ করলো। এ রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য পরিবর্তিত হলো। ক্রমে উপজাতি জনগণ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হলেন। জমি হাত ছাড়া হলো। অস্তিত্বের সংকট তৈরি হলো। এই পুরো অধ্যায়টিতে কমরেড দশরথ দেবের যোগ্য নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় আপন করে তুললো। জনগণের কাছে তিনি যতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন রাজতন্ত্রের শাসক ও পরবর্তী সময়ে ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গের চোখে তিনি ততই চক্ষুশূলে পরিণত হচ্ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে দিনের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যা আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়েছিলো এ রাজ্যের জাতি-উপজাতির শোষিত জনগণের সমর্থন ছিলো তাঁর পেছনে। ভারতের সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমরেড দশরথ দেবের জয়লাভ এবং মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে সংসদ কক্ষে প্রবেশ এর ঘটনা তো নজীর সৃষ্টিকারী এক ইতিহাস।

বিরাশি বছরের কথা এতো অল্প পরিসরে কি ব্যক্ত করা যায় ? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এক সংগঠক হিসাবে, সাংসদ হিসাবে, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে, সর্বোপরি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস, যৌথ সিদ্ধান্ত ও যৌথ নেতৃত্বে আস্থাশীল থেকে ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন কমরেড দশরথদা। সে জন্যই আজ মনে হচ্ছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একজন কমিউনিস্ট হিসাবে টিকে থাকার সেই দুর্লভ কৃতিত্বেরও অধিকারী হয়ে রইলেন কমরেড দশরথ দেব।

যতদিন সুস্থ দেহে ছিলেন দেখেছি, শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর সমস্ত কুটিল চক্রান্ত ও ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে এক প্রাণবন্ত মানুষ কমরেড দশরথ দেব। হাজারো বছরের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, অত্যাচার, শোষণ, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একজন কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তাঁর ভয়শূন্য দৃঢ়তা ছিলো আমাদের প্রতিদিনের প্রেরণা। সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম শুধু ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি মানুষের ঐক্যের সেতুবন্ধকে সুদৃঢ় করবে তাই নয়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই রাজ্যকে নতুন করে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, যার জন্য আজীবন সংগ্রাম ও কাজ করেছেন সংসদীয় ব্যবস্থার ভিতরে ও বাইরে থেকে, তাকে প্রেরণা হিসাবে ধরে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কমরেড দশরথদা যে স্বপ্ন ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে গেছেন, যে আদর্শের প্রতি ছিলো তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেই একই পথের পথিক হিসাবে, উত্তর-পুরুষ হিসাবে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা এগিয়ে যাবো— এই দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথদা-র প্রতি আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২২-১০-৯৮]

উপজাতি-অনুপজাতি মৈত্রীর সেতু



গৌতম দাশ

কমরেড দশরথ দেব পার্টিতে যেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি সব সময় অনুসরণ করে এসেছেন তেমনি যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। কমরেড দশরথ দেব শুধু ত্রিপুরার নন, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অসাধারণ নেতা।

কমরেড দশরথ দেবকে বলা হয় উপজাতি ও বাঙালী জনগণের গণতান্ত্রিক মৈত্রীর সেতু — তিনি যে প্রকৃত অর্থে ছিলেন তাই. ১৪ অক্টোবর আগরতলায় কমরেড দশরথ দেবকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পার্টির রাজ্য দপ্তর থেকে রবীন্দ্রভবন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব অংশের মানুষের স্রোত তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতে শোষিত নিপীড়িত অংশের মানুষকে লাল ঝান্ডার নীচে সমবেত করে, বিশেষ করে সবচাইতে অনগ্রসর উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের চেতনায় সমৃদ্ধ করে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামে সমবেত করে যাঁরা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন তাঁদের অন্যতম কমরেড দশরথ দেব। কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে শুধু একজন বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতার প্রস্থান ঘটল না, একটি যুগের অবসান ঘটল।

খোয়াই মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রাম আমপুরায় একটি কৃষক পরিবারে দশরথ দেববর্মার জন্ম। ত্রিপুরা সামন্ত রাজা শাসিত রাজ্য। সে সময়ে শহরগুলোতে লেখাপড়ার জন্য কিছু স্কুল হলেও গ্রামাঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না। অনেক বেশি বয়সে তিনি প্রথম শিক্ষার সুযোগ পান। নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এটা তাঁর উপলব্ধিতে আসে শিক্ষার প্রসার ছাড়া শোষিত-বঞ্চিত অনগ্রসর উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটানো যাবে না। এই চেতনা থেকেই আরো কয়েকজন সমচিন্তার শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত উপজাতি তরুণ ১৯৪৫ সালের ১১ই পৌষ জনশিক্ষা সমিতি গঠন করেছিলেন। প্রয়াত কমরেড সুধন্বা দেববর্মা ছিলেন সমিতির সভাপতি এবং প্রয়াত কমরেড হেমন্ত দেববর্মা ও কমরেড দশরথ দেব ছিলেন সমিতির অন্য দু'জন অগ্রণী নেতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ ও কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরে জনশিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে ছাপানো ইস্তেহার প্রচার করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে কয়েকশো স্কুল তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত উপজাতি যুবককে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো যাতে

সরকারের স্বীকৃতি পায় এবং নিযুক্ত শিক্ষকদের মাস মাইনে দেয়া হয় সেজন্য তাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই জনশিক্ষা সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির কুমিল্লা জেলা কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত আগরতলা শাখার সদস্যরা। যাঁদের অন্যতম ছিলেন প্রয়াত কমরেড বীরেন দত্ত। জনশিক্ষা সমিতির দ্রুত প্রসার এবং পেছন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির মদত রয়েছে, এটা বুঝতে পেরে তদানীন্তন সামন্ত রাজার প্রশাসন সমিতির নেতৃত্বের ওপর আক্রমণ শুরু করে। ইতিমধ্যে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হয়। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস সরকারও দমন-পীড়নের পথ নেয়।

জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের চেতনায় বিকশিত হতে থাকে। নেহরু সরকার পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চালাতে শুরু করে। এর প্রেক্ষাপটেই পুলিশ-মিলিটারীর অত্যাচার প্রতিরোধে কমরেড দশরথ দেববর্মার নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকার কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং ত্রিপুরার উপজাতি কৃষকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম এক সূত্রে গ্রথিত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হয় সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। কমরেড দশরথ দেব হন সে বিপ্লবী পরিষদের সর্বোচ্চ নেতা। পাহাড়ে গোপনে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তি পরিষদের বাহিনী পুলিশ ও মিলিটারীর ওপর আঘাত হেনে অস্ত্র দখল করে নিজেদের সজ্জিত করেছিল। কত বার জঙ্গলে পুলিশ-মিলিটারীকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উল্টো পুলিশ ও মিলিটারীকে জব্দ করে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে তিনি অসম সাহসে সাফল্যের সাথে বেরিয়ে এসেছেন সেসব ঘটনা এখনো ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে কিংবদন্তি। শুধু কি পুলিশ-মিলিটারীর বিরুদ্ধে বন্দুক নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম ? ত্রিপুরার জঙ্গলে ছিল তখন অনেক হিংস্র বাঘ। বড়মুড়ার জঙ্গলে আত্মগোপনে থাকার সময় বাঘের আক্রমণে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে বাঘকে নিপুণ হাতে বন্দুক চালিয়ে তিনি ঘায়েল করেছেন, এসব ঘটনাও কিংবদন্তি হয়ে আছে।

মুক্তি পরিষদের এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের গেরিলা যোদ্ধারা ছিলেন বিপ্লবী শৃঙ্খলাপরায়ণ। বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের নির্দেশ ছিল কখনো কারো হাঁস, মুরগী, পাঁঠা কেউ জোর করে নিতে পারবে না। এমন কি একটা কাঁচা লংকা কারো জমি থেকে কেউ না বলে তুলে নিতে পারবে না। শৃঙ্খলাভঙ্গের কোন অভিযোগ এলে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হত। এই বিপ্লবী শৃঙ্খলাই কমরেড দশরথ দেব সারাজীবন অনুসরণ করে এসেছেন।

এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা কমরেড দশরথ দেববর্মাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য নেহরু সরকারের পুলিশ তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছিল সে সময়ের অর্থে দশ হাজার টাকা। প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেববর্মা ও তাঁর সহযোদ্ধারা তদানীন্তন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির তদানীন্তন নেতৃত্বের অন্যতম কমরেড প্রাণেশ বিশ্বাস মুক্তি পরিষদের সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। মুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব ও সদস্যরা সে প্রস্তাব আলোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবে ত্রিপুরার সবচাইতে অনগ্রসর উপজাতিরা শ্রেষ্ঠ মতবাদ 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'-কে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম পাহাড়ে লাল ঝান্ডা তোলেন। সে ঝান্ডা পরে ছড়িয়ে পড়ে দেশভাগের

ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে। গড়ে ওঠে ত্রিপুরার উপজাতি-বাঙ্গালী উভয় অংশের জনগণের মিলিত গণ সংগ্রাম, যা অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির শক্ত ভিত গড়ে তোলে এবং ১৯৭৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম দেয়।

মাথার ওপর দশ হাজার টাকা দামের হুলিয়া নিয়েই ১৯৫২ সালে কমরেড দশরথ দেব স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে পূর্ব ত্রিপুরা (উপজাতি সংরক্ষিত) কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। আত্মগোপনে থেকে তিনি দিল্লীতে লোকসভায় গিয়ে স্পিকারের কাছে নিরাপত্তা চান। লোকসভার স্পিকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাশনাথ কাটজুকে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ওপর থেকে নেহরু সরকার হুলিয়া প্রত্যাহার করে নেয়। ভোটার তালিকায় কমরেড দশরথ দেববর্মার নাম 'দেববর্মা'র স্থলে 'দেব' ছাপা হয়েছিল। তাই তিনি তখন থেকে দশরথ দেব নামেই পরিচিত।

দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালী উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরায় স্রোতের মতো প্রবেশ করেন। উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দাবিতে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সে সময়ে স্নেহময় চাকমা প্রমুখ উগ্র বাঙালী বিদ্বেষীরা তথাকথিত 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং এরা প্রচার করেছিলেন যে দশরথ দেব রাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে, নেহরু সরকারের পুলিশ-মিলিটারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন সে দশরথ দেব উদ্বাস্তুদের ঠেকাতে সীমান্তে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিলে উদ্বাস্তু ঠেকানো যেত। কমরেড দশরথ দেব এই সাম্প্রদায়িক প্রচারে বিভ্রান্ত হননি। বরং সংসদে তুলে ধরেছিলেন উদ্বাস্তুদের দুর্দশার চিত্র এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মতো পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সম পরিমাণে পুনর্বাসন সাহায্য দেয়ার দাবি তুলেছিলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে দীক্ষিত দশরথ দেব সাম্প্রদায়িকতা এবং সংকীর্ণতাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি, বরং এর বিরোধিতা করেছেন। এই আদর্শবোধ থেকেই সত্তরের দশকে উপজাতি যুব সমিতির তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' উপজাতি আন্দোলনের ডাক কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বাধীন গণমুক্তি পরিষদ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পার্টিতে মতাদর্শগত সংগ্রামেও কমরেড দশরথ দেবের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট এবং দৃঢ়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতাদর্শগত সংগ্রামে মার্কসবাদের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তথা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে কলকাতায় সপ্তম কংগ্রেসে যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠন করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন দশরথ দেব।

অনগ্রসর ত্রিপুরাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করা ছিল কমরেড দশরথ দেবের ধ্যান-জ্ঞান। ত্রিপুরার উন্নয়নে রেল সম্প্রসারণ, শিল্পায়নের জন্য সংসদের ভেতরে যেমন বার বার তিনি সোচ্চার হয়েছেন, তেমনি গণ সংগ্রামের ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা।

১৯৭৮ সালে রাজ্যের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব জনশিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণে রাজ্যে শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগতভাবে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর এই অবদানও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপজাতি অধ্যুষিত সবচাইতে দুর্গম এলাকায় যেমন প্রথম

ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার কয়েকশো স্কুল স্থাপন করেছিল, তেমনি তখনকার প্রতিটি মহকুমায় কলেজ স্থাপন এবং ত্রিপুরার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। উপজাতি মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারে ককবরক ভাষা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা, শিক্ষক নিয়োগে এবং পাঠক্রম তৈরিতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। নিজে লিখেছেন বই এবং অভিধান। উপজাতি সংকীর্ণতাবাদীদের রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালুর যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করে বাংলা হরফে ককবরক ভাষা চালুর স্বপক্ষে বার বার জোরালোভাবে কলম ধরেছেন।

যিনি সারাজীবন উপজাতি সর্বস্বতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকরা, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিল। কারণ, কমরেড দশরথ দেব ছিলেন উপজাতি-বাঙালীসহ সমস্ত সম্প্রদায় এবং জাতিগোষ্ঠীর শোষিত জনগণের নেতা।

১৯৮০ সালের জুনে দু'অংশের সাম্প্রদায়িকরা ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাধায়, সেদিন কমরেড দশরথ দেবকে তারা আক্রমণের মূল লক্ষ্য করেছিল। দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা। সেদিন কত কঠিন অবস্থার মধ্যে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল। সংখ্যাগুরু বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িকরা এবং তাদের তল্পীবাহক পত্রিকাগুলো সেদিন কুৎসা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়েছিল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের সামনের পুরানো বাড়িটির পশ্চিমদিকের ছোট একটি কক্ষে তাঁকে সপরিবারে গাদাগাদি করে কাটাতে হয়েছিল অনেক কষ্ট সহ্য করে। তেমনি, ১৯৮৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ছাওমনুর রাস্তায় বিচ্ছিন্নতাকামী উগ্রপন্থী সংগঠন টি এন ভি-র চুনী কলই কমরেড দশরথ দেবকে হত্যা করতে গাড়ীতে গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছিল।

চলন্ত গাড়ীতে কাঁচ ভেঙে গ্রেনেড ভেতরে পড়ে। কিন্তু সেটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান। তারপরও কমলপুরের জিওলছড়া, বলরামে তাঁকে হত্যার জন্য টি এন ভি অ্যাম্বুশ করেছিল। কমরেড দশরথ দেব উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলে স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রামে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছেন, তেমনি তথাকথিত 'স্বাধীন ত্রিপুরা', 'কেন্দ্রশাসিত রাজ্য' -এর দাবির বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন। উভয় অংশের জনগোষ্ঠীর শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এই নেতা সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিজেকে জাতি-উপজাতি গণতান্ত্রিক জনগণের 'মৈত্রীর সেতু' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কমরেড দশরথ দেব পার্টিতে যেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি সবসময় অনুসরণ করে এসেছেন তেমনি যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। কমরেড দশরথ দেব শুধু ত্রিপুরার নন, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অসাধারণ নেতা। তাঁর শূন্যতা পূরণ করা কঠিন। তাঁর জীবনাদর্শে অবিচল থেকে উপজাতি -অনুপজাতি গণতান্ত্রিক মৈত্রীকে আরো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সংগ্রাম জারী রেখে কমরেড দশরথ দেবের সমগ্র পার্টিকে তাঁর শূন্যতা পূরণে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

কমরেড দশরথ দেব অমর হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে



সরোজ চন্দ

এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে দুই বছর ধরে। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয় এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কমরেড দশরথ দেব এক কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন।

আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্যগুলির অন্যতম, ভৌগোলিকভাবে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে খুবই পিছিয়ে পড়া রাজ্য ত্রিপুরা আজ সারাদেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার একটি উৎস। ত্রিপুরাকে এমন কি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক 'অগ্রবর্তী ঘাঁটি' বলেও সম্মানিত করা হয়ে থাকে। ত্রিপুরার জনগণ যে সাফল্য অর্জন করেছে তার পেছনে কয়েক দশকের বিরামহীন শ্রেণী ও গণ-সংগ্রামের ইতিহাস। আর জনগণকে সংগঠিত করে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যাঁরা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন কমরেড দশরথ দেব।

কমরেড দশরথ দেবের রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল যখন তিনি তাঁর সহকর্মীদের সাথে মিলে ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর (১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ই পৌষ) ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি নাম দিয়ে সমাজ-সংস্কারমূলক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কমরেড সুধন্বা দেববর্মা আর তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সহ সভাপতি। উপজাতি সমাজকে অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করাই ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। জনশিক্ষা সমিতি গঠনের পেছনে ছিল ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কমরেড বীরেন দত্তের অনুপ্রেরণা। এটা ছিল এমন এক সময় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল ত্রিপুরার মত 'প্রত্যন্ত' অঞ্চলেও। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এবং রাজবন্দীরা মুক্ত হয়ে আসার ফলে অনতিকালের মধ্যেই রাজ্যে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলিরও একে একে আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এই রাজনৈতিক নবজাগরণের পাশাপাশি ত্রিপুরায় শিক্ষিত উপজাতি ছাত্র-যুবদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। আত্মবিকাশের প্রয়োজনে উপজাতি সমাজকে অশিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তারা তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করে। সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্য সামনে রেখে একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই জনশিক্ষা সমিতি যাত্রা শুরু করেছিল একথা সত্যি। কিন্তু এ ধরনের একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবেই যে পরবর্তী কালে রাজনীতির গতিপথ নির্ধারিত হবে এটা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

উপজাতি-প্রধান এলাকায় গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী নিয়ে জনশিক্ষা সমিতি যখন কাজে নেমে পড়ে উপজাতি সমাজের মধ্যে তখন সাড়া পড়ে যায়। শিক্ষা আন্দোলন এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একের পর এক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তিন শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন এবং আর্থিক মঞ্জুরীও লাভ করেছিল। এই সাফল্য ছাড়াও রাজনীতিগতভাবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল জনশিক্ষা সমিতি উপজাতি জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টি করেছিল সেটাই পরবর্তীকালে মুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি রচনা করেছে।

কমরেড দশরথ দেবের জন্য এটা ছিল নেতৃত্বের প্রথম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠক হিসাবে তিনি যেমন তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন তেমনি উপজাতি জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছড়িয়ে পড়েছিল দারুণভাবে। যদিও শুরুতে তিনি ছিলেন অন্যান্য অনেকের মধ্যে একজন, কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতার গুণে তিনি তাঁর সহকর্মীদের অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের মে মাসে উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। জনশিক্ষা সমিতির নেতা ও কর্মীদের নিয়েই এই সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল। কমরেড দশরথ দেব ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সভায় গণমুক্তি পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই সভায় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বীরেন দত্ত-ও উপস্থিত ছিলেন এবং এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইস্তেহার রচনা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তাঁর উপরেই।

গণমুক্তি পরিষদ গঠনের পূর্ব ইতিহাস এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঐ কংগ্রেসে যে রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছিল তারপর থেকে সারাদেশ জুড়েই কমিউনিস্টদের উপর প্রচণ্ড দমনপীড়ন শুরু হয়। কোন কোন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময়ে। আর অন্য যেসব রাজ্যে সরকারীভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়নি সেই সব রাজ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল। হাজার হাজার কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল। পুলিশের গুলি চালনায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন অনেক কমিউনিস্ট কর্মী। জেলখানায় আটক নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালনার মত নৃশংস ঘটনাও ঘটেছিল। ত্রিপুরায়ও সেই সময়ে পার্টির দুই স্থানীয় নেতা দেবপ্রসাদ

সেনগুপ্ত ও কানু সেনগুপ্তকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হন অপর দুই রাজনৈতিক নেতা প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর। অবশ্য এই দু'জনের একজনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, তবে উভয়েই কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন।

গ্রেপ্তার এড়াতে কমরেড বীরেন দত্ত আত্মগোপন করেন। একই সঙ্গে আত্মগোপন করেন কমরেড অঘোর দেববর্মাও (কমরেড অঘোর দেববর্মা ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পেয়ে গিয়েছিলেন)। কমরেড দত্ত আত্মগোপন করার অল্প কিছুকালের মধ্যে কমরেড দশরথ দেব, অঘোর দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা ও বীরেন দত্তের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন, ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমরেড দশরথ দেব হয়েছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন যথাক্রমে কমরেড অঘোর দেববর্মা ও কমরেড হেমন্ত দেববর্মা। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেব ও তাঁর সহকর্মিগণ উপজাতি জনগণের মধ্যে যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাতে উপজাতি জনগণকে বিপুল সংখ্যায় গণমুক্তি পরিষদের পতাকাতলে সমবেত করতে তাঁদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। মহাজনী শোষণ, বেগার শ্রম প্রভৃতির মত যেসব সমস্যা উপজাতিদের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলন সংগঠিত করা ছাড়াও জনগণের সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবিগুলিকেও পরিষদ তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাদের প্রধান রাজনৈতিক দাবি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গণমুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই কমরেড বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যান। তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল আসামের বিভিন্ন জেলে। ফলে পরবর্তী সময়ে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তাতে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি যখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন প্রতিরোধ সংগ্রাম তখন প্রত্যাহৃত না হলেও অনেকখানি স্তিমিত।

গণমুক্তি পরিষদ তার জন্মের তিন মাসের মধ্যেই প্রথম শক্তি পরীক্ষায় নামে যখন স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী দিবসেই (১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট) আগরতলায় এক বিরাট মিছিল সংগঠিত করে। সেদিন গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে গ্রামের উপজাতিদের একটি সুসংগঠিত মিছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার গঠনের দাবি নিয়ে আগরতলা শহরে হাজির হয় এবং শহরের রাজপথ পরিক্রমার পর আবার সুশৃঙ্খলভাবে ফিরে যায়। পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য জাল বিছিয়ে ছিল সত্যি, কিন্তু তারা সফল হয়নি। সাফল্যজনকভাবে এই মিছিল সংগঠিত হওয়ার পর থেকে গণমুক্তি পরিষদের কর্মীগণ তো বটেই, সমর্থক উপজাতি জনগণের মধ্যেও প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। নূতন নূতন এলাকায় দ্রুত সংগঠনের বিস্তৃতি ঘটে এবং নূতন নূতন কর্মীও বেরিয়ে আসতে থাকে।

উপজাতি জনগণের মধ্যে গণমুক্তি পরিষদের প্রভাব যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আতঙ্কিত সরকার দমননীতিকে প্রবল করে তোলার জন্য ততই প্রস্তুত হচ্ছিল। এমনি ধরনের এক পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ৯ই অক্টোবর সদরের গোলাঘাটিতে নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের গুলি চালনার পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঐদিন মহাজন হরি সাহার পক্ষ হয়ে এক বিরাট

পুলিশবাহিনী গোলাঘাটি গিয়ে হাজির হয়েছিল উপজাতি ও বাঙ্গালী মুসলমান কৃষকদের দমন করার জন্য। গোলাঘাটি অঞ্চলে তখন চলছিল প্রচণ্ড খাদ্যসঙ্কট। উপজাতি ও মুসলমান কৃষকেরা মহাজন হরি সাহার কাছে অনুরোধ জানাতে এসেছিল যাতে সে তার মজুত (দাদনলব্ধ) ধান, চাল ঐ অঞ্চল থেকে অন্যত্র সরিয়ে না নেয়। কিন্তু পুলিশ বিনা প্ররোচনায় ঐসব নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ৭ জন। নিহতদের মধ্যে ৬ জন ছিল উপজাতি ও একজন বাঙ্গালী মুসলমান কৃষক। এছাড়া আরও ৮ জন আহত হয়েছিল যাদের সকলেই উপজাতি।

এই ঘটনার পর উপজাতিদের মধ্যে যাতে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হতে পা নারে এবং আন্দোলনের উপর যাতে তার ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়তে পারে সেদিকে কমরেড দশরথ দেবকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। এই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল এজন্য যে ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের মৃত্যুর পর থেকে ত্রিপুরার শাসনকার্য যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল তাতে উপজাতিদের অনেকেরই মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে রাজ্যের শাসনক্ষমতা বাঙ্গালীদের দখলে চলে গেছে। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল এজন্য যে মহারাজা বীরবিক্রমের যখন মৃত্যু হয় যুবরাজ কিরীটবিক্রম তখন নাবালক। তাঁর (যুবরাজের) পক্ষে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে একটি রিজেন্সী কাউন্সিল, যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রয়াত মহারাজের বিধবা পত্নী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শমত সেই সময়ে যাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী আই সি এস অফিসার এস মুখার্জি। রাজনৈতিক কারণে মুখার্জী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনিও ছিলেন আর এক বাঙ্গালী আই সি এস অফিসার — এ বি চ্যাটার্জি।

উপজাতিদের কোন কোন অংশের মধ্যে রাজ্য প্রশাসনে বাঙ্গালী প্রাধান্য নিয়ে যখন সন্দেহ গভীরতর হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ড যদি তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ যে মহাজনের পক্ষ হয়ে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল সেই মহাজন ছিল একজন বাঙ্গালী। তাছাড়া, গুলি চালনার আদেশ যে দিয়েছিল সেই পুলিশ অফিসার সহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও সবাই ছিল বাঙ্গালী।

গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পর কমরেড দশরথ দেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে সরকারের আক্রমণ অধিকতর তীব্র হওয়ার আগেই আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যাপক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে যাতে উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে না পারে। গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ড উপজাতিদের মধ্যে যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল তাকে পরিচালিত করতে হবে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। কমরেড দশরথ দেব একথা ভাল করেই জানতেন যে আন্দোলন যদি বিপথে চালিত হয়ে উপজাতি-বাঙ্গালী সংঘর্ষের রূপ নেয় তাহলে উপজাতিদের আত্মবিকাশের এই সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য।

গোলাঘাটি হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ধাপে ধাপে প্রতিরোধ সংগ্রাম যেভাবে গড়ে উঠেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার স্থান এটা নয়, প্রয়োজনও নেই। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে খুব সুপরিকল্পিতভাবে এ সময় থেকে গেরিলা বাহিনী তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছিল। কমরেড দশরথ দেব নিজেই ছিলেন এই বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার। এই বিষয়ে যে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল তা নয়। তাছাড়া তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তখন পর্যন্ত ছিল খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে

প্রতিরোধ সংগ্রামকে তিনি পরিচালনা করেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। গেরিলাদের একটা বড় অংশই ছিল যুদ্ধ ফেরৎ প্রাক্তন সৈনিক।

তবে এইসব প্রাক্তন সৈনিকদের যেহেতু রাজনৈতিক শিক্ষা ছিলনা সেজন্য তাদের রাজনৈতিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মুক্তি পরিষদ নেতৃত্ব জানতেন যে রাজনৈতিক চেতনাবিহীন গেরিলা বাহিনী অনেক সময়ে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এই সময়ে উপজাতি জনগণের পরিবর্তিত মনোভাব ও সংগ্রামী মনোবলের বর্ণনা দিয়ে কমরেড দশরথ দেব পরবর্তী সময়ে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''সরকার হিসাবে ভুল করেছিলেন। তারা গোলাঘাটির ৭ জন কৃষককে হত্যা করেছিলেন সত্যি, কিন্তু উপজাতি কৃষকদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে হত্যা করতে পারেননি।

গোলাঘাটি হত্যাকান্ডের পর প্রতিরোধ আন্দোলন খোয়াই ও সদর বিভাগে জঙ্গী রূপ নেয়। উপজাতি কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন যত তীব্র রূপ নিতে থাকে সরকার পুলিশ বাহিনী ছাড়াও সামরিক বাহিনীকে তার মোকাবেলায় নিয়োগ করতে শুরু করে কিন্তু সরকার যত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে পাকা করে তুললো ততই তার সাথে পাল্লা দিয়ে উপজাতি জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন অধিক থেকে অধিকতরভাবে শক্তিসঞ্চয় করতে আরম্ভ করলো।''

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ সামরিক আইন জারী করে খোয়াই বিভাগকে পুরোপুরিভাবে তুলে দেয়া হয় সেনাবাহিনীর হাতে। খোয়াই ও সদর বিভাগ থেকে দলে দলে উপজাতিদের গ্রেপ্তার করে এনে জেলে পুরা হয়। জ্বালিয়ে দেয়া হয় শত শত ঘরবাড়ি। প্রাণভয়ে মানুষ-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এ ছিল এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য। দশরথ দেব এবং অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার আরও বেশি ক্ষিপ্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ২৮শে মার্চ (১৩৫৯ ত্রিপুরাব্দের ১৪ই চৈত্র) সেনাবাহিনী খোয়াই বিভাগের পদ্মবিল গ্রামের উপর হামলা চালায়। গ্রামের উপজাতি মহিলাগণ দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী মহিলাদের উপরও গুলি বর্ষণ করে। কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

পদ্মবিলের নারীহত্যার পর প্রতিরোধ সংগ্রাম অধিকতর তীব্রতা লাভ করে। দশরথ দেবের নিজের কথায় ''পদ্মবিলের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকারের প্রতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। সরকারী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার মানসিক দৃঢ়তা উপজাতি জনগণের মধ্যে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কার্যকরীভাবে যাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয় অংশের মধ্য থেকেই গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।''

এই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে দুই বছর ধরে। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয় এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কমরেড দশরথ দেব এক কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন উপজাতি জনগণের অন্তরের অন্তঃস্থলে।

প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে সদর ও খোয়াই বিভাগের বিস্তীর্ণ উপজাতি এলাকায় রাজ্য সরকার তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক সমান্তরাল প্রশাসন। জনগণ সরকারকে প্রদেয় সব রকমের ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছিল। আইন-আদালত ও সরকারী

অফিসগুলিকে বয়কট করা হয়েছিল। ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ সহ সব রকমের বিরোধ গণমুক্তি পরিষদের কমিটিগুলিই মীমাংসা করত। বড় জোতদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত খাদ্যশস্য দিয়ে গ্রেইন ব্যাঙ্ক বা খাদ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়েছিল যেখান থেকে গরীব উপজাতিরা অভাবের সময় সাহায্য পেতে পারত। ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে খাসভূমি বণ্টনের দায়িত্বও নিয়েছিল গণমুক্তি পরিষদ কমিটিগুলি। জনগণের ঋণের প্রয়োজন মেটাবার মত কোন ব্যাঙ্ক বা অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ঐসব এলাকায় ছিলনা। সেজন্য মহাজনী ব্যবসা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে মহাজনী ব্যবসার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। এইসব জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে আন্দোলনের শক্তির উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালীন ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কমরেড দশরথ দেব ও গণমুক্তি পরিষদের নেতৃস্থানীয় সকল সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে অসম প্রাদেশিক কমিটির সদস্য প্রাণেশ বিশ্বাসকে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়েছিল গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দিতে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে কমরেড দশরথ দেব ও অন্যান্যরা পার্টিতে যোগ দেয়ার পর কমরেড প্রাণেশ বিশ্বাসের উপস্থিতিতেই পার্টির একটি জেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়েছিল।

কমরেড দশরথ দেব পার্টি সদস্যপদ লাভ করার এক বছরের মধ্যে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় গোপনীয়ভাবে পার্টির একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন (All India Party Conference) অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্টি কর্মসূচী (Party Programme) চূড়ান্ত করার জন্য। ঐ সম্মেলনে কমরেড দশরথ দেবকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল উপস্থিত থাকার জন্য। ঐ সম্মেলনেই তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে ব্যক্তিগতভাবে এটা ছিল তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতার স্বীকৃতি।

তারপর থেকে একটানা ৪৭ বছর তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রথমে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির এবং ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র। সম্প্রতি কলকাতায় পার্টির যে ষোড়শ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কমরেড দশরথ দেব ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুরা পূর্ব কেন্দ্র থেকে লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে মাথার উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সেবার তাঁকে নির্বাচন লড়তে হয়েছিল। প্রকাশ্যে ভোটারদের সামনে উপস্থিত হয়ে যে তিনি ভোট চাইবেন সে সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পরেও যে তাঁর উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেবে, রাজ্য সরকারের এমন কোন ইচ্ছা ছিল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তাকে গোপন পথে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নয়াদিল্লী পৌঁছতে হয়। শপথ নেবার জন্য লোকসভায় হাজির হওয়ার আগে পর্যন্ত পুলিশ তাঁর গতিবিধি অনুমান করতে পারেনি। এই নাটকীয় ঘটনার পর সেদিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে ত্রিপুরা সরকার দশরথ দেবের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেয়। একই সঙ্গে ত্রিপুরায় অন্যান্য যাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল সেইসব গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল। ত্রিপুরায় কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাচারী শাসনের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে যে

সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সেদিন তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এভাবেই।

ত্রিপুরার রাজনীতিতে কমরেড দেবের প্রভাব বিস্তৃত প্রায় পাঁচ দশক ধরে। একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব। গণ আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা হিসাবে, সংসদ-সদস্য হিসাবে এবং সর্বোপরি রাজ্যের মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কমরেড দশরথ দেব তার নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, ভবিষ্যতে হয়ত আরও আলোচনা হবে। তবে যখন যে অবস্থানেই থাকুক না কেন সব সময়েই তিনি গুরুত্ব আরোপ করে এসেছেন ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মৈত্রীকে শক্তিশালী করার উপর। তিনি দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করতেন যে শেষ বিচারে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বাঙ্গালী ও উপজাতি এই দুই জনগোষ্ঠীর মৈত্রীবন্ধন কতটা শক্তিশালী করা যায় তার উপরে।

১৯৫৪ সালের ১৯শে মে তৎকালীন পার্টি মুখপত্র 'ত্রিপুরার কথা'য় লিখিত এক প্রবন্ধে জাতি-উপজাতি মৈত্রীর প্রশ্নে কমরেড দশরথ দেব যে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন আজ এত বছর বাদেও সেই বক্তব্যের গুরুত্ব বেড়েছে বৈ কমেনি। এ প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "ত্রিপুরীদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও বাঙালী বিদ্বেষ প্রচার করে যারা আজ তাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ হতে বিচ্ছিন্ন করে, আলাদা দল তৈরি করে, ত্রিপুরীদের স্বার্থরক্ষা করার কথা চিন্তা করেন, ত্রিপুরার জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ বাঙালীদের সাথে শত্রুতা করে পাহাড়িয়া জাতির সত্তা রক্ষা ও তাদের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখেন, আমি বলব, তারা এখনো কল্পনার রাজ্যেই বাস করছেন। বাঙালি সমাজ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কেঁচো মাটির চাকা নয় যে একটু ঠেলা দিলেই নীচে গড়িয়ে পড়ে একদম চুরমার হয়ে যাবে। ত্রিপুরার মাটির সাথে তাদেরও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।" ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও লিখেছিলেন, "উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জাতি ও উপজাতিকে আল্‌গা করে, জাতিতে জাতিতে আলগা করে, নিজ নিজ জাতি ও উপজাতি রক্ষার চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু এই বাস্তব বিরোধী চিন্তা আমরা মনে স্থান দিইনা।"

"আমরা একদিকে বর্ণনাতীত কাল থেকে পশ্চাৎপদ, অবজ্ঞাত, নির্যাতিত, সবরকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত পার্বত্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনা — অন্যদিকে তেমনি পাহাড়িয়া ছাড়া ত্রিপুরায় যেসব বাঙালি হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী ও অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের স্বার্থ পায়ে মাড়াতে পারিনা (ইয়াকু বাই নাগই মায়া)।"

"সবারই স্বার্থরক্ষা করতে হবে। একে অন্যের উপর ভর করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেউ কারো সাথে শত্রুতা করে সুফল পাবেনা। শোষকদের বিরুদ্ধে, শাসকদের জনমত দলনের বিরুদ্ধে, তাদের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হবে আমাদের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সত্তা রক্ষার এবং ইহাকে আরও সঞ্জীবিত করে তোলার সংগ্রাম। শত্রুদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম না করে, নিজেদের মধ্যে বিভেদ নীতি জিইয়ে রেখে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে আত্মঘাতী নীতি।"

কমরেড দশরথ দেব এই প্রবন্ধ যখন লিখেছিলেন তখনও ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতি সমস্যা আজকের দিনে যতটা জটিল ততটা জটিল রূপ নেয়নি। তা সত্ত্বেও জাতি-উপজাতি মৈত্রীর প্রশ্ন সেই সময়েই তাঁকে কতটা ভাবিয়ে তুলেছিল তাঁর এই প্রবন্ধ থেকে সেটা অনুমান করা যায়। উপজাতিদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে বরাবরই তিনি দেখে এসেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অভিন্ন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে

যেখানে উপজাতিদের দাবির পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদের সমর্থন টেনে আনারও প্রয়োজন পড়বে। তাঁর এই নীতিনিষ্ঠ অবস্থানের জন্য তিনি দু'দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছেন। বাঙ্গালী জাত্যভিমানীরা তাঁকে আক্রমণ করেছে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী একজন সাম্প্রদায়িক নেতা বলে। অন্যদিকে সংকীর্ণ উপজাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরোধিতা করেছে এই বলে যে দশরথ দেব যদি আপোষমূলক মনোভাব না দেখাতেন তাহলে ত্রিপুরায় বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমন ঘটতে পারত না এবং এ রাজ্যে বাঙ্গালী প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হত না।

কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯৪৯-৫১-র সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে বিকৃত করে কংগ্রেস সেদিন এই আন্দোলনকে 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন বলে প্রচার চালিয়েছিল। কমরেড দশরথ দেবকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের নায়ক হিসাবে। আশির দাঙ্গার সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছিল এই বলে যে জাতিগত দাঙ্গার জন্য তিনিই দায়ী। ১৯৯৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তিনি যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন তখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একটানা প্রচার শুরু হয়েছিল তার আমলে রাজ্যে বাঙ্গালী স্বার্থ বিপন্ন। উগ্রপন্থীদের প্রচ্ছন্নভাবে মদত যোগাবার অভিযোগও আনা হয়েছিল তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে।

উপজাতি নেতাদের মধ্যে যারা উপজাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার শিকার হয়েছিলেন একসময়ে তাদের অভিযোগ ছিল সংসদে নিজের আসন নিরাপদ রাখার জন্য কমরেড দশরথ দেব উপজাতি স্বার্থ বিপন্ন করে বাঙালীদের খুশি রাখতে চাইছেন। জন্মের পর থেকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিল কমরেড দশরথ দেবকে। সাধারণ উপজাতিদের বিভ্রান্ত করার জন্য যুব সমিতির পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হয়েছিল যে ১৯৫০-৫১ সালে দশরথ দেব যদি 'বিনা কারণে' উপজাতিদের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ভারত সরকারের কোপানলে না ফেলতেন, তাহলে উপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট করার জন্য উদ্বাস্তুদের বিপুল সংখ্যায় এ রাজ্যে পুনর্বাসন দেয়া হতনা। এমনি ধরনের কত রকমের অপপ্রচার যে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে বিভিন্ন সময়ে চালানো হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করার চেষ্টারও কসুর হয়নি।

কিন্তু সব মিথ্যা ও অপপ্রচারের ফানুস ফেটে গেল সেদিন যেদিন কমরেড দশরথ দেব শেষবারের মত চোখ বুঝলেন, ১৪ই অক্টোবর ভোরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে পরদিন অপরাহ্নে খোয়াইয়ের আমপুরায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কাতারে কাতারে শোকভারাক্রান্ত মানুষ যেভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন চোখের জলে তাঁকে শেষ বিদায় জানাবার জন্য, এ ধরনের শোকোচ্ছ্বাস এ রাজ্যে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। বাঙ্গালী-উপজাতি মণিপুরী-হিন্দুস্থানী — সব জাতি সব ধর্মের মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল শোকমিছিলে। কমরেড দশরথ দেব জাতি-উপজাতি মৈত্রীর যে স্বপ্ন দেখতেন, যার জন্য জীবনভর তিনি লড়াই করেছেন তা-ই যেন সেদিন বাস্তব রূপ নিয়ে নেমে এসেছিল তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে। কমরেড দশরথ দেবকে বলা হত জাতি-উপজাতি মৈত্রীর সেতু। তিনি যে প্রকৃত অর্থেই জাতি-উপজাতি মৈত্রীর সেতুবন্ধ ছিলেন তাঁর মৃত্যু সেকথা আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে গেল। মৃত্যু তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নিলেও তিনি অমর হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে। তাঁর মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে সেই শূন্যতা পূরণ করতে হবে, যে আদর্শের জন্য তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন সেই আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

যেভাবে পথ চিনিয়েছিলেন



জিতেন্দ্র চৌধুরী

তিনি জনশিক্ষা আন্দোলন দিয়ে শুরু করেছিলেন। কুসংস্কার এবং সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। জাতি বা উপজাতির যথার্থ উপকার পারস্পরিক সহযোগিতা বা সমর্থনের উপরই নির্ভর করে তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আজ এই জটিল মুহূর্তে সেই আদর্শ বাণীই আমাদের পাথেয় হউক।

১৯৭২ সাল। সবেমাত্র বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর সরকারের নেতৃত্বে বিরাট বিজয় এবং বাংলাদেশ গঠনের সাফল্যকে পুঁজি করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য রণকৌশল সাজাতে শুরু করেছেন। আমি তখন আমার গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করে সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। ঠাঁই হয়েছিল বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। সারা রাজ্যের সঙ্গে সাব্রুমেও তখন ছাত্র আন্দোলন ও কর্মচারীদের আন্দোলন ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গ্রাম থেকে আসা বেশির ভাগই বামপন্থী তথা এস এফ আই-এর সদস্য-সদস্যা। সংখ্যায় এস এফ আই গরিষ্ঠ। কিন্তু সরকারী ক্ষমতার জোরে স্কুলের চত্বরে বা শহরের মাতব্বরি ছাত্রপরিষদের হাতেই। হোস্টেলের আবাসিকের সংখ্যা ত্রিশ জনের মত। বেশির ভাগই এস এফ আই-এর সমর্থক। কিন্তু ছাত্র পরিষদ ও সুপারের নজরে পড়ার ভয়ে গোপনেই মিটিং-মিছিলে যেতে হত। আমি তখনও এস এফ আই-এর সদস্য হইনি। একদিন রাত্রিবেলা আমাদের হোস্টেলের ইউনিট সম্পাদক আমাকে বলল একটি বাড়ীতে সভায় যেতে হবে। সুপারের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা চার-পাঁচ জন। সভার কর্মসূচী কমরেড দশরথ দেব-এর জনসভায় লোক আনা। তখন সাব্রুমে বাঙালীদের মধ্যে পার্টির তেমন প্রভাব ছিল না। তাই লোক আনতে হবে দূর দূর এলাকা থেকে। উপজাতি গ্রামের লোকদের। জনসভার দিন আমাদের উপর দায়িত্ব পড়ল জনসভায় আসা লোকদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এই প্রথম কোন একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে আমার অংশগ্রহণ হবে। এর আগে একবার আমার গ্রামের পাশে কমরেড দশরথ দেবকে দেখেছি কিন্তু বক্তৃতা শুনিনি। তখন তাঁর সম্পর্কে নানারকম গল্প গুজব সাধারণের মধ্যে প্রচার ছিল। তাই প্রবল ঔৎসুক্য একদিকে চোখে দেখার, বক্তৃতা শোনার ও দায়িত্ব পালনের। সাব্রুমে সরকারী মাঠে সভা করতে অনুমতি দেয়া হয়নি — তাই সুনীল চৌধুরী (প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ)-র

বাড়ীর কাছে তাঁরই জায়গায় একটি মাঠে সভা হবে। জনসভা উপলক্ষে প্রকাশ্যে তেমন প্রচারও হয়নি। শহরে হাতে লেখা কয়েকটি পোস্টার পড়েছে মাত্র। আমার কেন জানি আশঙ্কা ছিল এত চওড়া জায়গা ভরবে কি ? গাড়ী-ঘোড়া নেই। দূর-দূর এলাকা থেকে লোকজন কিভাবে আসবে ইত্যাদি। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম শত শত উপজাতি নরনারী এমন কি মায়েরা শিশু কোলে নিয়ে সকাল থেকেই পৌঁছুতে শুরু করেছে। একসময় মাঠটি ভর্তি হয়ে গেল। ছোটখিল থেকে বাঙালী অংশেরও কিছু লোক এলেন। দশটা নাগাদ একটি জীপে করে কমরেড দশরথ দেব এসে নামলেন। নেমেই গাড়ী থেকে মাইক্রোফোন নামিয়ে বাঁশের আগায় বেঁধে বক্তৃতা শুরু করলেন। প্রথমে কক্‌বরকে। ১১টা বেজে গেলে স্কুলে হাজিরা ঠিক রাখতে আমরা হোস্টেলের ছেলেরা স্কুলে চলে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় ঘণ্টা শেষ হলে স্কুল পালিয়ে আবার জনসভায় এসে দেখি তখনও কমরেড দশরথ দেব বক্তৃতা করছেন। এবার বাংলায়। ইতিমধ্যে দোখ উপজাতি শ্রোতাদের পাশাপাশি বেশ কিছু অনুপজাতি অংশের মানুষও জুটেছেন। কি ছিল তাঁর বাগ্মিতা। বিভিন্ন বিষয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ ও দীর্ঘক্ষণ কথা বলার ক্ষমতা। সার্বজনীন শিক্ষা, ভূমি সংস্কার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাবলীল ব্যাখ্যা। তখনই আমার কিশোর মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলো, না, এই সমাজ পরিবর্তনে আমিও শরিক হব। এই জনসভার পরই আমি এস এফ আই-এর সভ্যপদ নিয়েছিলাম। তার ক'দিন বাদেই ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচন। কংগ্রেস থেকে মনু কেন্দ্রে শ্রীহরিচরণ চৌধুরী (আমার জ্যাঠতুতো দাদা) ও সাব্রুম কেন্দ্রে প্রয়াত কালীপদ ব্যানার্জি নির্বাচন প্রার্থী। অন্যদিকে সি পি আই (এম) থেকে মনু কেন্দ্রে শ্রীথৈংগীয় মগ ও সাব্রুম কেন্দ্রে শ্রীসুনীল চৌধুরী প্রার্থী। আমাদের পরিবার তখন কংগ্রেস-ঘেঁষা। একদিকে বয়সও খুব কম অন্যদিকে কংগ্রেস বিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণ আমার পক্ষে চ্যালেঞ্জেরই সামিল। পরিবার থেকে বাধা আসবে। কিন্তু আমি কমরেড দশরথ দেব-এর সেই বক্তৃতায় এতটা আচ্ছন্ন, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেই বাড়ীর লোকদের না জানিয়ে লুধুয়ায় গিয়ে বুকে কাস্তে হাতুড়ির ব্যাজ পরে সারাদিন স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তখন সম্ভবত হেমন্তকাল ছিল। কুয়াশা ভেদ করে যেতে হয়েছিল। সেদিন কয়েকটি বিস্কুট ছাড়া অন্য কোন খাওয়াও জোটেনি। সন্ধ্যায় অনেকদূর হেঁটে হোস্টেলে ফিরতে খুব কষ্ট হয়েছিল--- আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

তার পরের বছর ১৯৭৩ সাল। কয়েকজন শিক্ষকমশাইয়ের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে আমি সাব্রুম ছেড়ে আগরতলায় উমাকাণ্ড একাডেমীতে ভর্তি হলাম। এখানেও হোস্টেলে ঠাঁই হল। পশ্চিমবাংলার নক্সাল আন্দোলনের অনুকরণে স্কুল-কলেজে উচ্ছৃঙ্খলতার রেশ এখানেও। বিদ্যালয় ও হোস্টেলে পড়াশুনোর পরিবেশ তখন তেমন ভালো ছিল না। এদিকে টি এস এফ তখন জোরদার হচ্ছিল। হোস্টেলগুলিতে টি এস এফ-এর প্রভাব। আমার মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারা ও ভাবনা থাকলেও ট্রাইবেলদের উপর সুখময় সেনগুপ্ত সরকারের চরম নিপীড়ন, প্রতিনিয়ত অনাহারে মৃত্যুর খবর এবং চারিদিকে মহাজনী শোষণের যাঁতাকলে উপজাতিদের দ্রুত নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা ইত্যাদি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শর্টকার্ট শ্লোগানগুলি আমাকেও আকৃষ্ট করল। একসময় আমি টি এস এফ-র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে গেলাম। দেবব্রত কলই তখন সাধারণ সম্পাদক। এল ১৯৭৪ সাল। সুখময় সেনগুপ্ত সরকার ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা বাতিল ঘোষণা করে অর্ডিন্যান্স

জারী করল। গর্জে উঠল সারা ত্রিপুরা। সি পি আই (এম), উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, সি পি আই, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও টি এস এফ সকলে মিলে চিলড্রেন পার্কের কমিউনিটি হলে যৌথ সভা করে গঠিত হল 'সংগ্রাম কমিটি'। তৈরি হল চার দফা দাবী সনদ। সে বছর আমি হাঃ সেঃ-র ফাইন্যাল দেব। কিন্তু পড়াশুনো ফেলে সংগ্রাম কমিটির ডাকে সংগঠিত আন্দোলনগুলিতে সামিল হতে লাগলাম। আগরতলা সহ রাজ্যের সর্বত্র বিশাল বিশাল মিছিল ও জমায়েত হচ্ছিল। সুখময় সেনগুপ্তের সরকার তখন কম্পমান। কিন্তু তলে তলে এই যৌথ সংগ্রাম কমিটিকে ভেঙে ফেলার চক্রান্ত হল। যব সমিতি প্রশ্ন তুলল এই আন্দোলনে বাঙালীরা থাকলে তারা বেরিয়ে যাবে। এ নিয়ে গণমুক্তি পরিষদের নেতাদের সঙ্গে যুবসমিতির তুমুল বিতর্ক হল। একদিন যৌথ সংগ্রাম কমিটির একটি মিছিলের মধ্যেই মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে কমরেড দশরথ দেবের সঙ্গে কয়েকজন সমিতি নেতার তুমুল বিতর্ক হতে দেখলাম। কমঃ দশরথ দেব তখন বার বার বলছিলেন, ''গণতান্ত্রিক অংশের অনুপজাতিদের সমর্থন ব্যতীত উপজাতীয়দের দাবী আদায় সম্ভব নয়। উগ্রজাত্যভিমানের আবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে এই আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনুপজাতীয় ও উপজাতীয়দের মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হলে এই রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং এর সুযোগ গ্রহণ করবে বুর্জোয়া জমিদারদের দল কংগ্রেস।'' কংগ্রেসের চালে যথারীতি এই যৌথ সংগ্রাম কমিটি ভেঙে গেল। আমি তখনও টি এস এফ-এ রয়ে গেছি। কিন্তু কমরেড দশরথ দেব ও উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সেই কথাগুলি আমার মধ্যে এবং টি এস এফ-এর একাংশের মধ্যে বহু প্রশ্ন গেঁথে দিল। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝিতে সদরের মাধববাড়িতে অনুষ্ঠিত টি এস এফ-এর ৬ষ্ঠ (সম্ভবত) কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যৌথ সংগ্রাম কমিটি ও টি এস এফ-এর যুব সমিতি ও কংগ্রেস দলের লেজুড়বৃত্তির প্রশ্ন নিয়ে জোর বিতর্ক হয়। সেই সম্মেলন থেকে উপরোক্ত প্রশ্ন নিয়ে তৎকালীন সহ-সভাপতি শ্রী করুণামোহন জমাতিয়া ও আমি বয়কট করে বেরিয়ে এসেছিলাম। এভাবে কমরেড দশরথ দেব-এর বলিষ্ঠ বক্তব্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাকে আবার সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

বামপন্থী আন্দোলনে আকর্ষণ থাকলেও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে ছিল না। ইতিমধ্যে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। চার দফা দাবী পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল। মাঝখানে ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা কিছুটা থামিয়ে দিল। তারপর প্রথম এ ডি সি -র নির্বাচন। কমরেড দশরথ দেব নির্বাচনের প্রচারে বিলোনীয়া থেকে শুরু করে গোটা সাব্রুম পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে টানা প্রচার করছেন। গ্রামের লোকজন ভেঙে পড়েছে। তাঁর আবেদন, দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এ ডি সি-কে শক্তিশালী করতে বামফ্রন্টকে বিজয়ী করুন। নতুন ত্রিপুরা গড়তে যুবকরা এগিয়ে আসুন। কংগ্রেস সেই নির্বাচন বয়কট করেছিল। বামফ্রন্ট বিপুলভাবে জিতল। আমি তখন বিলোনীয়ার রাজনগরে ব্যাঙ্কে চাকুরীরত। রাজনগর ব্লকের তৎকালীন বি ডি ও-র স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র কর্মচারী আন্দোলন চলছিল। একসময় তা জনসাধারণেরও সমর্থন আদায় করে গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। অজান্তে আমিও সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে গেলাম। আমার মনের ভেতরে যুবকদের এগিয়ে আসার জন্য কমরেড দশরথ দেবের সেই আহ্বান দুর্নিবারভাবে কাজ করতে শুরু করল। একসময় আমি ব্যাঙ্ক-এর চাকুরীই ছেড়ে দিয়ে সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করার জন্য নেমে পড়লাম। আমার বাবা তখন মনু কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন। আমার

মনের কথা জেনে তিনিও উৎসাহ দেখালেন। ১৯৮২ সনের মাঝামাঝিতে আমবাসার চন্দ্রাইপাড়া স্কুলে উপজাতি যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন। আমি সাব্রুমের প্রতিনিধিদের একজন। কমরেড দশরথ দেব সম্মেলনের প্রধান অতিথি। সম্মেলনের প্রতিটি প্রতিনিধির বক্তব্য তিনি আগাগোড়া মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন আর মাঝে মধ্যেই জবাব দিচ্ছিলেন প্রতিটি প্রশ্নের। যেন তিনিই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক সব কিছু। এত বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো ব্যাখ্যা আমার কাছে যেন জীবনের সব জিজ্ঞাসার জবাব এবং তার সমাধান পাওয়া। তিনি বলেছিলেন, "ত্রিপুরার উন্নয়নের অন্যতম শর্ত জাতি-উপজাতির ঐক্যকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে। এই ঐক্য রক্ষিত না হলে উপজাতিদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ হলেও তাকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যাবে না। বুর্জোয়া ও সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক দলসমূহ এই ঐক্যকে ভাঙ্গার জন্য বিভেদকামী শক্তিকে মদত যোগাবে। তাকে প্রতিহত করতে হবে— যে কোন মূল্যে।" যুবকদের বেশি বেশি করে গণসংগঠন ও পার্টিতে নিয়ে আসার জন্য তিনি জোর দিতেন। তারপর থেকে আস্তে আস্তে আমি পার্টিতে ও গণসংগঠনে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। দশরথ দেব-এর কোন প্রোগ্রাম হলেই যেন দ্বিগুণ উৎসাহ। কিভাবে তিনি বলেন— কোন জটিল বিষয়ের কিভাবে ব্যাখ্যা দেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া আমার কাছে যেন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। তিনি যখন শিক্ষামন্ত্রী ও পরে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, মাঝে মধ্যেই স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁর কাছে আসতাম। প্রথমেই তিনি ধমক দিতেন তারপর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কিছু করার থাকলে তৎক্ষণাৎ অফিসারদের ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিতেন। কথা মত কাজ হয়ে যেত। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই তাঁর প্রশ্ন করা শুরু হত। জি এম পি-র কত সভ্য হয়েছে ? উপজাতি যুব ফেডারেশনের কয়টি ইউনিট আছে ? সমস্যাগুলি নিয়ে কিভাবে আন্দোলন করেছ ? ইত্যাদি। জিজ্ঞেস করতেন— অমুক গ্রামের অমুক কেমন আছেন ? অমুক গ্রামের অমুক পাড়ার ছেলেমেয়েরা কোন্ স্কুলে লেখাপড়া করে ইত্যাদি। আমি সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়ে উঠতে পারতাম না। তখন কমরেড দশরথ দেব বলতেন- "শুধুমাত্র আগরতলায় এসে দরবার করলে হবে না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হবে। জনগণকে নিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আবার শুধুমাত্র জি এম পি ও টি ওয়াই এফ-এর সভ্যপদ সংগ্রহ করলেই হবে না। পাড়ায় পাড়ায় শক্তিশালী ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। যেন সব ব্যাপারেই তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে যে কোন ধরনের বিপর্যয়ই আসুক সংগঠন আবার বিপুল শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে।"

১৯৮৭ সালের শেষ দিক। ত্রিপুরা রাজ্যকে কব্জা করার জন্য সন্তোষমোহন দেবের নেতৃত্বে একদিকে টি এন ভি-র সঙ্গে গোপন আঁতাত করে খুন-সন্ত্রাস শুরু করেছে, অন্যদিকে ঋণমেলার নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কংগ্রেস ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। শিলাছড়িতে একটি জনসভা করে তাঁর সাথে ফিরছিলাম। রাতে উদয়পুর ডাকবাংলোয় অবস্থান। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোইনি। তিনি তাঁর জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা শোনালেন, বললেন, "দেখ সংগঠন করা এখন একটু কঠিন। আগে যোগাযোগের ব্যবস্থা অপ্রতুল হলেও আমরা কষ্ট করে কোন পাড়ায় গিয়ে পাড়ার সর্দারকে বোঝাতে পারলে গোটা পাড়ার লোককে সাথে পেয়ে যেতাম। এখন সে সুযোগ নেই। আমাদের শত্রুরাও এখন অনেক শিক্ষিত হয়েছে। তারা জনগণকে নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে মোহগ্রস্ত করে রাখার ক্ষমতা রাখে। তাই আমাদেরও সেভাবে শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের সংগঠনই

একমাত্র সাচ্চা— একথা বললেই হবে না। যুক্তি দিয়ে প্রতিটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে হবে। পার্টির প্রয়োজনেই শুধু ডাকলে হবে না— মানুষের প্রয়োজনেও পার্টিকে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।"

১৯৯১ সাল। কংগ্রেস-যুব সমিতির নেতৃত্বে সারা রাজ্যব্যাপী ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে। উপজাতিরা সবচাইতে বিপন্ন। শত শত মানুষ বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ। গৃহদাহ, খুন ও ধর্ষণ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শত শত লোক অনাহারে-অর্ধাহারে মারা যাচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসার জন্য কোন সুযোগ নেই। রেশন দোকান থেকে সব কিছু পাচার হয়ে যায় বা সরবরাহ নেই। পঞ্চায়েতের হাতে যৎসামান্য যা কিছুই যায় সব লুটপাট হয়ে যায়। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে জবরদখল করে নেওয়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। তাঁরা ভোগ-বিলাসে চরম মত্ত। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে মিথ্যা মামলা, বঞ্চনা ও নিপীড়ন সমস্ত মাথায় নিয়েও সাধারণ মানুষ পার্টি ও গণসংগঠনসমূহের ডাকে কখনও জেল ভরো, কখনও আইন অমান্য, মিছিল ও মিটিং ইত্যাদি করে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করছেন। জোট জমানা উচ্ছেদের জন্য দিকে দিকে গর্জে উঠছেন। কং-যুব সমিতির জোট এই প্রতিরোধ থেকে নিজেদের বাঁচাতে আবার বিভিন্ন হীন কৌশল গ্রহণ করল— কোথাও উপজাতি ও অনুপজাতির মধ্যে, কোথাও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আবার— কোথাও উপজাতিদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বাঁধানোর অপচেষ্টা। কং-যুব সমিতি জোট কায়দা করে অম্পি, তৈদু ও টাকারজলা এলাকায় কলই ও দেববর্মাদের মধ্যে, জমাতিয়া ও কলইয়ের মধ্যে, জম্পুইয়ে রিয়াং ও লুসাইদের মধ্যে, গন্ডাছড়ায় চাকমা ও ত্রিপুরীদের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। কমরেড দশরথ দেব একদিন গণমুক্তি পরিষদের সভায় প্রস্তাব তুললেন— "উপজাতিদের মধ্যে দলমত ভিন্ন থাকলেও বহুকাল ধরে গড়ে উঠা বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে স্বাভাবিক ঐক্য (Primitive Unity) তা রক্ষা করতে হবে। এই ঐক্য ভেঙে গেলে উপজাতিরা দুর্বল হয়ে যাবে।" তাই তিনি প্রস্তাব দিলেন All In Tribal Unity-র শ্লোগান উত্থাপনের। পার্টিও সেই ডাক দেয়। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ত্রিপুরা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্যও বাদ নেই যেখানে শোষকশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ লাগায়নি। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে রিয়াংরা বিতাড়িত। মণিপুরে কুকি - নাগা লড়াই নিত্যদিনের ঘটনা। আসামে বড়ো ও সাঁওতালদের মধ্যে সশস্ত্র হানাহানি চলছে। চাকমারা অরুণাচল থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। মেঘালয়েও খাসি, গারো ও জয়ন্তীয়ার প্রশ্নে সমস্ত রাজনৈতিক উত্থান-পতন আবর্তিত হয়। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিপুরায়। কমরেড দশরথ দেবের দূরদর্শিতার জন্য তা সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই প্রচেষ্টা বিরামহীনভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে জাতি-উপজাতির এই ঐক্যকে কিছুতেই বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।

১৯৯৩ সাল। ১০ই এপ্রিল কমরেড দশরথ দেব-এর নেতৃত্বে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে আমরা মন্ত্রীরা সবাই যে যার ঘরে মাত্র গিয়ে বসেছি। একটু পরেই ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ঘরে সকল মন্ত্রীদের ডেকেছেন মিটিং হবে। মন্ত্রিসভার প্রথম ইনফরমাল মিটিং। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে দেখি মুখ্যসচিব সহ কয়েকজন পদস্থ আমলা এবং কয়েকজন সাংবাদিক বসে রয়েছেন। তিনি বলেছেন--- এটা এই মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। এই সভার সিদ্ধান্ত হল " This Government shall run on collective decision and by individual initiative."

মন্ত্রীসভা চলবে যৌথ সিদ্ধান্তে এবং কাজ করতে হবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে প্রথম দিকে তিনি মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের ডেকে এনে পর্যালোচনা করতেন। দপ্তরকে আরো ভালো করে কিভাবে জনগণের উপকারে লাগানো যায় একটির সঙ্গে অন্যটির সমন্বয় ঘটানো যায়। মন্ত্রী ও অফিসারদের কথা শুনতেন তারপর পরামর্শ দিতেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তা আর করতে পারেননি। কিন্তু তিনি কোনও ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে না জানিয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতেন না।

১৯৯৩ (?) সালের একটি ঘটনা। বিশালগড়ের বাজার হাইস্কুলের মাঠে একটি ফুটবল খেলা। আমি প্রধান অতিথি। খেলা মাঝপথে চলাকালীন একজন কমরেড এসে কানে কানে বললেন, "বিশ্রামগঞ্জ বাজারে কিছু দুর্বৃত্ত টহলরত পুলিশকে খুন করে রাইফেল কেড়ে নিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র উত্তেজনা। অনুপজাতি দুর্বৃত্তরা পাশের গ্রামের একজন নিরীহ উপজাতি ছাত্রকে পিটিয়ে মেরেছে। এখানেও গোলমাল হতে পারে, আপনি চলে যান।" সন্ত্রাসের কারণে দীর্ঘদিন বিশালগড়ে আমাদের কোন উপস্থিতি নেই। আমারও একটু আশঙ্কা হচ্ছিল। তবুও খেলাটি শেষ করে খুব সংক্ষিপ্তভাবে দু'চার কথা বলে বিশালগড় থেকে সোজা মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে চলে এলাম। আমার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। সম্ভবত তিনি আমার আসার আগেই বিশ্রামগঞ্জ বাজারের ঘটনা এবং বিশালগড়ে আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছেন। তাই আমি কি বলতে চেয়েছিলাম তিনি জানতেন। আমি কিছু না বলতেই ধমক দিয়ে উঠলেন, "লিডারকে এভাবে বিচলিত হলে চলবে না। এভাবে তোমরা নেতৃত্ব দেবে ? আগামীদিন রাজ্য চালাবে ..... ?" এটা ছিল তাঁর শিক্ষা, কোন বিপদেই লিডারকে বিচলিত হলে চলবে না। ঠান্ডা মাথা রাখতে হবে। তাহলেই সঠিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করা সম্ভব।

ত্রিপুরা রাজ্যসহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন জটিল সময়ের মধ্যে অতিক্রম করছে। কমরেড দশরথ দেব ঠিকই বলেছেন— শত্রুরা এখন অধিক শিক্ষিত ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের হাতে জাতপাত সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, এ কে ফরটি সেভেন ও মেশিনগান নানারকম অস্ত্র। শত্রুদের পাশে এখন শুধু দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জমিদাররাই নয়— সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বিরাজমান। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য নিয়োজিত শক্তিকে আরো সবল হতে হবে। শত্রুর মারাত্মক অস্ত্রকে মোকাবিলার জন্য আমাদের অস্ত্রকেও আরো শাণিত করতে হবে। তা হবে কমরেড দশরথ দেবের ভাষায় আরো সুশিক্ষিত, ক্ষিপ্র, মানুষের কথা শোনার জন্য ধৈর্যশীল ও বিপদকে বুঝে নিয়ে মোকাবিলার জন্য মজবুত মানসিকতার অধিকারী সংগঠন ও নেতৃত্ব।

বিগত পাঁচ দশকের অর্থনৈতিক বঞ্চনা, ভুল পরিকল্পনা ও অবহেলার কারণে আজ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্য প্রান্তের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে লাগামহীন অনুপ্রবেশ ও তাদের জন্য কোন পরিকল্পনা না থাকা — অন্যদিকে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লাগাতার ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে রাজ্যের উপজাতীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করে অস্তিত্ব বিপন্ন করে দেয়ার জন্য চেষ্টা হয়েছিল। তার কারণে আজ ত্রিপুরার জনজীবনে বিরাট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্ষত আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে। জমিজমার মালিকানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকুরী-বাকুরী সব দিক থেকে উপজাতিরা দারুণভাবে

পিছিয়ে পড়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষের সহিত উপজাতিদের অস্তিত্ব কিছুটা রক্ষিত হলেও অসম প্রতিযোগিতায় তারা পেছনের সারিতে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা ঘটে। সেই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে উপজাতি কিশোর ও যুবমনকে অতীতের মূল ঘটনা থেকে আড়ালে রেখে- - শুধুমাত্র উগ্র আবেগ সঞ্চারিত করে কিছু শক্তি ভুল পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে অস্বীকার করে একদিকে উপজাতীয়বাদী ও স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার শ্লোগান যখন তোলা হচ্ছে অন্যদিকে অনুপজাতীয় উগ্রজাত্যভিমানীরাও জায়গা করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই অবস্থায় কমরেড দশরথ দেব প্রদর্শিত পথকেই আমাদের আরো প্রশস্ত করতে হবে। তিনি জনশিক্ষা আন্দোলন দিয়ে শুরু করেছিলেন। কুসংস্কার এবং সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। জাতি বা উপজাতির যথার্থ উপকার পারস্পরিক সহযোগিতা বা সমর্থনের উপরই নির্ভর করে তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আজ এই জটিল মুহূর্তে সেই আদর্শ বাণীই আমাদের পাথেয় হউক। ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে-কানাচে বহু স্কুল খুলেছে— উপজাতি এলাকায় তার একটি অংশ চলছে না। সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে আছে— একদিকে সন্ত্রাসের কারণে অন্যদিকে শক্তিশালী সামাজিক অংশগ্রহণের অভাবে। উপজাতিদের জাতিসত্তা বিকাশ ও স্বাধীনতার নামে কিছু শক্তি আজ পেছনদিকেই জোরদার ঠেলে দিতে চাইছে। বলা হচ্ছে উপজাতি ও ত্রিপুরার স্বার্থে উগ্রপন্থা বা উগ্রবাদই পথ। কমরেড দশরথ দেব-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সারাজীবন ধরে যে সংগ্রাম করেছেন তা অনুপ্রাণিত করেছে আমার মত হাজারো যুবককে, বিশেষ করে যারা আজ ভুল পথ অনুসরণ করে সমূহ ক্ষতি করছে। এভাবেই আমরা কমরেড দশরথ দেব-এর প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারব। ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পারবো। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



নিজ বাড়ীতে পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দশরথ দেব

ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট সংগঠনের গোড়ার কথা



প্রাণেশ বিশ্বাস

নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অসহযোগ, লবণ আইন সত্যাগ্রহ, দেশীয় রাজ্য আন্দোলন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের) প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল, বিশেষত সংলগ্ন জেলাগুলির পলাতক বিপ্লবী-কর্মীরা ত্রিপুরায় গোপন আশ্রয়ে থাকতেন, বিখ্যাত যুগান্তর দলের নেতা সনৎ দত্ত (পিতা ছিলেন ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট) ত্রিপুরায় যুগান্তর দলের একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন।

কমরেড দশরথ দেব পিপল্‌স ডেমোক্রেসীর ২৮ জুন ১৯৯৮ সংখ্যায় ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে এই সম্পর্কে কোনো বিশেষ দলিলপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর 'মুক্তি পরিষদের ইতিকথা' পুস্তিকাতে (পৃঃ ৭৮) উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪০ সালের আগে থেকেই ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বলে কমরেড বীরেন দত্তের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সঠিক কোন সময়ে, কোথায় এবং কাদেরকে নিয়ে পার্টি গঠিত হয়েছিল তা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তিনি লিখেছেন বীরেন দত্তকে কমিউনিস্ট বলে তখন অনেকেই জানতেন। তার সঙ্গে দেবপ্রসাদ সেন, কানু সেন ইত্যাদি আরো কয়েকজন ছিলেন। স্বভাবতই তখন তাদেরকে গোপনভাবে কাজকর্ম করতে হয়েছিল বলে বাহ্যত পার্টির প্রভাব জনগণের চোখে পড়ার মত ছিলনা। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৯৪৫ সালে সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ দেব, হেমন্ত দেববর্মার উদ্যোগে ত্রিপুরার জনগণের অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠনের পিছনে প্রথম থেকেই বীরেন দত্তের অনুপ্রেরণা ছিল। কিছুকাল পরেই বোঝা যায় কেবল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে রাজন্য শাসকবর্গের বিরোধিতা ও বঞ্চনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই নেতারা তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন একটা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। প্রথমে বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে দশরথ দেববর্মাকে খবর পাঠিয়ে এনে আলোচনা করে ১৯৪৮ সালের মে মাসে 'ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ' গঠন করেন। প্রথম দিকে জনশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে ত্রিপুরার জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পরে মুক্তি পরিষদের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা এবং জঙ্গী সংগঠনের কাঠামো তৈরি হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে জনশিক্ষা সমিতি এবং মুক্তি পরিষদের অগ্রণী কর্মীরাই পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে

(১৯৫০) কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের উপাদান তৈরি করেন। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে এর আগেও (১৯৪০ সালে) কমরেড বীরেন দত্তের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির (একটি ছোট গ্রুপ হিসাবে) অস্তিত্ব ছিল।

এর একটা পটভূমিকা দেওয়া চলে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক কাজকর্ম করার মত কোনো সংগঠন না থাকলেও পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্ট জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অসহযোগ, লবণ আইন সত্যাগ্রহ, দেশীয় রাজ্য আন্দোলন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের) প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল, বিশেষত সংলগ্ন জেলাগুলির পলাতক বিপ্লবী কর্মীরা ত্রিপুরায় গোপন আশ্রয়ে থাকতেন, বিখ্যাত যুগান্তর দলের নেতা সনৎ দত্ত (পিতা ছিলেন ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট) ত্রিপুরায় যুগান্তর দলের একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। শচীন্দ্রলাল সিংহও বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরিগঙ্গা বসাক, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, দেবপ্রসাদ সেন, কানু সেন, এরাও বীরেন দত্তের সহযোগী ছিলেন। আদি পর্বে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি (বা গ্রুপ) গঠন সম্বন্ধে আমি একটি কাহিনী (কার কাছ থেকে এখন মনে নেই) শুনেছিলাম— ১৯৩৮ সালে (মে ১১-১৪) যখন কুমিল্লায় নিখিল ভারত কৃষক সভার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি সি যোশী কুমিল্লার অধিবেশনে যাবার পথে চাঁদিপুর স্টেশনে পৌঁছলে বীরেন দত্ত এবং কয়েকজন সহকর্মী ট্রেনের একটি কামরায় পি সি যোশীর সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন গড়ার ইচ্ছার কথা জানান। তখন যোশী তাদেরকে পরামর্শ দেন একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ করে পার্টির নীতি অনুযায়ী কাজকর্ম চালাবার জন্য। কিন্তু তখন কেউ আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্টি সদস্য হয়ে কোনো সেল বা গ্রুপ গঠন করেছিলেন কিনা বা কাউকে সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন কি না তা জানা নেই। কিন্তু এটা জানা কথা যে তখন থেকেই (১৯৩৮-৪০) বীরেন দত্তের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্লাব, লাইব্রেরী স্থাপন এবং জনহিতকর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পরবর্তী কালে, জনশিক্ষা সমিতি এবং গণমুক্তি পরিষদের কার্যকলাপে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কতিপয় হলেও কমিউনিস্ট কর্মীরা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বীরেন দত্ত গণমুক্তি পরিষদের মুখ্য পরামর্শদাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এজন্য তাকেই গণমুক্তি পরিষদের ইস্তাহার প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাকিস্তানে (খুব সম্ভবত হবিগঞ্জে) গিয়ে এই ইস্তাহার ছাপাবার ব্যবস্থা করে ফিরে আসার পর বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার হন। তেজপুর স্পেশাল জেলে রাজনৈতিক বন্দী অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির জঙ্গীলাইন গৃহীত হবার পর এবং তেলেঙ্গানা, মৈমনসিংহের হাজং এলাকায় এবং সুরমা উপত্যকার সশস্ত্র আকারের কৃষক সংগ্রামের (অনেকটা অতিরঞ্জিত হয়ে) খবর ত্রিপুরাতেও ছড়িয়ে গেলে কয়েকজন কর্মীর মধ্যে ত্রিপুরাতেও একই ধরনের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কৃষকের শ্রেণীসংগঠন এবং কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রেরণা জেগে ওঠে। ইতিমধ্যেই (৯ অক্টোবর ১৯৪৮) গোলাঘাঁটিতে মহাজনের (হরি সাহা) চক্রান্তে ধানের দাবীতে জমায়েত হওয়া কৃষকদের উপর পুলিশের গুলি চালনায় সাতজন কৃষক নিহত এবং আরো অনেকে আহত হওয়ার ঘটনায় ত্রিপুরার সর্বত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রস্তুতি (গেরিলা বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে) আরম্ভ হয়। গোলাঘাঁটি অঞ্চলটা অঘোর দেববর্মার নেতৃত্বাধীন ছিল। তিনি ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে মুক্তি পরিষদকে কমিউনিস্ট

পার্টিতে পরিণত করার জন্য প্রস্তাব দেন, কিন্তু তখন দশরথ দেববর্মা তাতে অসম্মত হন এই বলে যে এখনও মুক্তি পরিষদের কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করার সময় আসেনি। তাঁর অভিমত ছিল শ্রেণীসংগঠন হিসাবে কৃষকসভা গঠন করাও সঠিক নয়, কারণ ত্রিপুরার ভূমিব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মত নয়। বড় ধরনের ভূম্যধিকারী এখানে নেই— এই নিয়ে মতপার্থক্য হওয়ায় দশরথ দেবের সঙ্গে অঘোর দেববর্মার বিতর্ক দেখা দেয়। অবশেষে মুক্তি পরিষদের সম্পাদক হিসাবে অঘোর দেববর্মা পদত্যাগ করেন, উল্লেখ করা যায় মুক্তি পরিষদ সকল শ্রেণীর ত্রিপুরী জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন ছিল। তাই সন্দেহ ছিল কৃষক সভা গঠন করে মুক্তি পরিষদে বিভেদ দেখা দেবে। ঘটনা হলো, দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তি পরিষদের সংগ্রাম আর ত্রিপুরার মহারাজার ক্ষুদ্র পুলিশ-মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষে আবদ্ধ থাকল না, স্বাধীন ভারতের প্রভূত শক্তিশালী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। দশরথ দেব সহ মুক্তি পরিষদের অগ্রণী কর্মীরা উপলব্ধি করলেন সর্বভারতীয় সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে ত্রিপুরায় বিভিন্নভাবে একক শক্তিতে মুক্তি পরিষদ আর অগ্রসর হতে পারবে না। তাই এক বৎসরের মধ্যে (১৯৫০) ত্রিপুরায় আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দশরথ দেব সহ মুক্তি পরিষদের কর্মীরা উপলব্ধি করেন। অঘোর দেববর্মা এবং বীরেন দত্ত তখন জেলে বন্দী। শ্রীহট্ট জেলার পার্টি-কর্মীরা প্রায়শই পাশ্ববর্তী অঞ্চলে যাওয়া-আসা করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের কথা জানাজানি হয়েছিল এবং শ্রীহট্ট জেলার পার্টি কমিটি সম্ভবত পলিটব্যুরোকে এই বিষয়ে অবহিত করেছিলেন।

আমি জেল থেকে ১৯৫০ সালে মুক্তি পাওয়ায় পার্টির আসাম প্রাদেশিক কমিটির কেন্দ্রীয় দায়িত্বে থাকাকালীন পলিটব্যুরোর আহ্বানে (কলকাতার গোপন কেন্দ্রে) কলকাতায় এসেছিলাম। তখন আমাকে ত্রিপুরায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যেতে বলা হয়। কমরেড রণদিভের পর কমরেড রাজেশ্বর রাও তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং আসামের কমরেড বীরেশ মিশ্র পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য। আমাকে একজন ক্যুরিয়ারের সঙ্গে ত্রিপুরায় আসতে হয় এবং পর পর তিন জায়গায় মুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থিত হয়ে কর্মীদের রিপোর্টগুলি এবং তখন পার্টির গৃহীত নীতি (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্স ডেমোক্রেসী - ১৯৫০, ২৯ সংখ্যা) প্রকাশিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করি এবং পার্টি সংবিধান এবং নীতি-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বক্তব্য রাখি। দশরথ দেববর্মা এই সভাস্থানগুলিতে সকলের সামনে থেকে পিঠে বন্দুক নিয়ে পরিচালনা করেছিলেন। পর পর স্থান পরিবর্তনের কারণ ছিল নিকটেই মিলিটারী টহলদারবাহিনীর আগমন। এই সভায় একদিকে যেমন সরকারী পুলিশ মিলিটারীর অত্যাচারের কাহিনী (পদ্মবিলের ঘটনা মার্চ ১৯৪৮) বর্ণনা করা হয়েছিল, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যেও, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে, পুলিশ-মিলিটারী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মহাজন মজুতদারদের বিরুদ্ধে এবং কোনো কোনো জায়গায় সাধারণ বাঙালীদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং আক্রমণ সংগঠিত হওয়ার ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া যায়। অবশ্য দশরথ দেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিপথগামী কার্যকলাপ কঠোরভাবে দমন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মুক্তি পরিষদের কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে সম্মত হন এবং একটি জিলা সংগঠন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন— কাছাড়ের পুরানো পার্টি সদস্য রাখাল রাজকুমার। সে সময়, আর কেউ এর আগে পার্টি

সদস্য ছিলেন না। আমাকে হাতে লেখা ফর্মে সই নিয়ে সদস্যভুক্তির কাজ করতে হয়। দেশ বিভাগের পর অগণিত উদ্বাস্তু আগমন ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে এবং চাষের জমির উপর অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। মহাজনী শোষণের মাধ্যমে ত্রিপুরার কৃষকের জমি হাতছাড়া হতে থাকে, সংরক্ষিত সরকারী জমিও বেদখল হতে থাকে। এই অবস্থায় ত্রিপুরী উপজাতি এবং বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করা খুবই কঠিন ছিল। কংগ্রেস ত্রিপুরী জনসাধারণের জাগ্রত চেতনা এবং সংগ্রামী ভূমিকাকে কোনো মর্যাদাই দিতে চায়নি। তারা বাঙালী বিশেষত উদ্বাস্তুদের স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। প্রথমদিকে স্বভাবত পার্টির ভিত্তি ছিল উপজাতি জনসাধারণ। পরে উপজাতি-অ-উপজাতি সকলশ্রেণীর জনগণের মধ্যেই পার্টির প্রভাব প্রসারিত হয়। এটা প্রমাণ হয় দুই বছরের মধ্যেই ত্রিপুরার দুটি লোকসভার আসনেই কমিউনিস্ট প্রার্থী দশরথ দেব (গোপন অবস্থায় থাকার সময়েই) এবং বীরেন দত্তের নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনকে আদর্শগত ভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর অবদান অসীম। অন্যদিকে জীবনের অভিজ্ঞতায় গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে দশরথ দেব এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের নেতৃত্বের ভূমিকায় উন্নীত হন। তবে সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা এবং বিশেষ করে বীরেন দত্তে-র ভূমিকাও উজ্জ্বল। ●

[পূর্বাভাস - দশরথ দেব স্মরণ সংখ্যা]



মণিপুরীদের চিরাচরিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব

প্রবাদ প্রতিম দশরথ দেব



ব্রজগোপাল রায়

"...... যাদের হাতিয়ার করে তাঁর সংগ্রাম অগ্রসর হবে সেই মানুষদের জাগাতে না পারলে সব শ্রমই হবে পণ্ড শ্রম — এ কথাটা দশরথ দেব ভালই বুঝে ছিলেন। এ কারণেই তিনি শুরু করেন জনশিক্ষা আন্দোলন। ...."

যে সময়ে কমঃ দশরথ দেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়কার ত্রিপুরা রাজ্য ছিল রাজন্য শাসিত একটি ছোট রাজ্য। ভারত ছিল পরাধীন। অবশিষ্ট ভারত যখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, আন্দোলন করছে, অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জরিত হচ্ছে তখন ত্রিপুরায় চলছে রাজতন্ত্র। এ রাজ্যের রাজারা ছিলেন উপজাতি অংশের মানুষ। কিন্তু তারা উপজাতির সংস্কৃতির বিকাশের জন্য, তাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার ঘটাবার জন্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নেন নি। তখন ত্রিপুরার কৃষি ছিল সম্পূর্ণ জুম-নির্ভর। এ রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক তথা গরীব অংশের মানুষের দিকে রাজারা তেমনিভাবে নজর দেননি বলে অনেকের অভিযোগ। অথচ এই দরিদ্র প্রজাদের অর্থেই রাজপ্রাসাদ তৈরি, রাজাদের ভোগ-বিলাস, আমোদ-উৎসব। রাজারা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যতটা মনোযোগী হয়েছেন উপজাতি অংশের মানুষের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য ততটা মনোযোগ দেননি। সুতরাং উপজাতি অংশের মানুষ, যারা গ্রাম-পাহাড়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতেন, তাদের মনে কিছু কিছু অভিমান পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

১৯১৬ সালে খোয়াই- এর প্রত্যন্ত গ্রামে এক সাধারণ দরিদ্র উপজাতি পরিবারে দশরথ দেব এর জন্ম। এ শিশুটির চলায়-বলায়, লেখাপড়ায় এবং খেলাধূলায় একটা অভিনবত্ব ছিল যা সাধারণ উপজাতি সমাজে তখন প্রায় দেখা যেত না। লেখাপড়ার প্রয়োজনেই দশরথ দেবকে গ্রাম ছেড়ে আসতে হয়েছে আগরতলা শহরে। এটি রাজধানী। যা এতদিন গল্পের মত বড়দের মুখে শুনেছেন তা এখন নিজের চোখে দেখবার সুযোগ পেলেন তিনি। তিনি দেখলেন রাজাদের বিলাস-ব্যসন এবং সাধারণ উপজাতি সমাজের প্রতি তাদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার স্বরূপ। দশরথ দেবের কিশোর মনের উপর এ সবের প্রতিক্রিয়া ঘটত। এরপর কলেজে পড়তে তিনি হবিগঞ্জে যান। সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া লাগে তার গায়ে। বি এ পাশ করে এম এ এবং আইন পড়তে তিনি চলে যান কলকাতায়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠভূমি

কলকাতা যুবক দশরথ দেবের মনকে নাড়া দেয়। রাজনীতি যেন এই যুবককে অনির্বার ইঙ্গিতে হাতছানি দিচ্ছিল। একসময় লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে তিনি রাজ্যে চলে আসেন এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকেন। এরই মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দশরথ দেবের নেতৃত্বে গ্রামের গরীব কৃষকরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে। গ্রামে-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে দশরথ দেব ঐ সব জীবন্মৃত মানুষগুলোকে বোঝাবার চেষ্টা করেন তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী রাজাদের শোষণ এবং অবজ্ঞা। শুরু হয়ে যায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলা। পথপ্রদর্শক স্বয়ং দশরথ দেব। খাজনা দেয়া বন্ধ করা, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন এসব দিয়ে দশরথ দেবের নেতৃত্বের হাতে খড়ি। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি পাহাড়ী পল্লী ছিল তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। সেখানকার মানুষগুলোর দুঃখ-বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস তাঁকে স্পর্শ করত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে সবার মুখে হাসি ফোটাবার স্বপ্নে তিনি ডুবে থাকতেন।

যাদের হাতিয়ার করে তাঁর সংগ্রাম অগ্রসর হবে সেই মানুষদের জাগাতে না পারলে সব শ্রমই হবে পণ্ডশ্রম — এ কথাটা দশরথ দেব ভালই বুঝেছিলেন। এ কারণেই তিনি শুরু করেন জনশিক্ষা আন্দোলন। আগে চাই চেতনার বিকাশ, না হলে সব আন্দোলন ব্যর্থ হবে। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাপনায়। প্রায় চারশ পঞ্চাশটি বিদ্যালয় তারা প্রতিষ্ঠা করেন। উপজাতিদের মাতৃভাষা ককবরকের বিকাশ চাই, ককবরক সাহিত্য চাই, মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চাই। দশরথ দেব যুক্তি দিয়ে বুঝলেন ইংরেজী ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গেই উপজাতি অংশের মানুষের যোগটা বেশি। সুতরাং ককবরক ভাষার হরফটা বাংলায়ই হওয়া দরকার। তিনি এ বিষয়ে গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন ভাষা তাত্ত্বিক আলোচনাও করেছেন। জনশিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে তদানীন্তন সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল, জনশিক্ষা পরিষদ রাজরোষে পড়ল— নেতা দশরথ দেব আত্মগোপন করলেন। এ অবস্থাতেই গড়ে উঠল গণমুক্তি পরিষদ। রাজতন্ত্র বিদায় নিয়েছে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে। আঞ্চলিক পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, চীফ কমিশনারী শাসন ইত্যাদি পথ বেয়ে ত্রিপুরায় প্রযুক্ত হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা— ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্য বলে ঘোষণা করা হল। এই রূপান্তরের প্রতিটি ধাপে বামপন্থী আন্দোলন রয়েছে এবং এ সব আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে দশরথ দেব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে দশরথ বাবু সি পি আই-তে যোগ দেন এবং এর পরের বছরই তিনি সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। চীফ কমিশনার নানজাপ্পার আমলে কমিউনিস্ট দমনের নামে ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল তা মানুষের ধৈর্যের সমস্ত বাধাকে ভেঙে দিয়েছিল। দশরথবাবুরা তখন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হন। তাঁর সে সব দিনের গল্প শুনেছি বৃদ্ধদের মুখে। সে সব গল্প শুনতাম আর মনে হত যেন রূপকথার গল্প শুনছি। পাহাড়কে পাহাড় পুলিশ-মিলিটারী দিয়ে ঘেরাও করেও দশরথ দেবকে পাওয়া যায়না। আবার প্রয়োজনে পলাতক অবস্থাতেই তিনি জনসভা করেন, সংগঠনের কাজ করেন। ১৯৫২ সালে আত্মগোপন অবস্থাতেই দশরথ দেব লোকসভার নির্বাচনে অংশ নেন এবং ত্রিপুরা পূর্ব আসন থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এ অবস্থায় পার্লামেন্টে পৌঁছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায় যখন হাজার-হাজার উদ্বাস্তু এসে বনে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে ঘুরছিলেন একটু আশ্রয়ের আশায় তখন তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে, তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সাহায্য চেয়ে বামপন্থীরা যে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন দশরথবাবু সে আন্দোলনেরও অন্যতম নেতা। কোন কোন সময় স্বার্থ-দুষ্টমহল তাঁকে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলে অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। দিল্লীর পার্লামেন্টে বীরেন দত্ত এবং দশরথ দেব এই দু-জন এম পি জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের জন্য যে সংগ্রাম করেছেন তারপরও যদি কেউ এসব অপবাদ দেবার সাহস দেখান তা হলে বুঝতে হবে তারা অপবাদ দেবার জন্য অপবাদ দেন। দশরথবাবু ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য কত কথা বলেছেন পার্লামেন্টে তার রেকর্ড তো বিদ্যমান।

যাই হোক সশস্ত্র আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার মধ্যেও দশরথ দেবের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার কাজেই তিনি পরবর্তী কালে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

তিনি ১৯৭৭-এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে ত্রিপুরার বিধানসভায় আসনে এবং নৃপেন চক্রবর্তীর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় এই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ত্রিপুরায় শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮০-র জুনের দাঙ্গায় জাতি-উপজাতির মিলনের ক্ষেত্রে দশরথ দেবের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কঠোর পরিশ্রম করে প্রতিটি পাহাড়ী অঞ্চলে সভা করে তিনি দাঙ্গার কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। অ-উপজাতি অংশের মানুষকেও বুঝিয়েছেন। সে তো আমাদের চোখের দেখা ঘটনা। দাঙ্গাবাজ এবং তাদের মদত দাতারা সেদিনও দশরথ দেবের চরিত্র হননের নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমরা দেখেছি দশরথ দেবের ভূমিকা। নানা দিক থেকে অনগ্রসর ত্রিপুরাকে সামনের সারিতে নিয়ে আসবার জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম করেছেন। মাঠের আন্দোলনকে প্রশাসনে নিয়ে এসে সমস্যা সমাধানের চিন্তা তিনি করেছেন। তাতে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরাই উপকৃত হয়েছে এবং তাঁকে জাতি-উপজাতি এ উভয় অংশের নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজকের উপজাতি সমাজ কি ভাবতে পারেন দশরথ দেব তাদের কোথা থেকে কোথায় টেনে তুলেছেন।

টি টি এ এ ডি সি গঠনের সংগ্রামে আমরা দেখেছি তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় মনোভাব। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার মধ্যে যে দূরদর্শিতা রয়েছে তার অনেকটাই দশরথ দেবের। আজ এই জেলা পরিষদের দিকে গোটা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে। উপজাতি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। এভাবে জাতি-উপজাতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষিত - বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামকে সংহত করছিলেন বলেই ঘোলাজলে মাছ শিকারীরা তাকে অপবাদ দিয়েছিল, বামফ্রন্ট এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাচ্ছিল এবং ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছিল। দশরথ দেব ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী হলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে উঠেছিল। মানুষ ভেবেছিল এতদিনে বৈরি সমস্যার সুসমাধান হবে, আবার ত্রিপুরা জাতি-উপজাতির মিলনের মধ্য দিয়ে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে, ত্রিপুরা হয়ে উঠবে শান্তি-সম্প্রীতি ও প্রগতির পীঠভূমি।

দশরথ বাবু উগ্রপন্থীদের আহ্বান করেছিলেন অস্ত্রের পথে নয় গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসতে।

সে জন্য পরিকল্পনাও করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অসুস্থতা এসে তার কর্মক্ষমতাকে গ্রাস করল। চির সংগ্রামী মানুষটি রোগশোকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে পারলেন না- - তাই তার আরদ্ধ কর্ম সমাপ্তও করতে পারলেন না। তাঁর যারা অনুগামী, প্রিয় সাথী তাদের কাজ তাঁর প্রদর্শিত পথে গরীব-মেহনতি পিছিয়েপড়া মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দশরথবাবু সুদীর্ঘকাল পর্বে যে সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে এই সহজ সরল সদাহাস্যময় মানুষটি বারবার যে দরদী হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দেখিয়েছেন তাতে আমরা অবাক হই। তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসে বার বারই মনে হয়েছে তিনি যথার্থই এক প্রব'দপ্রতিম পুরুষ। আজ তিনি সমস্ত নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন— তবু আগামী দিনে তাঁর কাজের যখন মূল্যায়ন হবে তখন সবাই উপলব্ধি করতে পারবেন এই সংগ্রামী ব্যক্তিত্বটি জীবনভর যে সংগ্রাম করেছেন তা কাদের জন্যে।

●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



দুই নাতিকে কোলে নিয়ে দশরথ দেব

কমরেড দশরথ দেবের মহত্ত্ব



মতিলাল সরকার

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সর্ববাদী নেতা হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর সংগ্রাম উপজাতিদের অনগ্রসরতা দূর করে আত্মবিকাশের পথ সুগম করার জন্য নিবদ্ধ থাকলেও তিনি মুহূর্তের জন্যও জাতি উপজাতির ঐক্য গঠনের সঙ্কল্প থেকে এতটুক বিচ্যুত হননি।

ভূমিকা ঃ তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। এতদিন আগেকার কথা তেমন মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, দু'টো কারণে আমরা সর্বদা আতঙ্কিত থাকতাম। একটা হল, সীমান্তের ওপারে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন কাহিনী। আত্মীয়-স্বজনরা প্রায়ই দাঙ্গার আশংকায় আমাদের এদিকে বিভিন্ন বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিতেন, আবার সাহস করে চলে যেতেন। কাজেই আমাদের এ পারের লোকজন সব সময় দাঙ্গাজনিত আক্রমণের আশঙ্কা করতেন। কারণ, আমাদের গ্রামটি ভারতের ভিতরে সীমান্তের সন্নিকটে। আতঙ্কের আর একটি কারণ হল, শাসককুলের ধরপাকড়ের ভয়। যেহেতু ঈশানচন্দ্রনগর এলাকার লোকজন রাজ্যের প্রাচীন আদিবাসী, রাজতন্ত্রে অত্যাচার এবং পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস শাসনের পুলিশী নির্যাতনের টুকরো টুকরো খবর আমাদের কানে ভাসত। কিন্তু যখন দশরথ দেববর্মা (এটা জনপ্রিয় পরিচিতি)-র সরকার বিরোধী বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা আলোচনা হত, তখন আমরা আশ্বস্ত হতাম। এমন একটি দ্বিধাগ্রস্ততার পরিবেশে আমাদের মানসিক গঠন হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বীরেন দত্ত ও দশরথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বড় হতে থাকি। আমাদের কিশোর বয়সেই দশরথ দেব হয়ে পড়েন কল্পলোকের একজন বিরাট কিংবদন্তি পুরুষ। পরবর্তী সময়ে যখন তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তখন বাস্তব দশরথ দেব আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

সংগঠন ক্ষমতা

পাহাড় এলাকার এক দরিদ্র জুমিয়া কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়েছেন বলেই দশরথবাবু ত্রিপুরার মাটির পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। দেশের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তুলনায় দশরথদা-র এটা একটা স্বাতন্ত্র্য। অবহেলিত, অনুন্নত নিরক্ষর উপজাতি জনগণের অধোগামিতা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলত। তাই স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশুনো শেষ না করেই জনগণের ডাকে সংগ্রামে তিনি নেমে পড়েন। একটা ভাল চাকুরী নিয়ে কত

না সুখে জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু এটাকে তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি সংগ্রামে নেমে পড়েন। আত্মগোপনে কাটালেন বছরের পর বছর। বনে-জঙ্গলে ঢেলে দিলেন জীবনের যৌবনটা কেন ?

তার মূল কারণ ছিল উপজাতি জনগণের অনগ্রসরতা। এই অনগ্রসরতা তাঁকে পীড়া দিত। তিনি বুঝতেন— শাসকশ্রেণীকে সজোরে উচ্ছেদের মধ্যেই রয়ে গেছে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত জনগণের মুক্তির চাবিকাঠি। দুঃস্থ মানুষের এই মুক্তির নেশাই তাঁর কাছে সব ঝড়-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করার শক্তি দিয়েছে।

তিনি সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা হচ্ছে একটা জাতিগোষ্ঠীর উত্তরণের প্রাথমিক শর্ত। শিক্ষা চেতনা আনে, কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করে। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। কমরেড দশরথ দেব, কমরেড হেমন্ত দেববর্মা, কমরেড সুধন্বা দেববর্মা প্রমুখ একত্রে বসে গড়ে তুললেন 'জনশিক্ষা সমিতি'। এখানে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার বিরাট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যুব সমাজকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাই শত শত যুবককে তিনি শিক্ষাবিস্তারের এই কাজে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে টেনে আনতে পেরেছিলেন। এটা নীতি ও আদর্শগতভাবে একটা খুবই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়। এ কাজে দশরথ দেব অগ্রণী ভূমিকা নেন। জনশিক্ষা সমিতি, প্রজামণ্ডল এবং গণমুক্তি পরিষদ গঠন করে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ভাবে মুক্ত হবার চেতনাকে নিয়ে যান লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে। দশরথ দেব জনশিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি এবং গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি হন।

নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল জনশিক্ষা সমিতির সঙ্কল্প। যুবকদেরকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। জনসাধারণ নিজ খরচে স্কুলগৃহ নির্মাণ করেন এবং শিক্ষার আনুষঙ্গিক সামগ্রীর যোগান দেন। দেখতে দেখতে তিন শতাধিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। পরে রাজার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেব স্কুলগুলির অধিকাংশই সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করেন। এই জনজাগরণকে ভাল চোখে না দেখে মহারাজ তার পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টাও করেন। মহারাজার এই বিরূপতাই জনশিক্ষা সমিতির সংগঠকদের ঠেলে দেয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার দিকে। এই পটভূমিতে তৈরি হয় ১৯৪৮ সালে গণমুক্তি পরিষদ। আত্মগোপনে থেকে একটা সংগঠনকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, কমরেড দশরথ দেব এটা শিখিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে আত্মগোপনে থেকেই মিছিলের কর্মসূচী কার্যকরী করা হয়। কর্মসূচীর শ্লোগানগুলি লক্ষণীয়ঃ প্রজার ভোটে সরকার চাই, দেওয়ানী শাসন বাতিল কর, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ইত্যাদি।

শ্রেণীচেতনা ছাড়া সংগঠন শক্তিশালী করা যায় না। দশরথবাবু গণমুক্তি পরিষদের সংগঠনের পথে এই চেতনা ... তে পেরেছিলেন। এই চেতনার ফলেই পুলিশের জাল ভেদ করে কর্মীরা রাজ্যের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংগঠনের বার্তা নিয়ে যেতে পারতেন। খোয়াই পদ্মবিলের ঘটনায় এবং সদর দক্ষিণে গোলাঘাটির ভক্তঠাকুর পাড়ার ঘটনায় পুলিশের জুলুমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণমুক্তি পরিষদ জনগণকে যেভাবে প্রতিবাদে সামিল করতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠতা। পরিষদের প্রেসিডেন্ট দশরথ দেব তখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও সংগ্রাম তাঁকে অভিজ্ঞতার আলোকে সে দিকেই যেতে সাহায্য করেছে।

মহারাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর রাজ্যে শাসনভার চলে যায় রিজেন্সী কাউন্সিলের হাতে। এই রিজেন্সী কাউন্সিল পরিচালিত হতো কেন্দ্রীয়

সরকারের নিযুক্ত একজন আই এ এস অফিসার দ্বারা। রিজেন্সী কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস শাসনের খবরদারির একটা উপায় মাত্র। এই শাসনে পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। গ্রেপ্তার কর'. পুলিশী নির্যাতন করা, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ দশরথ দেবের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গঠনের দিকে যায়। সেই সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী. শুনলে রোমহর্ষণ অনুভূত হয়। কর্মীদের সচেতন করা এবং বলিষ্ঠভাবে একতাবদ্ধ হয়ে অত্যাচার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছিল কমরেড দশরথ দেবের সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং সংগঠন করার ক্ষমতার দরুন। তাঁর সাংগঠনিক দৃঢ়তার বলেই গণমুক্তি পরিষদের গোটা নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। যোগদানের ঠিক পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসে দশরথ দেব কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এটা তাঁর গণ আন্দোলন এবং গণ ভিত্তির স্বীকৃতি। এই জনপ্রিয়তার জন্য আত্মগোপনে থেকেও বিরাট ব্যবধানের ভোটে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

সম্প্রীতির প্রতীক

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সর্ববাদী নেতা হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর সংগ্রাম উপজাতিদের অনগ্রসরতা দূর করে আত্মবিকাশের পথ সুগম করার জন্য নিবদ্ধ থাকলেও তিনি মুহূর্তের জন্যও জাতি উপজাতির ঐক্য গঠনের সঙ্কল্প থেকে এতটুক বিচ্যুত হননি। তাঁর প্রথম প্রমাণ এই যে, উপজাতিদের উপর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিন্তায় সমৃদ্ধ দশরথ দেব অন্য যে কোন বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোও কর্তব্য বলে মনে করেন। তাই দেখি, যখন পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনতা কাতারে কাতারে ত্রিপুরায় উঠতে লাগল, তখন দশরথ দেব তাঁদের পাশে সাহায্য নিয়ে দাঁড়ালেন। তা না করে সেদিন যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দশরথবাবু সীমান্তে বাধা দিয়ে দাঁড়াতেন, তাহলে রাজ্যের চিত্রই আজ ভিন্নরূপ হত। *পক্ষান্তরে, তিনি এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত গণমুক্তি পরিষদ বিপন্ন ও ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বুকে টেনে নিল। সাংসদ দশরথ দেব ও বীরেন দত্ত একদিকে দাবী তুলেন উপজাতিদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য, অপরদিকে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতেও পার্লামেন্ট তোলপাড় করেন।*

রিজেন্সী কাউন্সিলকে পরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে দেওয়ান নিয়োগ করেন তাঁরা ছিলেন দু'জন বাঙালী। গোলাঘাটিতে গুলির ঘটনায় নিহত ৮ জনের মধ্যে ৭ জনই ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং যে পুলিশের গুলিতে তাঁরা নিহত হলেন যে পুলিশ ছিল বাঙালী। ফলে উপজাতি জনগণের মধ্যে দ্রুত একটা ধারণার সঞ্চার হয় যে রাজ্যের উপজাতি রাজাদের শাসন শেষ হয়ে অ-উপজাতি (বাঙালী) শাসনের অধ্যায় শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় উগ্র জাতীয়তাবাদী উপজাতি জনগণকে ভাবাবেগে উত্তেজিত করে তুলবে, তা স্বাভাবিক। দশরথ দেব বলিষ্ঠভাবে এই বিভেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং ঐক্য রক্ষায় সংশ্লিষ্ট জনগণকে সামিল করেছেন। সেই পরিস্থিতিতে দশরথ বাবুর পক্ষেই বোধহয় এ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। আমরা এখানে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বলিষ্ঠ চেতনা ও উদ্যোগের পরিচয় পাই।

রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি এবং উপজাতি যুব সমিতি ও টি এন ভি দলের দাবী হল— ককবরকের হরফ রোমান হরফ করতে হবে। কিন্তু দশরথ দেবের নেতৃত্বাধীন গণমুক্তি পরিষদ যুক্তিসহ দাবী করেছে যে, বাংলাই হবে ককবরক ভাষার হরফ। তাঁর এই দাবীর পিছনে একদিকে যেমন ত্রিপুরার উপজাতিদের বাংলা ভাষার প্রতি শত শত বছরের সংযোগের স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনি এই দুটি জাতিগোষ্ঠীর সম্প্রীতির প্রশ্নটিও সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর এই

চেতনা ত্রিপুরাবাসীকে সামনের দিকে যেতে আলো দেখাবে।

যেখানে উপজাতি যুব সমিতি, টি এন ভি-দের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে --- উপজাতিরাই শুধু উপজাতিদের জন্য, সেখানে কমরেড দশরথ দেব দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন সংখ্যাগুরু অনুপজাতিদের সাহায্য সহানুভূতি ছাড়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। তাঁর বিধানসভা ভাষণে এমন অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯১ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে এক স্বল্পকালীন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছিলেন, ''..... শুধু ট্রাইবেলরা ইউনাইটেড হলেই প্রটেক্টেড হবে না। এই জন্য বলছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগণের গণতান্ত্রিক প্রটেকশন ছাড়া ট্রাইবেলদের কোন ইন্টারেস্ট একা ট্রাইবেলরা রক্ষা করতে পারবে না।'' এরকম ভূরি ভূরি বক্তব্য তাঁর রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন পাহাড়ী এবং বাঙালী এই দুটি জাতিগোষ্ঠীর মিলনের সেতু।

আসুন, তাঁর ঐক্য প্রয়াসকে আরো শক্তিশালী করি। আজ সাম্প্রদায়িক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতে রাজ্যে যেভাবে রক্তের হোলি খেলায় মেতেছে, তা কমরেড দশরথ দেব এর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ সকল অপচেষ্টা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্যেই আমরা কমরেড দশরথ দেবকে অনুভব করব। সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কমরেড দশরথ দেব লাল সেলাম। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২২-১০-৯৮]



নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সস্ত্রীক দশরথ দেব

এক অনন্য নেতা

সুনীল দাশগুপ্ত



“........ যে সমাজে ঢেউ দূরে থাক বুদ্‌বুদের সাক্ষাৎও মিলত না সেখানে ঝড় উঠে সামন্ত শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলল। আতঙ্কিত শাসকেরা আশ্রয় নিলেন দমনপীড়নের। দমনপীড়নের মোকাবিলায় গড়ে উঠল প্রতিরোধ। কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও সশস্ত্র।”

কমরেড দশরথ দেব, আমাদের দশরথদা, চলে গেলেন। বরং বলা ভাল, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাঁকে চলে যেতে হল। কমরেড দশরথ দেব-এর শেষ যাত্রার সঙ্গী হয়ে তাঁর জন্মস্থান আমপুরার শ্মশান ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে শেষ বিদায় দিতে আসা অগণিত মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ মূক মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন শুনতে পেলাম কবিগুরুর ভাষায় সবচেয়ে পুরাতন কথা, ‘সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন .....’। মনে মনে আবৃত্তি করলাম— ‘তৃণ ক্ষুদ্র অতি, তারেও বক্ষে ধরি মাতা বসুমতী কহিতেছে প্রাণপণে যেতে নাহি দিব ...... তবু যেতে দিতে হয়, হায় তবু চলে যায়।’

মনে পড়ে গেল অজ্ঞাত অখ্যাত এক গ্রাম এই আমপুরাতে এবং তার চেয়েও অজ্ঞাত অখ্যাত দারিদ্র্য-পীড়িত কোন এক গৃহে বিরাশী বছর আগে যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল পিতামাতা তার নাম রেখেছিলেন দশরথ। কি ভেবে রেখেছিলেন জানিনা। কিন্তু তার শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে গরীব ঘরের আর দশটা ছেলের মত। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যে শিশু শিক্ষার আলো পায়নি কাজেই তাঁর যৌবনটাও হয়ত কেটে যেতো গরীব ঘরের অন্য দশটা ছেলের মত। চৌদ্দ বছর বয়সে সেই ছেলে আকস্মিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। মেধার জোরে সসম্মানে পাশও করে গেল একের পর এক পরীক্ষা।

শিক্ষার আলোকে সেই ছেলে জানল নিজেকে, জানল তার সমাজকে, পৃথিবীকে দেখল এক নতুন দৃষ্টিতে। কিন্তু তার জন্যে আরও বড় কাজ অপেক্ষা করে আছে। তাই তাকে আরও জানতে হবে, জানার ক্ষুধা তার বেড়েই চলল। সেই জানার ক্ষুধাই তাঁকে মার্ক্সবাদের সংস্পর্শে নিয়ে এল। মার্ক্সবাদ তাঁকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল। বিশ্বাসী করে তুলল কমিউনিস্ট আদর্শে। মার্ক্সবাদ পড়েই তিনি জানলেন— সমাজকে জানা বা বোঝাই সব নয় সমাজকে বদল করাই আসল কথা।

কিন্তু কোথা থেকে তিনি কাজ শুরু করবেন ?

কোন সমাজকে বদলাবেন ? যে সমাজে তাঁর জন্ম সেই সমাজে বাসা বেঁধে আছে অজ্ঞানতার স্তূপীকৃত অন্ধকার। সেখানকার সামাজিক চেতনা, অন্ধ কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার নিগড়ে আবদ্ধ। সেখানে শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনা, দুঃখ-দুর্দশা, অনাহার-অর্ধাহার, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি সব কিছুকেই বিধিলিপি হিসাবে মেনে নিয়ে দিনযাপন করে চলেছে এই সমাজের মানুষেরা।

কাজেই এই সমাজকে বদল করা এক কঠিন কাজ। কিন্তু সেই কঠিন কাজকেই সম্পন্ন করতে সেদিন এগিয়ে এলেন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক উপজাতি যুবক। দশরথ দেব ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই এগিয়ে আসার দলে আরও যারা ছিলেন তাঁরা হলেন সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা প্রমুখ।

সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিম লগ্ন। এদেরই উদ্যোগে জন্ম নিল ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি। জনশিক্ষা বিস্তারের এই আন্দোলনই প্রথম ক্ষোভহীন বিক্ষোভহীন নিস্তরঙ্গ উপজাতি সমাজে তুলল ঢেউ। সেই ঢেউ উত্তাল হয়ে পরিণত হল ঝড়ে। যে সমাজে ঢেউ দূরে থাক বুদ্‌বুদের সাক্ষাৎ-ও মিলত না সেখানে ঝড় উঠে সামন্ত শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলল। আতঙ্কিত শাসকেরা আশ্রয় নিলেন দমনপীড়নের। দমনপীড়নের মোকাবিলায় গড়ে উঠল প্রতিরোধ। কখনও শান্তিপূর্ণ, কখনও সশস্ত্র।

তারপরের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৯৪৮ সনে গঠিত হল গণমুক্তি পরিষদ। আর সেই সময়েই সি পি আই'র দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। সেই কংগ্রেসের পর শোনা গেল নতুন কথা The Country is pregnant for revolution, ডাক এল সশস্ত্র সংগ্রামের। সি পি আই হল বে-আইনী। গ্রেপ্তার হলেন বহু কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মী। কমরেড দশরথ দেব আত্মগোপন করলেন। আত্মগোপন অবস্থায় থেকেই তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। সেই থেকেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। যে নাম শাসকশ্রেণীর পক্ষে হয়ে উঠল আতঙ্কের আর জনগণের পক্ষে ভরসার।

তারপর এল ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে আত্মগোপন থেকেই লোকসভার পূর্ব ত্রিপুরা আসনে কমরেড দশরথ দেব শুধু জয়ীই হলেন না, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে উপস্থিত হলেন লোকসভায়। সেই চমকপ্রদ ঘটনা কমরেড দশরথ দেবকে বীরের মহিমা দান করে এবং তাঁর নাম রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে এবং দেশের বাইরে। আর রাজ্যের ভিতরে তাঁর জনপ্রিয়তা উঠল তুঙ্গে। সেখানে তিনি তাঁর সমসাময়িক সকল সহকর্মীদের ছাড়িয়ে গেলেন এবং তাঁদের সকলের মধ্যে একজন না থেকে তিনি হয়ে উঠলেন অনন্য। তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তাই তাঁকে বহু কিংবদন্তির নায়ক করে

মানব সমাজ এই পর্যন্ত যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে জাতি সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। আজও পৃথিবী বহু দেশ এই সমস্যায় পীড়িত। দেশ বিভাগজনিত ঐতিহাসিক কারণে আমাদের এই রাজ্যেও সমস্যাটির উদ্ভব ঘটেছে। ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কমরেড দশরথ দেব বুঝেছিলেন এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে জাতি-উপজাতির সুদৃঢ় ঐক্য ও সম্প্রীতি। শুধু তাই নয় তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে উপজাতিদের জাতিসত্তার বিকাশসহ তাদের ন্যায্য দাবি আদায় ও তাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সাফল্য অর্জনের জন্যও জাতি-উপজাতির ঐক্য একটি অপরিহার্য শর্ত। কমরেড দশরথ দেবের উপলব্ধির মধ্যে কোন ভুল ছিলনা তার প্রমাণ বহন করেছে টি টি এ এ ডি সি। টি টি এ এ ডি সি হচ্ছে জাতি-উপজাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফসল, যা পশ্চাৎপদ উপজাতীয়দের

অসম প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার স্বার্থেই গঠিত হয়েছে। উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার দ্বারা চালিত কোন কোন মহল থেকে কমরেড দশরথ দেব সমালোচিত হয়েছেন। কিন্তু কোন প্রকার জাত্যভিমান বর্জিত তাঁর এই অবস্থানে তিনি অবিচলিত থেকে জাতি-উপজাতি ঐক্যের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। কমরেড দশরথ দেব-এর সঙ্গে কখনও কখনও কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য হয়েছে, কিন্তু জাতি-উপজাতি ঐক্যের প্রশ্নে আমরা ছিলাম সকল সময়েই একমত। আগামী দিনেও সেই ঐক্য ও সম্প্রীতির পতাকাই আমরা বহন করে যাব।

সময় বা মহাকাল সব কিছু গ্রাস করে নিঃশেষ করে ছুটে চলে। সময় কি সেই ভাবে কমরেড দশরথ দেবকেও গ্রাস করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আমি বলব, না। কমরেড দশরথ দেব-এর মত মানুষদের সময় গ্রাস করতে পারেনা। বরং তারাই সময়কে গ্রাস করে আমাদেব মধ্যে বেঁচে থাকেন। দশরথদাও থাকবেন। আমাদের প্রেরণা দেবেন। প্রেরণা দেবেন পরবর্তী প্রজন্মকেও, প্রেরণা দেবেন এই রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতি বা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রাথমিক শর্ত জাতি - উপজাতির ঐক্য ও সম্প্রীতিকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা ও শক্তিশালী করতে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



শ্রদ্ধেয় কমরেড দশরথদা-কে যেমন দেখেছি



মুরারিমোহন সাহা

"কংগ্রেস সরকারের নীতির ফলে একদিকে উগ্র বাঙ্গালী জাত্যাভিমান অপরদিকে উগ্র জাতিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ দুটি অশুভ শক্তিই গণতন্ত্র সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।"

১৯৫২ সাল। প্রথম লোকসভার দ্বিতীয় অধিবেশন আসন্ন। সে সময় আমরা কয়েকজন আর এস পি কর্মী প্রতিদিন বিকেল বেলায় বর্মন টেইলারিং হাউসের বারান্দায় বসে আলাপ আলোচনা করতাম। কমরেড যোগেশদা সে আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যদি আমাদের আলোচনায় কোন ভুল ধরা পড়তো তিনি তা শুধ্‌রে দিতেন। একদিন সন্ধ্যায় এসে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা দশরথ বাবুকে মানে এম পি কে দেখেছ ?" আমরা মাথা নেড়ে জানালাম যে আমরা দেখি নি। তিনি বললেন, কাল সকালে, 'ভারত এয়ার ওয়েজ'-এর অফিসে এসো, দশরথবাবু দিল্লী যাবেন, সেখানে দেখতে পাবে।" বলেই যে দ্রুতগতিতে তিনি এসেছিলেন সেই দ্রুতগতিতেই সাইকেলে চড়ে চলে গেলেন। আমাদের রক্তে যেন নাচন লেগে গেল। হবে নাই বা কেন ? এ সময়ে আমরা মুক্তি পরিষদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, খোয়াই মহকুমায় পুলিশ-মিলিটারীর নারকীয় নির্যাতন, উপজাতিদের প্রতিরোধ লড়াই ইত্যাদি সম্পর্কে অল্প বিস্তর সংবাদ পেয়েছিলাম। আর ত্রিপুরার চিফ্ কমিশনারী প্রশাসন তো ঘোষণাই দিয়েছে যে এই আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমরেড দশরথ দেববর্মাকে জীবিত কি মৃত ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রশাসনিক দমন-পীড়নের সমান্তরালে গণতন্ত্র বিরোধী শাসকশ্রেণী ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দ মুক্তি পরিষদের আন্দোলনকে "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলন বলে সারা রাজ্যে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার করেছে। তাদের মনে আশা ছিল যে যেহেতু বাঙ্গালী ভোটদাতাদের সংখ্যা অধিক (পরে সরকারী সেন্সাস রিপোর্টে দেখেছি যে ১৯৫১ সালে রাজ্যে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,৪৫,৭০৭ জন, তার মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যা ২,৩৭,৯৫৩ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৩৬.৮৫% এবং অনুপজাতি জনসংখ্যা ৪,০৭,৭৫৪ জন অর্থাৎ ৬৩.১৫%) তাই গণতান্ত্রিক শক্তির ভিত্তি পাহাড়ী-বাঙ্গালীর ঐক্যে গভীর ফাটল ধরাতে পারলে আসন্ন প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমরেড দশরথ দেব, বীরেন দত্ত-দের পরাজিত করে সকল আসন তারা দখল করে নেবে। এখন যেমন লোকসভার দুটি আসন— একটি পূর্ব ত্রিপুরা (সংরক্ষিত) আসন, অপরটি পশ্চিম ত্রিপুরা আসন — সে সময় এরকম ছিল না। এখন লোকসভার নির্বাচনে একজন ভোটদাতা একটি ভোট প্রদান করেন। কিন্তু সে সময়ে সমগ্র ত্রিপুরাকে লোকসভা

আসনের একটি কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হত। এই এক কেন্দ্রে দুটি আসন একটি উপজাতি সংরক্ষিত, অপরটি সাধারণ। উপজাতি সংরক্ষিত আসনে শুধুমাত্র উপজাতি সমাজভুক্ত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। প্রত্যেক ভোটদাতা দুটি করে ভোট প্রদান করতে পারতেন, একটি উপজাতি সংরক্ষিত আসন ও অপরটি সাধারণ আসনের জন্য। তাই, যেহেতু বাঙ্গালী ভোটদাতার সংখ্যা বেশি কংগ্রেসের মনে আশা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের তাঁরা সহজেই পরাজিত করতে পারবেন, বিশেষত প্রশাসন যখন তাঁদের করতলগত। এমনি পরিস্থিতিতে কমরেড দশরথ দেব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়েই আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরা লোকসভা (উপঃ সঃ) আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতি-উপজাতি ঐক্যের মূর্ত প্রতীক রূপে জনমানসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন। ফলে কংগ্রেস নেতৃত্ব হতভম্ব, প্রশাসন দিশেহারা, প্রশাসক গণক্ষিপ্ত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা তো দূরের কথা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে কী নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা। শুনেছি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি লোকসভায় যোগদান করতে না পারেন। পথেই যেন গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রশাসন এবং পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে তিনি লোকসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন — এ তো উপস্থিত হওয়া নয়, এ যেন আবির্ভাব। আমাদের বয়স তখন ১৮ থেকে ২২/২৩ এর মধ্যে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই প্রবাদ-পুরুষকে দেখার জন্য তখনই আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐ নির্বাচনে কমরেড বীরেন দত্ত কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে লোকসভার সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইলেক্ট্র্যাল কলেজ-এর ত্রিশটি আসনের মধ্যে একুশটি আসন দখল করে নেয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং রাজ্যসভার আসনটিতেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রার্থী বিজয়ী হন। এভাবে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত রকম চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

পরের দিন সকালবেলায় যথাসময়ে আমরা মোটরস্ট্যান্ডস্থিত 'ভারত এয়ার ওয়েজ'-এর অফিসে হাজির হই। যদিও আমরা দশরথদা-কে পূর্বে কখনো দেখিনি তবু তাঁকে চিনে নিতে আমাদের এক মুহূর্তও দেরি হল না। সেখানে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, আর এস পি নেতা কমরেড যোগেশদা, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আগ্রহী বহু ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন। অনেকেই তাঁর সাথে আলাপ করছেন। অনেকে প্রশ্ন করছেন। তিনি মৃদুস্বরে সপ্রতিভভাবে সাবলীল বাংলা ভাষায় উত্তর দিচ্ছেন। কোথাও যেন অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই। প্লেন কোম্পানীর বাস এল। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বাসে তুলে বিদায় জানালেন। সগর্জনে বাসটি সিঙ্গারবিল বিমানবন্দরের দিকে ধাবিত হল। সেদিন আমরা কোন প্রশ্ন করতে পারিনি। শুধু বিস্ময়ভরা মন নিয়ে ফিরে এসেছি।

(খ)

পরাধীন ভারতে প্রভিন্স বা প্রদেশগুলির সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের প্রয়োজনে। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম দাবী ছিল ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করতে হবে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই দাবীকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। শ্রীরামালু এই দাবীকে অবিলম্বে রূপায়িত করার জন্য আমরণ অনশন পালন করে প্রাণত্যাগ করেন। দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়, কেন্দ্রের নেহরু সরকার 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' বসাতে বাধ্য হন। সে সময় ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য ছিল। ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার সহ পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের জন্য দাবি জানালেন। কিন্তু কমিশন ত্রিপুরাকে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার সুপারিশ করে। রাজ্যবাসীর নিকট এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। গণ আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে উঠে। সকল

অ-কংগ্রেসী গণতান্ত্রিকচেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠে "স্বতন্ত্র ত্রিপুরা কমিটি"। পি এস পি নেতা প্রয়াত স্বর্ণকমল রায় এই কমিটির সভাপতি, আর এস পি নেতা কমরেড যোগেশ চক্রবর্তী এবং অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড দশরথ দেব যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলেন। কমিটির নেতৃত্বে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠে এবং আসাম অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। সেই কমিটির বিভিন্ন অধিবেশনে খুব কাছে থেকে দশরথদা-কে দেখার জানার সুযোগ হয়েছিল। সজ্জন, সদালাপী, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন। কোনরূপ ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে দেখিনি। কিন্তু অন্যের মনে আবেগ সৃষ্টি-র করার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর মধ্যে লক্ষ করেছি।

(গ)

ভারতের সংবিধানে পশ্চাৎপদ জনজাতি ও অনুসূচিত জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নকল্পে কিছু কিছু রক্ষাকবচ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল অধিকাংশ সরকারই এই ধারাগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে না। আর ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকার ধারাবাহিকভাবে উপজাতি বিরোধী নীতি গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক শক্তিকে নির্মূল করার অপচেষ্টা করেছে। কংগ্রেস সরকারের নীতির ফলে একদিকে উগ্র বাঙ্গালী জাত্যভিমান অপর দিকে উগ্র উপজাতিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ দুটি অশুভ শক্তিই গণতন্ত্র সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। যাঁরা এদ্দিন সংবিধানের পবিত্রতা নিয়ে সময়ে অসময়ে কোলাহল করতেন এ সময় তাঁদের মুখোশ খসে পড়ে। তাঁরা সমস্বরে দিনের পর দিন বামফ্রন্ট সরকার এবং বিশেষভাবে দশরথদা-র বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ এবং কুৎসার বন্যা বইয়ে দিতে থাকে। সে সময় দশরথদা-কে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মত অটল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি— কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁকে এতটুকু বিচলিত করতে পারেনি।

(ঘ)

তখন তিনি ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটির কনভেনার। কমিটির মিটিং হয় সি পি আই (এম) এর রাজ্য দপ্তরে। যদি কোন পার্টির প্রতিনিধি কোন কারণে সভায় আসতে দেরি করেন তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয়। সে সময়ে ব্যক্তিগত আলোচনা ওঠে। কখনও অতীত আন্দোলনের স্মৃতি। কখনও কোন পুরনো কমরেডদের কথা। মানুষমাত্রেরই কিছু কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকে। তা যাতে কোন সময়ে অন্যের নিকট প্রকাশ হয়ে না পড়ে সেজন্য সবাই চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু দশরথদা-কে দেখেছি একেবারে উল্টো। তিনি নিজেই সেই দুর্বলতার কথা বলতেন। কী শুদ্ধচিত্ত, উদারমন এবং মানুষের শুভ-চেতনার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকলেই এ সম্ভব -- আজ শুধু তাই ভাবি?

গত নির্বাচনের পূর্বে তাঁর এক ছেলের অকাল মৃত্যু ঘটে। সংবাদ পেয়ে ডঃ রমেন্দ্র বর্মন সহ তাঁকে দেখতে যাই। এমনিতেই তিনি খুবই অসুস্থ, তার উপর পুত্র-শোক। সেদিন তাঁকে একটু বিচলিত দেখলাম। ছেলে অনেক টাকা ঋণ নিয়ে দোতালা বাড়ী করেছে। তিনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু এখন কিভাবে ঋণ শোধ করা হবে ? দুটি ছোট নাতি নাতনির ভবিষ্যৎ কি হবে ? কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে নির্বাচনের সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। বললাম যে বামফ্রন্ট এবারও জয়লাভ করবে। তাঁর সেই বিপদঘন মুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। তাঁকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমরা বিদায় নিয়ে উঠে গেলাম।

শেষ প্রণাম

১৫ অক্টোবর ছুটে গেছি তাঁর জন্মস্থান আমপুরা গ্রামে। উপজাতি-বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী-মণিপুরী অগণিত নরনারীর শোকবিহ্বল কান্নায় সমস্ত আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আছে। সকলেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। কমরেড সুরজিৎ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানালেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় টি এস আর বাহিনী তোপধ্বনি করে অভিবাদন জানায়। তাঁর নশ্বর দেহ অগ্নিতে বিলীন হয়ে যায়। সেই শোকস্তব্ধ পরিবেশে শেষ প্রণতি জানিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, আগরতলায় ফিরে আসি। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

কমরেড দশরথ দেবের জীবনাদর্শ ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে



দূর্বাজয় রিয়াং

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে কারামন্ত্রী দূর্বাজয় রিয়াং এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, প্রয়াত কমরেড দশরথ দেব ছিলেন আদর্শবান এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, সময়টা ১৯৪৮ সাল, আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। তখন প্রজামণ্ডলের আমি একজন সক্রিয় সদস্য। হঠাৎ একদিন অঘোর দেববর্মা আমার লক্ষ্মীছড়ার বাড়িতে গিয়ে বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিতব্য এক সভায় যোগদানের জন্য খবর দিয়ে আসেন। খবরের ভিত্তিতে সভায় এসে প্রয়াত দশরথ দেব, হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা সহ বেশ ক'জন উপজাতি নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করি। সেখানেই দশরথ দেব আমাকে রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করেন। আর এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।

যতটুকু মনে আছে, আত্মগোপন থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ সালে খোয়াই-র মগলাম বাড়িতে ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্দেশ্যে টানা সাতদিনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দশরথ দেব আমাকে পার্টির সভ্যপদের শপথ গ্রহণ করান। ঐ সময় জি এম পি-র সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে দশরথ দেব ও অঘোর দেববর্মা। পূর্বেই গণমুক্তি পরিষদকে কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই সেই সভাতেই একুশ জনকে নিয়ে পার্টির একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রয়াত বীরেন দত্ত ও দশরথ দেব এবং অঘোর দেববর্মা ও বীরচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ নেতৃত্বের কাছে পার্টির সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। আমাকেও কমিটির সদস্য করা হয়। বিশেষভাবে দশরথ দেবের পরামর্শ নিয়েই আমি পার্টির কাজে যোগদান করি।

ইতিমধ্যে বহুজন গণ-আন্দোলনের জোয়ার, মৃত্যু পরোয়ানা, জেল ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ অতিক্রান্ত হয়েছে। তাতে প্রথম সারির সৈনিক হিসেবে ছিলেন প্রয়াত দেব। সুতরাং তাঁর জীবনের আত্মত্যাগ, অবদানের কথা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসী বা কমিউনিস্ট সহযোগীর অজানা নয়। এইরূপ একজন ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক রূপকার রাজনৈতিক মহামানবের জীবনাদর্শ আমাদের কাছেও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৭-১০-৯৮]

ব্যক্তি দশরথদাকে যেমন দেখেছি



জ্যোতিষ সাহা

শৃঙ্খলা-জ্ঞানের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন কমঃ দশরথ দেব। একজন অসামরিক লোক হয়ে কীভাবে শান্তিসেনার সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন এবং গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছিলেন — শুধু তাই নয়, নির্বাচন ঘোষণা হবার পর দ্রুততার সাথে সঠিক ও যৌথ সিদ্ধান্তে এসে গেরিলা বাহিনীকে ভোট-যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের নিখুঁত রূপকার ছিলেন।

সকাল প্রায় ছয়টা। স্নান করে আসতেনা আসতেই আমার স্ত্রী বললে, ''বিষ্ণুদা তোমায় ফোন করতে বলেছেন !'' তাড়াতাড়ি লুঙ্গি পরেই ফোন করলাম। ধরলেন কেশববাবু। শোনালেন হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদটি। সবার প্রিয় দশরথদা আর নেই। বাসায় থেকে ঠিক করলাম আগরতলা যাব— শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে— বনানী ঘেরা, ত্রিপুরা মায়ের অত্যন্ত প্রিয়, সাহসী যোদ্ধা মহান বিপ্লবী নেতা ও সন্তানকে। দুপুর দুটোয় রাজ্য কমিটির বারান্দায় চির-নিদ্রায় শায়িত কমঃ দশরথ দেবের মরদেহের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে করতে অতীতের কতগুলো ঘটনা ভীড় জমাতে শুরু করলো।

১৯৫২ সালের শেষ দিকে (মাস ও তারিখ সঠিক মনে নেই) প্রয়াত বীরেন দত্তের বড় ভাই শ্রীরাখাল দত্তের বাড়ীর পাশের খালি জায়গায় বিজয় উৎসবের মিটিং-এর স্থান।

এ মিটিংয়ে কমঃ দশরথ দেবের মেলাঘর হয়ে আসার কথা — কত কথা শুনেছি। কেউ বলতো বাঙ্গালখেদার নেতা, কেউ বা বলতো ত্রিপুরার জ্যোতি বসু। তাঁকে সামনা-সামনি দেখবো। কত না ঔৎসুক্য ! মোহন সিরিজের মহানায়কের ন্যায় দেখা দেবেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান জনতার মধ্যে আমিও এব   ন।

আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে মিটিং শুরু। কমঃ নৃপেন চক্রবর্তী বক্তৃতা করছিলেন। এমনি সময়ে কমঃ দশরথ দেব এসে উপস্থিত হলেন। চারিদিক থেকে শ্লোগান, ''কমঃ দশরথ দেব, লাল সেলাম, লাল সেলাম।'' কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি মাইকের সামনে এলেন এবং বললেন, ''আমি সময়মত আসতে না পারায় দুঃখিত। চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জে .ওয়া অভিনন্দনের উত্তরে কয়েক কথা বলতে হয়েছিল— তাই বিলম্ব হয়ে গেল।'' তাঁর বক্তৃতার সময়েই তারিফ করছিলেন। তবে শ্রেণীশত্রুরা বিদ্রুপের হুল ফোটাতেও কার্পণ্য করেনি। মিটিং বেলায় বেলায় শেষ হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় পূর্ব বাজারস্থিত সৌন্দর্য বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক অনিলদা-র বাড়ীতে মিটিং। আমরা

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম মিটিং চলাকালীন সময়ে।

দেখলাম শুধু, কথা হলো না। সামনা-সামনি বসে কথা শোনবার ও বলবার পিপাসা মিটলো না। এ সুযোগ এল সম্ভবত ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর বা ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশের এবং এম বি বি কলেজে ভর্তি হবার পর পার্টি কলেজ ইউনিটে যুক্ত হই। ইউনিটের আহ্বায়ক কমঃ মুক্তিব্রত দত্ত জানালেন কমঃ দশরথ দেব সেন্ট্রাল রোডস্থিত গৌরী হোটেলের দ্বিতলে পার্টি অফিসে আমাদের নিয়ে বসবেন। আমরা যথারীতি উপস্থিত হলাম। তিনি রাজনীতির প্রাথমিক 'জ্ঞান' দিলেন। আমি অত্যন্ত উৎসাহিত ও উপকৃত হলাম— কারণ আমার রাজনৈতিক জ্ঞান মোটেই স্পষ্ট ছিল না। আলোচনা শুনছি আর তাঁর দিকে তাকাচ্ছি। দুধে আলতা গায়ের রং, মজবুত দেহ সৌষ্ঠব, তেজোদীপ্ত চেহারা, সারল্যে ভরা মুখমণ্ডল, মুখে লেগে থাকা হাসির ছটা। শ্রদ্ধাবনত হলো মস্তক। এ ইউনিট দেখতেন মূলত কমঃ ভানু ঘোষ ও কমঃ সরোজ চন্দ, কমঃ বেণু সেনগুপ্তও মাঝে মাঝে থাকতেন। আবার দেখা পেলাম ১৯৫৪ সালের মার্চ বা এপ্রিল মাসে। আগরতলা পৌরসভা নির্বাচনে স্বর্ণকমল রায়ের বিরুদ্ধে পার্টি থেকে কমঃ বীরেন দত্তকে দাঁড় করানো হলো। স্বেচ্ছাসেবকদের মিটিং হবে। প্রথমদিকে ঠিক হয়েছিল কমঃ বীরেন দত্তের জয়নগরস্থিত বাড়ীতে সে মিটিং হবে। যে কোন কারণে স্থান পরিবর্তিত হয়ে মিটিং হলো কমঃ আতিকলু ইসলামের বাড়ীতে। সে মিটিং- এ তিনি উপস্থিত ছিলেন। শিখলাম বুর্জোয়া নির্বাচনী যুদ্ধ কিভাবে পরিচালনা করতে হয়। নির্বাচনের দিন ঝড়-বৃষ্টি ছিল, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, পোস্টার বৃষ্টি ও ঝড়ে ফেলে দিচ্ছিলো— আমরা সকলে একেবারে ভিজে গেলাম। বহু চেষ্টা করেও বীরেন দা-কে জেতাতে পারলাম না।

১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাধাকিশোরপুর কেন্দ্রে ডাঃ বসিরকে নমিনেশন দেবার জন্য আলোচনা করতে কমঃ দেবের সাথে আমরাও কয়েকজন ছিলাম। চট্‌পট্‌ কথা, কুটিলতা, জটিলতামুক্ত আলোচনা। কত না ভাল লাগলো।

যতটুকু মনে পড়ে — ১৯৬৯ সালে আমার বাসায় রমেশ স্কুল ইউনিটের মিটিং। কমঃ দশরথ দেবের উপস্থিতিতে মিটিং চলছিল। এক ফাঁকে আমার স্ত্রী আমায় ডেকে বললো, "মেয়ে তো বিস্‌কিটের প্যাকেট ভেঙ্গে ফেলেছে। দোকান থেকে আর এক প্যাকেট নিয়ে এসো।" কমঃ দশরথ দেব শুনে বললেন, "মাস্টার বউঠান কী বলছে। বউঠানকে বলো বিস্‌কিট কেউ আস্ত খায় না। তোমার দোকানে যাবার দরকার নেই — মেয়েকেও বকবার কারণ নেই।" তাঁর এ উক্তি আজও বাড়ীর সকলের হৃদয়ে জেগে আছে।

কমঃ স্ট্যালিনের ভাষায় — - একেই বলে সর্বদ্রষ্টা নেতা— আমাদের গোটা পরিবারকে পার্টি দরদী বানিয়ে গেলেন, আমারও কাজ করা সহজ হলো। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তারাও মর্মপীড়া অনুভব করলো।

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে মহারাণীতে কমঃ দশরথ দেবের জনসভা— আমার বাসায় একটু বিশ্রাম করেই বললেন, "জ্যোতিষ তৈরি হও। তোমাকে প্রথমেই বলতে হবে। এ দুটো পয়েন্টের উপর বলবে।" এত বড় বক্তার (Mass orator) সামনে জনসভায় বক্তব্য রাখা যে সহজ না তা অনুমেয়। ফেরবার পথে প্রায় একঘণ্টা অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা করলেন। তার সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম— ত্রিপুরার 'মাও সে তুং'-কে। মাও-কে যেমন চিয়াং কাই শাকের গুপ্তচররা ধরতে পারেনি, তেমনি কমঃ দশরথ দেব-কে

পুরস্কারের লোভ দেখানো সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তরাজার গুপ্তঘাতক ও চররা ধরতে পারেনি।

১৯৮৯ সালে তিনি ভীষণ অসুস্থ। রাজ্য কমিটি থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো— "…. তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। তবে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।"

মুকুটহীন রাজাকে নয়, হৃদয়ের রাজাকে দেখবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। অনেক ভেবে ও চিন্তা করে মনের ইচ্ছাটা নরেশদার নিকট প্রকাশ করলাম। তিনি টেলিফোনে বৌদির সাথে যোগাযোগ করে দেখা করবার দিন-সময় ঠিক করলেন। নির্দিষ্ট তারিখে নরেশ·দাসহ তাকে দেখতে গেলাম। এর মধ্যে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত বললেন — "জ্যোতি বসু যদি ইনজেকশান সময়মত না পাঠাতেন তবে মরে যেতাম। এ যাত্রায় তিনি বাঁচিয়ে দিলেন।" কমঃ জ্যোতি বসুর প্রশংসা করলেন।

একজন বিপ্লবী যোদ্ধা এবং বাগ্মী আর এক তেজস্বী এবং মন্ত্রমুগ্ধ করা বাগ্মীকে তথা সর্বোচ্চ কমিটির নেতাকে কীভাবে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা জানাতে হয়, শেখালেন। যতই নিকটে যাই বিশাল পাহাড়ের পদতলে নিজেকে ততই ছোট বলে মনে হয়।

পঞ্চাশের দশকে উদয়পুর রমেশ স্কুলকে কমিউনিস্টদের স্কুল বলে অভিহিত করা হতো। এর কারণে স্কুলের পক্ষ থেকে বার বার দরখাস্তের মাধ্যমে স্বীকৃতি বা অনুমোদনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা বিষয়টি কমঃ দশরথ দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম— তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংসদের ডেপুটি লিডার ছিলেন। তাঁর যোগ্য ভূমিকা ও তদ্বিরের ফলে ১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করে। রমেশ স্কুলের একজন হিতৈষী ও প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কমঃ দশরথ দেবের এ কাজের জন্য শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শেষবারের মত দেখা হলো ১৮ই জুন, ১৯৯৮ ইং সকালবেলা। প্রথমে বাধা পেলেও নাম শুনে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। মূলত দু'টো কারণে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রথমত তাঁর ছোট ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও সমবেদনা জ্ঞাপন করতে পারিনি, তা জ্ঞাপন করা। দ্বিতীয়ত পার্টি ক্লাশের জন্য জানা প্রয়োজন রাজ্য কমিটির প্রথম সম্পাদকের নাম। তিনি বললেন, আর আমি লিখে নিলাম। প্রসঙ্গত তাঁর ছেলের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুসংবাদটি এলো — তিনি বললেন, "আমি ঠিক আছি। তোমার বৌদি ঐ বাথরুমে যায় না, এটা দেখলেই কাঁদে। দুই-একদিনের মধ্যে বাথরুমটি ভেঙ্গে ফেলবো।" আমি আর কথা বলতে পারিনি। এর মধ্যেই ডাঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য পৌঁছেছেন। একটু পরেই চলে এলাম। আসতে আসতে ভাবলাম তিনি মুখে যাই বলুন ছেলের মৃত্যু শক্তিশেলের মত বুকে বিঁধে আছে। বৌদি মঙ্গলেশ্বরী দেবীর কথাই ঠিক। অন্যকে সান্ত্বনা দিলেও নিজে বিজনে নীরবে কাঁদছেন। এটাই পিতা দশরথের রূপ। কমিউনিস্টদের হৃদয় তো পাথর দিয়ে গড়া নয়। কার্ল মার্কস তাঁর একমাত্র পুত্র যখন মারা যায়, তখনি তিনি বলেছিলেন ঃ "জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের জ্বালা সয়েছি। কিন্তু এখন বুঝেছি সত্যিকারের শোক কী।" ব্যবধান শুধু এই— মার্কস প্রকাশ করেছেন আর তিনি লুকিয়েছেন।

শৃঙ্খলা-জ্ঞানের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন কমঃ দশরথ দেব। একজন অসামরিক লোক হয়ে কীভাবে শান্তিসেনার সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন এবং গেরিলা পদ্ধতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচন ঘোষণা হবার পর দ্রুততার সাথে সঠিক ও যৌথ সিদ্ধান্তে এসে গেরিলা বাহিনীকে ভোট-যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে

হয়। তিনি তত্ত্ব ও বাস্তব প্রয়োগের নিখুঁত রূপকার ছিলেন।

কিউবার কিংবদন্তি নেতা ফিডেল কাস্ত্রোর সাথে কমঃ দশরথ দেবের সংগ্রামী কর্মপ্রণালীকে কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। কিউবার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কমঃ কাস্ত্রো কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিউবার পাহাড়ে ও জঙ্গলে লড়াই করতে করতে আদর্শের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বৈরাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রপ্রধান বাতিস্তাকে উচ্ছেদ করেন। কমঃ দশরথ দেব ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪৮ সালে বাস্তবের তাগিদে গণমুক্তি পরিষদ গঠনে মুখ্য ভূমিকা নেন। রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট হন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৯৮ সালের ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় ৫৪ বৎসর কখনো আত্মগোপন, কখনও প্রকাশ্যে সংসদে আবার কখনও রাজ্য প্রশাসনে সর্বত্র বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যু নেই। আমরা তাঁকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। তাঁর সংগ্রামী ইতিহাস চিরদিন আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২৭-১০-৯৮]



প্রবাদ - পুরুষ দশরথ দেব



মোহনলাল সাহা

সেদিন দশরথবাবু আমায় যেভাবে আপনজনের মতো কথা বলেছেন, ক্ষুদ্র, সাধারণ ব্যবসায়ীদের হয়ে তাদের ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামের মূল্যায়ন করেছেন, সর্বোপরি সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নের মাঝারে আমার সাথে একাত্ম হয়েছেন সে স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারবো না।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হলো। রাজা দশরথ তথা দশরথ দেব অনিন্দ্য সুন্দর মহালোকে আজ ভোরে যাত্রা করলেন। কঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁকে প্রত্যাশিত সময়ের আগেই চিরবিদায় নিতে হলো। জরা-ব্যাধির প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় বেদনা-বিধুর হৃদয়ে ক্লান্ত সৈনিক অনেক আগেই রাজনৈতিক জীবনের ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দল এই মহীরুহের আশ্রয় থেকে সরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারেনি। পরিশেষে এবারের নির্বাচনে বিশ্রাম নিলেন রাজনৈতিক জীবনের অর্ধ শতাব্দীরও অধিক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পথ পরিক্রমা থেকে এক কথায় জোর করে।

দশরথবাবুর সাথে আমার পরিচয় এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সালে যখন আমি উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিদ্যালয়ের অর্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত, তখন একদিন সকালে হঠাৎ শ্রদ্ধেয় জননেতা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র শচীন সিং খুব ভোরে আমায় ডেকে পাঠালেন। প্রাতঃরাশের টেবিলে তিনি আমাকে তাঁর স্মরণ থেকে অঞ্চলভিত্তিক প্রায় দেড়শত প্রাক্তন ছাত্রের নাম ক্রমাগত বলে গেলেন। আমি আর তৎকালীন একাডেমীর প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্র ভট্টাচার্য তাদের নাম নথীভুক্ত করে নিলাম। তারপর গ্রুপ করে তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে আরম্ভ করলাম। এই অভিযানে দশরথবাবুর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দিন দেখা করতে গিয়ে জানলাম তিনি বাড়ী নেই জম্পুই গেছেন। কৃষ্ণনগর টি আর টি সি-র কম্পাউন্ডের মধ্যে, বর্তমান অরবিন্দ আশ্রমের প্রায় বিপরীত দিকে রাস্তার সাথে একতলা ছোট বাড়ী। দুই দিন পরে কথামত টেলিফোন করে গেলাম। সকালে চা খেতে বললেন— দেখুন প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন এসব প্রাক্তনদের কথা কেবল, আমি নীতিগতভাবে তা সমর্থন করি না। তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর দিলাম এই তাত্ত্বিক নেতাকে— কার্ল মার্কস কি বর্তমান না অতীত ? ব্যক্তি অতীত, কিন্তু নীতি তো বর্তমান। অতীতের মাইলস্টোনের উপরেই তো

বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে। উমাকান্তের অতীতের বিদ্যাশিক্ষা থেকেই তো বর্তমান দশরথ দেব। না হলে তো ত্রিপুরাতে একজন দশরথ দেব হলো কি করে ? হাজার-হাজার দশরথ দেব হতো। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এর মধ্যে চা-মুড়ি খাওয়া শেষ। তারপর মজা করে উমাকান্তের ছাত্রজীবনের নানা কথা। পরবর্তী কালে তিনি সম্মেলনে উপস্থিত না হতে পারলেও উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এরই মধ্যে শুনলাম শচীনদার কাছে তাঁর সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী, হুলিয়া জারী অবস্থায় রাজ্যের দুঁদে পুলিশদের চোখে ফাঁকি দিয়ে শিশু উদ্যানে বক্তৃতা কিংবা লোকসভায় হাজির হওয়া।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক জীবনে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে তিনি আদিবাসী জনসাধারণের হৃদয়ের আসনে রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সাচ্চা কম্যুনিস্ট হিসাবে অতি সাধারণ জীবনযাপন। রাজ্যের হৃত দরিদ্র আদিবাসীদের জন্য অবরুদ্ধ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ— এ প্রবাদ-পুরুষের জীবনের এক বিশিষ্ট দিক।

পঞ্চাশ দশকে মানুষ যেখানে— পাহাড়-জঙ্গল বলতে ভয় পেয়ে যেতো, সেখানে তিনি অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে গণশিক্ষার জন্য ২৫০-এর অধিক স্কুল স্থাপন করেন, আমাদের কাছে যা স্বপ্নেরও অতীত। সম্ভবত প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও মেধাবী তাত্ত্বিক রাজনীতিককে চিনতে ইন্দিরা গান্ধী ভুল করেননি। পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে বা তার অর্থনৈতিক অবস্থা সঠিক জানতে হলে, তিনি (ইন্দিরাজী) প্রথমেই দশরথবাবুর পরামর্শ নিতেন।

এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি যা থেকে এর যথার্থতা বোঝা যাবে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে নয়াদিল্লীর বিঠলভাই প্যাটেল হাউজে ভূমি সংস্কার নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এক জরুরি বৈঠক করেছিলেন। তাতে লোকসভার গণমান্য সদস্য সহ দেশের বাঘা বাঘা অর্থনীতিবিদরা আমন্ত্রিত ছিলেন। বক্তার তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ আমন্ত্রণে ত্রিপুরার দশরথবাবু মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে দেশের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ সহ রাজনৈতিক নেতাদের চক্ষু ছানাবড়া। তারা ভেবেই পেল না ঘন জঙ্গল, টিলা আর পার্বত্য ভূমিতে গড়া অঞ্চলের প্রতিনিধি কি করে এত উন্নত কৃষক স্বার্থমুখী ভূমি সংস্কার আইনের কথা চিন্তা করতে পারলেন। তারা তাঁর বক্তৃতা থেকে শিক্ষা নিল কিভাবে রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর খবর নখদর্পণে রাখতে হয়।

হয়ত অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এত তথ্যনিষ্ঠ খবর জানা রাজনীতিবিদ হয়েও আজ ত্রিপুরায় গ্রাম-পাহাড়ের অধিবাসীরা এত নিঃস্ব হৃত দরিদ্র কেন ? তিনি দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় মন্ত্রী ছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেছেন। তাঁর দল এখনও শাসন করছে রাজ্যে। অথচ জুমিয়ার সংখ্যা বেড়েই চলছে। প্রান্তিক এবং উপ-প্রান্তিক চাষীরা আজ ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এখানেই এক তাত্ত্বিক নেতার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এ আমলের প্রশাসনের শঠতার কাছে। ফলে জুমিয়ারা চরম বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছে মাত্র কয়েক বছরের নব্য সৃষ্ট ভুঁইফোঁড় উপজাতি (প্রতিবাদ সহ মূল শব্দ আদিবাসী) শোষকশ্রেণীর হাতে।

প্রশাসক হিসাবে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন বিভীষিকাপূর্ণ আশির জুনের দাঙ্গার মাত্র কয়েক দিনের ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, পরবর্তী কালে কি তা তিনি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন কি সফলকাম হয়েছেন তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তিনি যে ত্রিপুরার সমৃদ্ধি চেয়েছেন এ

নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন কালে যে কয়জন তাত্ত্বিক নেতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ - এর লাইনে পার্টিকে ধরে রেখেছেন ভারতবর্ষে, তার মধ্যে তিনি একজন প্রথম সারির নেতা। সুদীর্ঘকাল যাবৎ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

ষাট দশকের শেষভাগে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে থেকে রাজ্যের রেল স্থাপনের জন্য যখন আন্দোলন সংগঠিত হয়, তখন এ লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেছেন যারা তার মধ্যে অন্যতম প্রয়াত নেতা দশরথবাবু। অপর ব্যক্তিত্ব অনুজ প্রতিম ত্রিপুরার বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র। আশির দশকের শেষ ভাগের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করে থাকা যায় না। তৎকালীন ব্যবসায়ী সমিতি ভেঙে দিয়ে এ লেখককে আহ্বায়ক করে একটি এডহক কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি নতুনভাবে নির্বাচন আহ্বানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমিতি গঠনে সচেষ্ট হয়। নির্বাচনের দিন রাতে গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়। গভীর রাতে গৌতম (গৌতম দাস) আমায় টেলিফোন করে খবর পেয়ে। তারপর করেন দশরথবাবু। বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয় তাঁর বাসায়। কার্যক্রমের তথ্যনিষ্ঠ দলিলপত্র দেখে স্তম্ভিত হন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। পরদিন ডেকে পাঠায় বন্ধুবর জীবন চক্রবর্তী, একান্ত সহকারী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুর। দীর্ঘ সময় আলোচনা হয় সেদিন অপরাহ্নে দশরথবাবুর সাথে। সকলেই আমায় পরামর্শ দিয়েছেন আবার মিটিং ডাকতে। সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু আমি সে পথে যাইনি আত্মঘাতী মানুষগুলিকে শিক্ষা দেবার জন্য। যারা নিজেদের নিজেরা রক্ষা করতে পারে না তাদের রক্ষা করার আমি কে ? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়।

সেদিন দশরথবাবু আমায় যেভাবে আপনজনের মতো কথা বলেছেন, ক্ষুদ্র, সাধারণ ব্যবসায়ীদের হয়ে তাদের ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামের মূল্যায়ন করেছেন, সর্বোপরি সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নের মাঝারে আমার সাথে একাত্ম হয়েছেন সে স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারবো না।

যদিও পরিণত বয়সেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন তবু নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে দশরথবাবু চিরকাল এ রাজ্যের জনমানসে কিংবদন্তির রাজ সিংহাসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও। ●

[দৈনিক সংবাদ ১৫-১০-৯৮]



চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দশরথ দেব। মধ্যে সমর মুখার্জী, এম পি

শিক্ষা, সম্প্রীতি ও সংগ্রামের মিলিত নাম দশরথ দেব



রবীন সেনগুপ্ত

দশরথ দেববর্মা ও তাঁর সংগঠিত মুক্তি পরিষদের সঙ্গে 'শান্তি বাহিনী' ছিল অঙ্গাঙ্গিভবে জড়িত। বলতে গেলে সংগ্রামে একে অন্যের পরিপূরক।

প্রকৃত শিক্ষাই সমাজকে সভ্যতা শিষ্টাচার ও প্রজ্ঞার আলোতে নিয়ে যায়। আর এই শিক্ষায় যাঁরা পশ্চাৎপদ তাঁরা অনুন্নতই থেকে যান। ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায় এই শিক্ষার আলোক থেকে সেই রাজন্য যুগ হতেই বঞ্চিত। কোন এক সময় ত্রিপুরার ভূমিপুত্রগণই ছিল স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী (চাকলা রোশনাবাদের জমিদারীর লোকসংখ্যা বাদ দিয়ে) এই আদিবাসী পার্বত্য জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলোক বঞ্চিত হবার মূলে ছিল চরম দারিদ্র্য ও অন্ধ রাজানুগত্য। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে কতটুকু উৎসাহী ছিলেন তৎকালীন পরিসংখ্যানেই তার প্রমাণ নথিবদ্ধ রয়েছে। ১৮৭৪-৭৫ বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে উল্লেখ আছে " .... Education is very backward, and in 1901 only 2.3 percent of the population could read and write. In 1903 the number of people under instruction was as 3125 (Boys 3008 and Girls 117) the number of Schools in the same year was 103.... "

এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে যে রাজন্য যুগে ত্রিপুরা শহর ও আদিবাসী গ্রামাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষার আলোকে কতখানি পশ্চাৎপদ ছিল। বিশেষ করে ককবরক ভাষাভাষী বৃহৎ জনগোষ্ঠী। ১৯৩৮ খ্রীঃ এই সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষাবিস্তারের অচলায়তনকে ভেঙ্গে জন্ম নিল প্রগতিবাদী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গঠিত 'জনমঙ্গল সমিতি।' যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছিলেন বীরেন দত্ত। ১৯৩৮ -এর নভেম্বর মাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত 'ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি'র প্রথম সভায় গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায়, বীরেন দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, কীর্তি সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

এই সমিতির বিভিন্ন দাবির মধ্যে ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা, কৃষক সমিতি গঠন ও খাজনা মকুব, কৃষকদের জীবনের আর্থিক উন্নতি। আগরতলার পার্শ্ববর্তী দুর্গা চৌধুরী পাড়ার চানু দেববর্মা (হেমন্ত দেববর্মার জ্যাঠা) জিরানীয়ার সুকুমার দেববর্মা ছিলেন বিশেষ ভূমিকায়। ১৯৩৯

খ্রীঃ ১লা মে বীরেন দত্ত-র সম্পাদনায় 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' নাম দিয়ে এক মুখপত্র প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বিষয় প্রাধান্য থাকলেও অর্থনৈতিক শোষণ, অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণকে সংগঠিত করার সপক্ষে নিয়মিত রচনাদি তাতে প্রকাশ পেত। ইতিমধ্যে ১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের সাহায্যার্থে ত্রিপুরার মহারাজা দ্বারা গঠিত হয়েছিল ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্ ও ত্রিপুরা মহারাজা বীরবিক্রম লিজিয়ন (টি এম বি এল)। পাহাড়ের দরিদ্র, অর্ধ-শিক্ষিত আদিবাসী যুবকগণই ছিল এই দুই বাহিনীর মুখ্য সৈনিক। সুদূর বার্মা সীমান্তে বৃটিশ বাহিনীর হয়ে গেরিলা যুদ্ধে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামে এঁদের সাফল্যের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। যুদ্ধাবসানের পরবর্তী সময়ে এই বাহিনী ভেঙে যায় এবং ত্রিপুরার পাহাড়ে মহাজনী শোষণ, তিতুনকরের বিরুদ্ধে ও সর্বোপরি ত্রিপুর জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণে উক্ত বাহিনীর সদস্যগণের ভূমিকা ও 'জনশিক্ষা সমিতি' এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

১৯৩৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রীঃ এই ছয়টি বছর ত্রিপুরা রাজ্যে সামাজিক আন্দোলনে আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দশরথ দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা, দ্বারিক দেববর্মা, কালা দেববর্মা, সুকুমার দেববর্মা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে সদ্য হবিগঞ্জ কলেজে অধ্যয়নরত বি এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র দশরথ দেববর্মা ও শ্রীকাইল কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র সুধন্বা দেববর্মা বয়সে ও শিক্ষায় অন্যদের থেকে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ। ছাত্রাবস্থা থেকেই দশরথ দেববর্মা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতার অধিকারী। ১৯৩৯-৪১ খ্রীঃ আগরতলায় ত্রিপুরা বা টিপ্রা বোর্ডিং-এ থেকে উমাকান্ত স্কুলে পড়াশুনা করায় বীরেন দত্ত-র সঙ্গে সামান্য পরিচয় যোগসূত্র ছিল সুধন্বা দেববর্মার। ১৯৪১ খ্রীঃ বোর্ডিং-এর সুপার আনন্দমোহন দাসের সঙ্গে বোর্ডিং-এর নিয়ম পদ্ধতির অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং প্রতিদান স্বরূপ দ্বারিক দেববর্মা সহ খোয়াই বোর্ডিং-এ স্থানান্তরিত হন। ওখান থেকেই দশরথ দেববর্মা ১৯৪৩ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে হবিগঞ্জের কলেজে আর্টস নিয়ে বি এ ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৩৬ খ্রীঃ উমাকান্ত স্কুলে নীচের ক্লাশে পড়াশুনা করার সময় থেকেই উক্ত স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র প্রবন্ধকারের অগ্রজ কানু সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় এবং বয়সে যদিও দশরথ দেববর্মা বড় ছিলেন কিন্তু উঁচু ক্লাশের ছাত্র বলে কানু সেনগুপ্ত, ঊষা দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন।

দশরথ দেববর্মা শ্রীহট্টের (সিলেট) হবিগঞ্জে বি সি কলেজে পড়াশোনা করার সময় থেকেই মার্ক্সবাদী সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। ইতোপূর্বে আগরতলার ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ অবস্থানের সময়েই নীচু ক্লাশের ছাত্র অঘোর ও নীলমণি দেববর্মার মারফৎ বীরেন দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত 'জনযুদ্ধের' ২/৩ কপির রচনা ও রাজনৈতিক প্রবন্ধের প্রতি ওর দৃষ্টি পড়েছিল। যা পরবর্তী জীবনে প্রবন্ধকারের সঙ্গে পারিবারিক আলাপচারিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

এ দিকে বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ত্রিপুরার পাহাড়-কন্দরে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক বাতাবরণ ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য প্রবলভাবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আগরতলার নীলমণি দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তর প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় একটি প্রতিবাদী সংগঠন করার প্রয়াস করেন। সদর দক্ষিণে হেরমা পাড়ায় যোগেন্দ্র দেববর্মা ও ব্রজকুমার দেববর্মার এবং চেফ্রুয়া পাড়ার হরেন্দ্র দেববর্মা প্রভৃতি দুর্গা চৌধুরী পাড়ার হেমন্ত দেববর্মার বাড়ীতে প্রাথমিক সভা করেন। অঘোর ও নীলমণি হবিগঞ্জে দশরথ দেববর্মার সঙ্গে দেখা করে সমিতি গড়ার ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেন। নির্দিষ্ট তারিখ মত দশরথ দেববর্মা খোয়াই বোর্ডিং-এর ছাত্র রবীন্দ্র দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, অমূল্য দেববর্মা ও আরো ৮/৯ জন ছাত্র নিয়ে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় উপস্থিত হন। সর্বশ্রী সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ, যোগেন্দ্র, জগবন্ধু, অঘোর, হরিনাথ, নীলমণি, হরিচরণ, রমেন, ধপলা, খগেন্দ্র, রবীন্দ্র, রাধামণি, দ্বারিক, ধর্মরায়, শশাঙ্ক, মনমোহন, রামচরণ প্রভৃতি আরো অনেকে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে সুধন্বা দেববর্মা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারিখটি ছিল ১১ই পৌষ, ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ (১৯৪৫ ইং), বঙ্গাব্দ ১৩৫২। মোট এগার জনকে নিয়ে জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হল। সভাপতি সুধন্বা দেববর্মা, সহ-সভাপতি দশরথ দেববর্মা, সম্পাদক হেমন্ত দেববর্মা। কমলপুর ও খোয়াই বিভাগের সংগঠন গড়া এবং বেসরকারী বিদ্যালয় গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় দশরথ দেববর্মার উপর। সদর উত্তরের একাংশ যেমন সোনাই নদীর উত্তর পাড় থেকে সিমনা অঞ্চল পর্যন্ত সংগঠন করার কাজ প্রধানত দশরথ দেববর্মাকে দেখতে হতো। গ্রামে গ্রামে বৈঠক সভা নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ও সংকল্প সেদিন দশরথ নিজ কাঁধে তুলে নেন। এদিকে যুদ্ধাবসানে মহারাজ বীরবিক্রমের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন ইংরাজ সন্তান ডি ডব্লিউ ব্রাউন। উদার মনোভাবসম্পন্ন এই শিক্ষামন্ত্রীর আগ্রহে ও চেষ্টায় অন্তত কয়েক বছরের মধ্যে শত শত স্কুলে আদিবাসী, বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর কচিকাঁচাদের অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবার সুযোগ এসেছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায়— ১৯৪৬ খ্রীঃ যেখানে সারা ত্রিপুরায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২৩ ও ছাত্র সংখ্যা ৫,১১৫ সেখানে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত বিদ্যালয় সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৪০৪ ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৯,১৫৫। সমগ্র ত্রিপুরার জনসংখ্যার ২৪.৮ শতাংশ (৬ - ১১ বৎসর) (সূত্র — 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট')।

> Jr. S. I. মণীন্দ্র দেববর্মা —
>
> তোমার রিপোর্ট পাইয়াছি। তোমরা বর্তমানে ঘিলাতলীর মধ্য দিয়ে যে রাস্তা কালীটিলা পর্যন্ত গিয়াছে সেই রাস্তার উপর নজর রাখিবা। ঐ রাস্তাতেই দশরথ ফিরিতে পারে এতদ্ব্যতীত আর যদি কোন রাস্তা থাকে রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও। তবে সেই রাস্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। রাত্রিতে পেট্রল রীতিমত রাখিবা। সর্বদা মনে রাখিবে বিপদ সম্মুখে তবেই গাফিলতি আসিবে না। দীনেশ জমাদারকে বলিও সে যেন রাজেন্দ্র পোষাক লইয়া পলাইয়া গিয়াছে মর্মে একটি রিপোর্ট দেয় তবে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে। ব্রজমোহনকে আগামীকল্য পাঠাইয়া দিতে পার, সাবধানে থাকিও। আগামীকল্য সকল বিষয় জানিতে পারিবা।
>
> **স্বা ঃ শ্রী ভুবন দেববর্মা**
>
> **ইতি — ১৫/৭**
>
> **[পুলিশ দপ্তরের তৎকালীন একটি দলিল। সংগ্রাহক ঃ লেখক]**

সেই সময় মহারাজ বীরবিক্রম বুঝতে পারেন এই ঘুমন্ত আদিবাসী সমাজকে যদি শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে জাগিয়ে তোলা যায় তাহলে বহু বছরের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যশাসন, নিপীড়ন, বেগার খাটা, তিতুন কর সব কিছু নস্যাৎ হয়ে

যাবে। এই শিক্ষাবিস্তারের মূল শিকড় ও উদ্দেশ্য অনেক গভীরে। এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের পরোক্ষ সমর্থন তাঁকে বিচলিত করে তোলে। ইতোপূর্বে ১৯৪৫ সনের 'জনমঙ্গল সমিতি'-র কতিপয় সাম্যবাদ বিশ্বাসী তরুণ বীরেন দত্তর নেতৃত্বে নীলমণি, সুধন্বাকে সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড পি সি যোশীর সঙ্গে কুমিল্লায় দেখা করেন এবং ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার এবং আদিবাসী গোষ্ঠীকে এতে সামিল করার সপক্ষে যুক্তি দেখান। কমরেড যোশী তখন উক্ত প্রতিনিধিবৃন্দকে উপদেশ দেন এক্ষুণি পার্টি গড়ার সময় আসেনি। আগে আদিবাসী সাধারণ মানুষকে পড়াশোনা, জ্ঞানের আলো দিতে হবে। এরপর তাঁদের মার্ক্সবাদ বা সাম্যবাদের মূল তত্ত্ব বোঝাতে হবে। পরবর্তী সময়ে বীরেন দত্তকে মুখ্য পরামর্শদাতা রেখে 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় এবং এই হচ্ছে কঠিন বাস্তব সত্য। পরবর্তী সময়ে প্রজামণ্ডল সমিতি, গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত রচনা, জনশিক্ষা সমিতি গড়ে ওঠার এটাই হচ্ছে আদিকথা।

ওদিকে মহারাজ বীর বিক্রম জনমঙ্গল সমিতি ও জনশিক্ষা সমিতির জনপ্রিয়তা, ক্রমবর্ধমান শ্রীবৃদ্ধি ও কার্যকলাপে ভীত হয়ে পড়েন এই কারণে যে, রাজা ও তার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একদিন পাহাড়ী প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এই শিক্ষা আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য ১৯৪৬ খ্রীঃ আগরতলা শহরের দরবার মাঠে সকল উপজাতি সর্দার ও বংশবদদের নিয়ে এক ভোজসভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

তখন জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা এবং প্রভাত রায়, বংশীঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা ও বীরেন দত্ত - মহারাজের ঐ প্রচেষ্টা বাধা দেওয়া ঠিক হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেন। রাজার প্রতি উপজাতিদের যেমন রাজানুগত্য আছে, তেমনি জনশিক্ষা সমিতিকে খুব কাছের বন্ধু হিসাবে উপজাতিরা মনে করতে শুরু করেছে। পরবর্তী সময়ে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক দল থেকে প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখ ব্যক্তিদের মহারাজার সৃষ্ট 'উপজাতি সংগঠনের' সদস্য করা হয়। জনশিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মহারাজার সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়া। এরই ফলশ্রুতি দেখা গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যে সুধন্বা, হেমন্ত ও বংশী ঠাকুর গ্রেপ্তার হন। দশরথ তখন ত্রিপুরার বাইরে কলকাতায় এম এ ও আইন অধ্যয়ন রত। এমতাবস্থায় তাঁর উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। ওদিকে মহারাজ আয়োজিত উপজাতি সম্মেলনে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী দাবি তোলে যদি হেমন্ত দেববর্মার উপর দৈহিক নির্যাতন বন্ধ না করেন ও ধৃতদের মুক্তি না দেন তবে তারা কেউ উক্ত সম্মেলনে যোগ দেবেন না। অবশেষে জনরোষে বাধ্য হয়ে রাজা তাদের মুক্তি দেন ও নবসৃষ্ট 'ত্রিপুর ' ংঘে'র সদস্য করে নেন। কিন্তু দশরথ দেববর্মাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম ১৯৪৭ খ্রীঃ মে মাসে মারা যান। তাঁর অবর্তমানে নাবালিক পুত্রের পক্ষে মহারাজার রানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী 'রিজেন্ট' রূপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। এ সময় এটিকে বলা হতো 'দেওয়ানী রাজত্ব । জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন ধীরে ধীরে আবর্তিত হতে থাকে প্রজা আন্দোলনের দিকে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে 'ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ' গঠিত হয়। ওদিকে সংগঠন সৃষ্টি হবার বেশ কয়েক মাস পূর্বেই ত্রিপুরা প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার নায়কদের মধ্যে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও কানু সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রগতিশীল প্রভাত

রায় ও বংশী ঠাকুরও গ্রেপ্তার হন। এ বছরই গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্ত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। ওদিকে কলকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দশরথ কলকাতায় পাঠরত। পর্যবেক্ষকরূপে ওই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে কিছুদিনের মধ্যে আগরতলায় ফিরে আসেন। ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ গঠনকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ওদিকে ৯ই অক্টোবর ১৯৪৮ উজান গোলাঘাটির ভক্ত ঠাকুর পাড়ায় মহাজনের কাছ থেকে ধান আনতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ছয়জন ত্রিপুরী উপজাতি ও একজন মুসলমান কৃষক নিহত হন। সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরার আদিবাসী জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ইতোপূর্বে দশরথ দেববর্মাকে সভাপতি করে সিদ্ধান্ত হয় ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৮ ইং) আগরতলা শহরে এক কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ঐ মিছিলের শ্লোগানগুলি কি হবে ঠিক করা হয় (১) প্রজার ভোটে সরকার চাই (২) দেওয়ানী শাসন দূর হোক (৩) বিনা শর্তে রাজবন্দীদের মুক্তি চাই (৪) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল কর (৫) পুলিশী জুলুম বন্ধ কর (৬) বিনা বিচারে কাউকে আটক করা চলবে না। (৭) ইনকিলাব জিন্দাবাদ। সভাপতি দশরথ দেববর্মার অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্তর-পূর্বে, পশ্চিম, দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারিগণ স্থানীয় দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় ২/৩ দিন আগে জড়ো হয়। মুক্তি পরিষদের একটি মুখপত্র 'বার্তা' নাম দিয়ে দশরথ দেববর্মার সম্পাদনায় প্রকাশ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। বীরেন দত্তর প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছেপে এই পত্রিকা বের হত। কয়েক সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ৩০শে শ্রাবণ গণমিছিল বের হওয়ার পূর্বে প্রেসিডেন্ট দশরথ দেববর্মা তাঁর সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মিতার স্বাক্ষর রেখে ককবরক ভাষায় দীর্ঘ ভাষণ রাখেন। ঘন ঘন করতালির মধ্যে তা জনতা কর্তৃক সমর্থিত হয়। সেদিনের সুশৃঙ্খল মিছিলের নেতৃত্ব দেন অঘোর ও হেমন্ত।

সেদিনের ঐতিহাসিক মিছিল সারা ত্রিপুরার বুকে প্রথম উপজাতি বিক্ষোভ মিছিল। উমাকান্ত স্কুলে মিছিল ত্রিশ মিনিটের জন্য জমায়েত হয়। অঘোর দেববর্মা ভাষণ রাখেন।

এদিকে এই মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবার পর রিজেন্ট শাসিত মিলিটারী ও পুলিশের চরম নির্যাতন নেমে আসে পাহাড়ী অঞ্চলে। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি মুক্তি পরিষদের অস্ত্রের লড়াই শুরু হয়ে যায়। দশরথ দেববর্মার সুযোগ্য নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে মিলিটারী পুলিশের নারীদের উপর অত্যাচার, লুঠপাট ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ২৭/১১/৫৮ ত্রিং অর্থাৎ ১১ই মার্চ ১৯৪৮ ইং রিজেন্ট মাতা মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর পক্ষে দেওয়ান বাহাদুর সমগ্র খোয়াই ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামরিক শাসন আইন জারী করেন। 'হৃদয়মণি দেববর্মা, সামরিক শাসনকর্তা' এই নামে মুদ্রণ করে চারদিকে প্যাম্পলেট ছড়িয়ে আদিবাসী জনগণকে দশরথ দেববর্মা ও তাঁর অনুগত 'মুক্তি পরিষদের' বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ করা হয়। এতৎপ্রসঙ্গ প্রয়াত 'দশরথ দেব' লিখিত 'মুক্তি পরিষদের ইতিকথা' পুস্তকে বিশদ বিবৃত আছে।

দেখতে দেখতে বছর আবর্তিত হচ্ছে। পৌষের পাকা ফসল ঘরে উঠছে না। চৈত্র-বৈশাখে কোন জুমিয়া 'জুম' করতে পারছে না। চারদিকে অন্নের জন্য হাহাকার। কিন্তু সংগঠিত আদিবাসী সম্প্রদায় বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। ১৯৪৮-৫০ এর সংগ্রামে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তি সংগ্রামীদের আত্মগোপন ও

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে সংগ্রাম চালাতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন হলে হাতে অস্ত্র নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। নারীদের এই দৃঢ় মানসিকতারই প্রামাণ্য ইতিহাস ১৯৪৯ সালে পদ্মবিলের কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রীর হত্যার বেদনা-বিধুর কাহিনী যা আজও ইতিহাস হয়ে আছে।

আগরতলা শহরের অনতিদূরে চারদিকে উঁচু-নীচু টিপি ঘেরা শস্যশ্যামল এই আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়ী অঞ্চল — নাম তার 'দুর্গা চৌধুরী পাড়া'। অনেক সংগ্রামের পীঠস্থান। এখানের মাটির সঙ্গে মিশে আছে জনমঙ্গল সমিতি, জনশিক্ষা সমিতি, প্রজামণ্ডল ও সর্বশেষ মুক্তি পরিষদের জন্মদাত্রী ভূমি হিসাবে। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর (১১ই পৌষ ১৩৫৫ ত্রিং) এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রজামণ্ডলের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। আগরতলা থেকে বীরেন দত্ত-র নেতৃত্বে আরমান আলী মুন্সি, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, যোগেশ ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা আরো অনেক এবং ছাত্রকর্মী নীলমণি দেববর্মা, বেণু সেন, রবি সেন, ভানু গাঙ্গুলী, হামী রায়, অনুরূপা দেববর্মা প্রভৃতি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দশরথ দেববর্মার নেতৃত্বে— মুক্তি পরিষদের সংগঠনের মাধ্যমে সমগ্র আদিবাসী সমাজভুক্ত রাজন্য ও মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে সংগ্রাম একে নৈতিক ভাবে সমর্থন অন্যতম প্রধান কারণ।

দশরথ দেববর্মা ও তাঁর সংগঠিত মুক্তি পরিষদের সঙ্গে 'শান্তি বাহিনী' ছিল অঙ্গাঙ্গিভবে জড়িত। বলতে গেলে সংগ্রামে একে অন্যের পরিপূরক। এই প্রসঙ্গে প্রয়াত এড্‌ভোকেট ত্রিপুর সেন লিখিত — "Tripura in Transition, 1923-1957 A. D. পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন" To resist these atrocities created by troops a strong volunteer corps was formed under the banner of 'Santi Bahini'. It had banner of 'Gana Mukti Parisad' which was a red one with a star mark in the middle of it. This Bahini received whole hearted support of the people in general in hills. They challenged the Military forces with their ancestral ratchlock guns. The Govt. of Tripura declared Military Administration over the entire Khowai Division in Tripura State Gazette dated the 9th March of 1949 corresponding to the 26th Falgoon of 1358 T.E. ....." এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য — ১৯৪৯ ইং সনের ১৫ই অক্টোবর — "স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য" নাম অবলুপ্ত হয়ে ভারত ডোমিনিয়িনে যুক্ত হয়ে যায়। এই সংযুক্তিকরণের পূর্বেই ত্রিপুরার মহারাজ সৃষ্ট নিজস্ব সামরিক বাহিনী 'ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস্' ভেঙে দেওয়া হয়। এই সৈন্য বাহিনীতে ত্রিপুরার বহু উপজাতি যুবক ছিল। এরা ভেঙে দেওয়া বাহিনী থেকে এদের কাছে যা যা অস্ত্র, বন্দুক ছিল সেগুলি নিয়ে তারা নিজ নিজ পাহাড়ী বাসস্থানে চলে যান। মুক্তি পরিষদের কর্ণধার দশরথ দেববর্মা ঐ সুযোগে উক্ত পাহাড়ী যুবকদের তাদের অস্ত্র নিয়ে গঠন করেন শান্তি বাহিনী নামক "গেরিলার ফৌজ"। এই বাহিনীতে ছিলেন- বিদ্যা দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, দীনেশ দেববর্মা, প্রবীর দেববর্মা, তখিরাম দেববর্মা, বিধুকুমার দেববর্মা, পদ্মমোহন দেববর্মা, মুকুন্দ দেববর্মা, নবকুমার দেববর্মা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় যুবক দল। এই প্রসঙ্গে দশরথ দেব লিখিত মুক্তি পরিষদের ইতিকথা পুস্তকে ৬৫ পৃঃ লিখেছেন যে গেরিলা ইউনিট গঠন করেই মুক্তি পরিষদের নীতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা এবং লড়াইয়ের কৌশল সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য দশরথ দেববর্মাকে নিয়ে যাওয়া হতো প্রত্যেক ইউনিটে। সঙ্গে থাকতেন রবীন্দ্র দেববর্মা। প্রাথমিক ক্লাশ করার পর খোয়াই বিভাগে সব সময় যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব রবীন্দ্র দেববর্মার

হাতে দেওয়া হত। খোয়াই পশ্চিম পার এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিকরা স্থানে স্থানে গিয়ে প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করেন .... ইত্যাদি। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান করেছে। নতুন চীফ কমিশনার হয়ে এসেছেন অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রাজত্বে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গেরিলাদের সবচেয়ে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৪৯-৫২ ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশে দেখা দিয়েছিল দুর্দিন। সেই সময়ে তেলেঙ্গানা বীর কৃষকদের বিদ্রোহ নারকীয়ভাবে দমন করার নায়ক ভি নানজাপ্পাকে ত্রিপুরায় পাঠানো হয় — দশরথ দেববর্মা পরিচালিত আদিবাসীদের আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রামকে দমন করতে। আন্দোলন ও সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছে। ১৯৫০ সালে ত্রিপুরার পাহাড়, গ্রাম-গঞ্জে যখন পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচার চরমে পৌঁছায়, কংগ্রেস মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল মুক্তি পরিষদের আন্দোলনের কুৎসা রটিয়ে নাম দেয় 'বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন'। এই যে অপবাদ এ যে কতখানি শত্রুতামূলক ছিল পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পাঠায় নৃপেন চক্রবর্তী, ডাঃ বিজয়কুমার বসু, বিপুল চৌধুরী ও শ্রী মৈত্র নামক চারজন কমরেডকে। প্রথমে আসেন ডাঃ বসু, বিপুল চৌধুরী (ছদ্মনাম মোহন চৌধুরী) ও কমঃ মৈত্র গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পলাতক অবস্থায় আগরতলা প্রফুল্ল সেনগুপ্তের (প্রবন্ধকারের পিতা) বাড়ীতে। এঁদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট কানু সেনগুপ্তের (প্রবন্ধকারের অগ্রজ) উপর। ডাঃ বসুর কাজ ছিল 'সংগ্রামে' আহতদের চিকিৎসার জন্য। মোহন চৌধুরীর উপর দায়িত্ব ছিল শান্তিবাহিনী তথা সেনাবাহিনীকে গেরিলা কায়দায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং কমঃ মৈত্র ছিলেন অস্ত্র তথা বন্দুক সরবরাহ করার জন্য। গভীর রাতে গোপনে দুর্গা চৌধুরী পাহাড়ের মুক্তি পরিষদের লোকেরা এসে দেখা করতেন।

ইতোপূর্বে দশরথ দেববর্মা ১৫ই জুলাই ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভের জন্য দরখাস্ত করেন। পার্টির নিয়মাবলীতে পুরাতন দু'জন রেড কার্ড হোল্ডার সভ্যকে প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসাবে দেখাতে হতো। সেই বিধিমত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসামের প্রাণেশ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে বড়মুড়া পাহাড়ের এক গোপন স্থানে দশরথ দেববর্মা প্রার্থীর প্রস্তাবক কমঃ বেণু সেন (প্রবন্ধকারের অন্যতম অগ্রজ), দ্বিজু আচার্য সই করেন। উক্ত সভায় আরো তেইশ জন পার্টি সভ্যপদ প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে সদ্য পার্টি সদস্য কমঃ দশরথ পলাতক অবস্থায় বীরেন দত্তকে নিয়ে কলকাতা যান। এক গোপন স্থানে কমঃ ডাঙ্গে, কমঃ রাজেশ্বর রাও, কমঃ ভবানী সেন, কমঃ সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান কমঃ কানু সেনগুপ্ত। তখন 'দশরথের' গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার। এমতাবস্থায় এভাবে চলা সত্যিকারের বিপ্লবী চেতনাবোধ না থাকলে হতো না। ১৯৫২ সালে কমঃ দেব পূর্ব ত্রিপুরার সংরক্ষিত আসনে লোকসভার প্রার্থী ছিলেন, পলাতক অবস্থায় এই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন। কমঃ দেবের ইলেকশান এজেন্ট ছিলেন কমঃ বেণু সেন। ১৯৫০ সালের কোন এক সময় সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ আসে। পলাতক অবস্থায় কলিকাতায় কোন এক গোপন আস্তানায় কমঃ ডাঙ্গে, কমঃ রাজেশ্বর রাও, কমঃ ভবানী সেন এবং কমঃ সোমনাথ লাহিড়ীর সাথে একত্রে মিলিত হন কমঃ দশরথ দেব। দুই দিন এই আলোচনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে

যোগাযোগ ও দেখা করানোর দায়িত্বে ছিলেন কমঃ কানু সেন। আলোচনা শেষে পলাতক অবস্থায় ত্রিপুরায় ফিরে আসেন কমঃ দেব।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে কমঃ দশরথ দেব বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর কমঃ ডাঙ্গে ত্রিপুরায় এসে তদানীন্তন চিফ্ কমিশনার শ্রীনানজাপ্পার সহিত দেখা করে কমঃ দেবের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানান কিন্তু কোন ফল হয় না। পলাতক অবস্থায় কমঃ দেব কলিকাতা যান এবং সেখান থেকে দিল্লী গিয়ে পার্লামেন্টে উপস্থিত হন। পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্য প্রবলভাবে দাবি উত্থাপিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কমঃ দেবের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হয়। কমঃ দেব প্রকাশ্যে দিল্লী থেকে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। দ্বিতীয় বার পার্লামেন্টে যোগ দেওয়ার পূর্বে কমঃ দেব তাঁর স্ত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেবীকে আগরতলার মধ্যপাড়ায় কানু সেন, বেণু সেন ওদের বাড়ীতে (প্রবন্ধকারের বাড়ী) দশদিনের জন্য রেখে যান। পাহাড়িয়া উপজাতি জীবন থেকে সাধারণ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত এবং আচার-ব্যবহার শিক্ষার জন্য। এই বাড়ী থেকেই কমঃ দেব মঙ্গলেশ্বরী দেবীকে নিয়ে দিল্লী চলে যান। ১৯৮৪ সালের ২রা জুন মধ্যরাত্রে প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্তের মৃত্যু হয়।

এদিন সারাদিন ও রাত্রি কমঃ দশরথ খুবই অসুস্থ ছিলেন— একজন ডাক্তার দুইজন নার্স ও অন্যান্যরা সারারাত কমঃ দেবকে শুশ্রূষা করেন। পরের দিন ৩রা জুন সকাল নয়টায় কমঃ দেব তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে প্রয়াত প্রফুল্ল সেনগুপ্তের মৃতদেহের পাশে হাজির, তখন কমঃ দেব খুবই অসুস্থ, চলার শক্তি ছিল না, ৩/৪ জনে একত্রে তাঁকে উপরে নিয়ে আসতে হয়। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাড়ীর সবাই এ অবস্থায় কেন এসেছেন বলায় কমঃ দশরথ দেব অশ্রুসজল নেত্রে বলতে থাকেন এই বাড়ী আমাদের পার্টির আদি পীঠস্থান। আর এই মৃত ব্যক্তি ছিলেন আমাদের পরিত্রাতা ও অভিভাবক। এঁর শেষযাত্রায় আমার শেষ শ্রদ্ধা জানাব না তা কি হয় ?

প্রবন্ধকারের সঙ্গে কমঃ দশরথ দেবের ১৯৫২ সাল থেকে পরিচয় ঘটে ও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে সমগ্র পাহাড়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি যখন পড়তে শুরু করেছিল এর সত্যানুসন্ধান ও প্রাথমিক আলোকচিত্র তুলে বিশ্ব জনমতের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর যে কি আকুতি সেকথা এখন হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে। ১৯৫৬ খ্রীঃ ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার ও রাজন্য যুগ থেকে এর সার্বভৌমত্বকে অবলুপ্ত করার কংগ্রেসী যে চক্রান্ত তাকে রুখে দেবার শক্তি ও যোগ্য নেতৃত্ব সেদিনের লোকসভা সদস্য কমঃ দশরথের দেবের ভূমিকা স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ থাকবে। তেমনি ১৯৫৯ সালে ভারতে প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদকে কংগ্রেস সরকার অবৈধভাবে খারিজ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে আগরতলা আসেন এবং প্রবন্ধকারের পিতার আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সেখানেও দেখেছি কমঃ দশরথ দেব-কে কমঃ নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রবন্ধকারের গৃহীত আদিবাসীদের সংস্কৃতিমূলক আলোকচিত্র নিয়ে গভীর আলোচনা করতে। ১৯৭৮ সালে জলন্ধরে পার্টির দশম কংগ্রেসে প্রবন্ধকারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম' ও চিত্র সাংবাদিক রূপে। ওখানেও কমঃ দশরথের একান্ত সান্নিধ্য ও সাহচর্য আমাকে করেছে অভিভূত।

আজ তাঁর মহাপ্রয়াণে অন্তরের শ্রদ্ধা, গভীর ভালবাসা ও রক্তিম বৈপ্লবিক অভিবাদন জানিয়ে বলতে চাই — 'তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' ●

[ডেইলি দেশের কথা ২৭-১০-৯৮]

সেই কদিন তাঁকে যেমন দেখেছি



হারাধন দেবনাথ

একটি কাজের সাথে সবসময়ে লেগে থাকতে হয়। প্রশাসনে কি সবাই সি পি আই (এম)-এর সদস্য যে তুমি না তাগাদা দিলেই কাজ হয়ে যাবে ? জনগণের প্রতিটি আবেদনপত্রকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার তাঁর নির্দেশ ছিল সবার প্রতি।

কমরেড দশরথ দেব তখন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় যোগ দিতে মহাকরণ থেকে পার্টি অফিসে আসছিলেন। আমি গাড়িতে তার পাশে বসে বললাম আপনার সি এ হিসেবে কাজ করার জন্য সরকারীভাবে কাগজ পেয়েছি। এক গাল হেসে চটপট বললেন — 'ভালই হয়েছে। তবে না পারলে কিন্তু আবার পত্রিকা অফিসে ফেরৎ পাঠাব'।

সেদিনের পর প্রায় সাড়ে চার বছর কমরেড দশরথ দেবের সাথে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল। এত বড় মাপের নেতা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বজ্ঞানী লোকের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমার সবসময় ভয় হতো। সামনে গিয়ে কথা বলার সাহস দেখাতাম না। তিনি তা বুঝতেন। একদিন ডেকে নিয়ে বললেন, আমি তোমার বাবার মত। ভুল হলে শুধরে নেবে। ভয় পাবে কেন ? আর মনে রেখো ভয় পেলে জীবনে কিছুই শিখতে পারবেনা। সাথে চাই ধৈর্য।

'সম্ভবত', 'মনে হয়' ইত্যাদি শব্দ শুনলে তিনি ক্ষেপে যেতেন। তাঁর জীবনে ঐ 'সম্ভবত' শব্দের কোন মূল্য ছিল না। তিনি বলতেন, ধারণা করে কোন কাজ হয়না। স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে, যেটুকু জানবে তাই বলবে। বাড়তি কথা তাঁর পছন্দ ছিল না।

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে তিনি নিজেও চাইতেন এবং অন্যকে বলতেন। একবার রইস্যাবাড়ি থেকে ৮ জন জুমিয়া এসেছিলেন সাহায্যের আবেদন নিয়ে। তাঁকে এই খবর দেবার পর কালবিলম্ব না করে ২০০ টাকা করে সাহায্য মঞ্জুর করে দিলেন। বিকেল বেলায় জানতে চাইলেন তাদের সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে কিনা। আমি এর কোন উত্তর দিতে পারিনি। রেগে গিয়ে বললেন— তুমি আমলা হয়ে গেছ। একটি কাজের সাথে সবসময়ে লেগে থাকতে হয়। প্রশাসনে কি সবাই সি পি আই (এম)-এর সদস্য যে তুমি না তাগাদা দিলেই কাজ হয়ে যাবে ? জনগণের প্রতিটি আবেদনপত্রকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার তাঁর নির্দেশ ছিল সবার প্রতি।

আমি তাঁর সাথে যে সময়টা ছিলাম সে সময় তিনি ছিলেন অসুস্থ। মাঝে মাঝে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে যেতেন। নিজে পত্রিকা, পার্টির সার্কুলার ভালভাবে পড়তে পারতেন না। বেশির ভাগ কাগজপত্র আমি পড়তাম। ভোর পাঁচটায় উঠেই ডেইলি দেশের কথা পত্রিকার খোঁজ নিতেন। রোজ দিন পত্রিকার সম্পাদকীয় সহ সব খবর, এমন কি পাঠকের কথাও পড়তে হতো। তিনি কোথাও ভুল হলে ধরিয়ে দিতেন। অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও সমাবেশে লিখিত বক্তব্য রাখতেন। তিনি নোট দিলে আমরা বক্তব্য আকারে লিখে দিতাম। একদিন দুঃখ করে বললেন, তোমরা যা লিখে দাও তাই পড়ি। কিন্তু আমি যা যা বলতে চাই — তার অর্ধেক তোমরা লিখতে পারো না। সেই রাজনৈতিক জ্ঞান তোমাদের এখনো হয়নি। শুধু ডেইলি দেশের কথা নয়, সব পত্রিকা পড়ার উপর জোর দিতেন। বলতেন শত্রুপক্ষের বক্তব্য না জানলে আক্রমণ শাণিত করবে কি করে ? আকাশবাণী ও দূরদর্শনের খবর সব সময় শুনতেন।

তাঁর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে যেসব উগ্রবাদী হামলা ও অন্যান্য ঘটনা ঘটত তা আমরা সময়মতো জানিয়ে দিতাম। একবার পুলিশসূত্রে পাওয়া কোন সংবাদ তাঁকে জানালে তিনি বলতেন, পার্টি অফিস বা পত্রিকা দপ্তরে খবর নিতে। সব জায়গা থেকে খবর নিয়ে তারপর তিনি নিজের বিবৃতি দিতেন। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে কিছু কাউকে করতে দিতেন না। এটা তাঁর অসুস্থতার সময় অষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রেও নাম জেনে নিতেন— তিনি কী খাচ্ছেন, কেন খাচ্ছেন। ৯৪-র ১২ আগস্ট অমরপুরে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উদয়পুরে নিয়ে আসা হয়। আগরতলায় নিয়ে আসার বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। তিনি তাতে হস্তক্ষেপ করে বললেন, আগরতলায় চল। পরে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যও তাঁর মতামত জেনে নিতে হয়েছে। ফাঁকি দিয়ে বা চালাকি করে কিছু করার সুযোগ ছিলনা।

কমরেড দশরথ দেবের অসুস্থতার জন্য সরকারী বা পার্টিগত সভা তাঁর সরকারী বাসভবনে করা হত কোন কোন সময়। অনেক অতিথি, বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তারা বিশেষভাবে বিকেলবেলায় বাড়িতে যেতেন। হয়তো কাউকে সময় দেয়া হল বিকেল তিনটায়। কিন্তু তিনি আধ ঘণ্টা আগেই প্রস্তুত থাকতেন। কাউকে গিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হতো না। কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি সময়ের প্রতি নজর রাখতেন। একবার আমবাসায় একটি সরকারী কর্মসূচীতে রওনা হবার জন্য নির্ধারিত ছিল সকাল ১০টা। তিনি খাওয়া সেরে বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পৌনে ১০টায়ও না উঠতে দেখে আমরা নানা জল্পনা করতে লাগলাম। না তিনি ১০ মিনিট আগেই বিছানা ছেড়ে রেডি হয়ে গেলেন। ১০ টাতেই যাত্রা শুরু হল।

নোট বুককে তিনি দারুণভাবে গুরুত্ব দিতেন। আমার প্রতিও সে আদেশ ছিল। সকালবেলায় পত্রিকা পড়া শেষে নোট বই দেখে নিয়ে কর্মসূচী জেনে নিতেন। একেবারে সকালে কর্মসূচী থাকলে ডাক্তারকে বলে দিতেন সেইমত আসতে। ব্যক্তিগত ডাক্তার ডাঃ পি কে ভট্টাচার্য দু'বেলাই আসতেন।

সকাল সাড়ে দশটায় অফিসে যেতেন। তাঁর সচিবকে ডেকে ফাইল সই করে দিতেন। এরপর ি া বিভিন্ন জনের দেয়া আবেদনপত্র দেখার কাজ। কোন ফাইল যাতে অহেতুক জমে না থাকে তার জন্য বরাবর তাগাদা দিতেন। অসুস্থতার জন্য বিধানসভার অধিবেশনে যেতে পারতেন না। কিন্তু কর্মসূচী আগের দিন জেনে নিতেন। বিধানসভার ঘটনাবলী তাঁকে সবসময় জানাতে হতো। দেখতাম সব অফিসাররা তাঁকে ভয় পেতেন। নিজেরা বুঝে

নিতেন। কমরেড দশরথ দেবকে 'বোঝাবার' চেষ্টা করার সাহস দেখাতেন না। একবার এক অফিসার তাঁর প্রশংসা করে নানা কথা বলছিলেন। জবাবে কমরেড দেব বললেন, 'আমি কাজ চাই। কাজ করে দেখিয়ে দিন— আপনি ত্রিপুরাকে ভালবাসেন। আমার প্রশংসা করবার দরকার নেই'। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেখতাম— সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত নিতে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি বিরক্ত হতেন। অন্য কোন দপ্তরপ্রধান ফাইল নিয়ে গেলে তা তাঁর সচিব জানেন কিনা জেনে নিতেন। প্রয়োজনে মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাতেন। একটি কাজ দিলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খোঁজ নিতেন।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে জম্পুইজলায় অভিভাবকসহ অন্য অংশের জনগণকে নিয়ে একবার সভা ডাকা হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা। তাঁর ভাষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন— সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব লিখতে হবে। আমি বললাম, এটা তো স্থানীয় উদ্যোক্তারাই করবেন। তিনি বললেন, যা বলছি সেটাই কর। শেষে তাঁর থেকে নোট নিয়ে প্রস্তাব লিখে নিয়ে জম্পুইজলায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আসলে প্রস্তাব লেখা হয় নি।

অতিরিক্ত খরচ তিনি করতে দিতেন না। একবার তাঁকে বললাম— আপনার তো ফোন ধরতে কষ্ট হয়। তাই— আপনার সচিব বলেছেন, একটি মোবাইল ফোন কিনতে। তাহলে আপনার ফোন ধরতে সুবিধা হবে। তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন নেই। তোমরাই ফোন ধরে দিও। আমরা তাঁকে ফোন ধরে দিতাম। কোন কোন সময় তাঁর বক্তব্য আমরা ফোনে, লিখিত ভাবে যাকে জানানো প্রয়োজন তাঁকে জানিয়ে দিতাম। যাকে দিয়ে যে কাজ করানো উচিত অথবা করানো যাবে তাকে দিয়েই শুধু তিনি সে কাজ করাতেন। পার্টি-অফিস থেকে ভাতা নেয়া, অষুধের দোকানে টাকা দেয়া, পার্টির কাগজপত্র, বই পড়া, অফিসারকে ডেকে আনার কাজ আমাকে দিয়ে করাতেন। জনগণ, প্রশাসন, পার্টির সাথে তাঁর যোগাযোগ রক্ষার কঠিন কাজটি করতে গিয়ে অনেক ভুল করেছি অজ্ঞতার জন্য। তিনি বলতেন সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবে না। কার কাজ হবে, কার কাজ কেন হবে না তা বুঝিয়ে দেবে। কাউকে মিথ্যা বলে সাময়িক সময়ের জন্য খুশি করার প্রয়োজন নেই। অসুস্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের সাথে সবাই দেখা করতে পারতো না। তাই এই নির্দেশ ছিল আমাদের প্রতি। হঠাৎ করে কোন সংগঠন সরকারী বাসভবন ঘেরাও করলে, ধর্না দিলে বিচলিত হয়ে যেতাম। তিনি বলতেন, উপমুখ্যমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে। তারপর সবার আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। এজন্য খুব বেশি সময় লাগত না। এই অসুস্থতার মধ্যেও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নামে - ছদ্মনামে ডেইলি দেশের কথা ও সাপ্তাহিক দেশের কথায় প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখার কথা বললেই বলতেন আমি লিখতে পারিনা, হবে না— ইত্যাদি। কিন্তু যারাই গেছে সবক্ষেত্রে তাদের নিরাশ হতে হয়নি। তাঁর একটি বই লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নাতি-নাতনি সবাইকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেক্ কিনে দিতেন। নিজে খেতে পারতেন না। কিন্তু অন্যদের কিনে দিতেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই ছোট ছেলে টিপু মারা যায়। এরপর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সবসময় তাঁর মুখে শুনতাম 'টিপু নেই একথা ভাবতেই পারছি না।' মনে বেদনা নিয়েও অফিস করতেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রামচন্দ্রঘাট থেকে উপজাতি অংশের অনেক মানুষ তাঁকে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন। পুত্রহারা দশরথ দেব তাঁদের প্রতি

আহ্বান জানান— 'তোমরা বামফ্রন্টের সি পি আই (এম) প্রার্থীদের ভোট দিও। পার্টি ছাড়া জাতি-উপজাতি মানুষের ঐক্য রক্ষা হবে না। জীবন গেলেও পার্টি ছাড়বে না।''

খোয়াই, রামচন্দ্রঘাট থেকে অনেকে আসতেন তাঁর কাছে। এসে থেকেও যেতেন তাঁর বাড়িতে। অনেককে নিজের সামান্য ওয়েজ এর পয়সা থেকে গাড়ি ভাড়া দিতেও দেখেছি। সবাই সরকারী সাহায্য পেতেন না। কেন পাবেন না তা তিনি বুঝিয়ে দিতেন।

ছোট ছেলের মৃত্যুর পর একদিন সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ক'টা বাজে ? আমি বললাম, ৬টা। তাহলে পত্রিকা পড়ু ! সকালবেলায় ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা পড়া হয়ে গেছে বলে জানালাম। তিনি বললেন হয়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পত্রিকা পড়ার পর বুঝতে পারলেন আসলে এখন সকাল ৬টা নয়, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এ রকম তাঁর কেবলমাত্র বাড়িতেই হতো। অফিসে কোনদিন হয়নি। আমরা যারা তাঁর সাথে ছিলাম সবার খোঁজ তিনি নিতেন। যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি সময় নিতেন না।

নির্বাচনের সময়ও তাঁর ফলাফল জানাবার সময় তিনি রাত জেগে কাটাতেন। রাত দেড়টার সময়ও তিনি আমাদের কাছ থেকে ফলাফল জানতেন। যে কোন পার্টির মিছিল-সমাবেশ হলে তার খোঁজ নিতেন। বিরোধীরা কী বক্তব্য রেখেছে তা আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। এছাড়া বিশেষভাবে ক্রিকেট খেলা নিয়ে তাঁর দারুণ আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে ভারতের খেলা থাকলে কারা ব্যাট করছে, কত রান হয়েছে আচমকাই জিজ্ঞেস করে বসতেন। আর আমরা আম্‌তা আম্‌তা করে বকুনি খেয়ে মরতাম।

তাঁর একটি স্যুটকেস ছিল। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তিনি এটি নিয়ে যেতেন। স্যুটকেসে থাকত কিছু প্রয়োজনীয় অষুধ ও ইনজেকশান। হঠাৎ ব্লাড সুগার বেড়ে বা কমে গেলে তিনি বুঝতেন। সেইমত গ্লুকোজ বা অষুধ খেয়ে নিতেন। নিজেই ইনজেকশান পুশ করতেন। এ সবের সাথে একটি টর্চলাইট, কিছু কাগজ, মানিব্যাগ, একখানা লুঙ্গি সাজানো থাকতো ঐ স্যুটকেসে। নিজেই পরপর এগুলি সাজিয়ে নিতেন। যে কাউকে ধরতে দিতেন না এই স্যুটকেসটি।

কাজের সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে না পারায় একদিন বিকেলে আমি তাঁকে বললাম- আমি আর এখানে থাকবো না। পত্রিকা অফিসে চলে যাব। তিনি বললেন – 'তোমার কথায় হবে নাকি ? পার্টির সিদ্ধান্ত যা তাই-ই হবে।' এরপর কিছুদিন চলে যাবার পর আরেকদিন বললাম আসলে আমার তো তেমন কোন কাজ নেই, তাই চলে যেতে চাইছি। এবার তিনি বললেন, আমি তো তেমন কাজ করতে পারছি না, তুমি তেমন কাজ কোত্থেকে করবে ? আমি সে সময় আর বলার কিছু খুঁজে পাইনি।

একবার তাঁকে একটি ভুল সংবাদ দিয়ে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এবার তাঁকে কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম, আমি আর থাকব না। চলেই যাব। তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং বললেন ''আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। তোমাকেও থাকতে হবে না।''

আজ এ কথাই বার বার মনে পড়ছে। তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। তাঁর প্রতি শোক শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁর সামনে তাঁকে কোনদিন শ্রদ্ধাও জানাবার সাহস হয়নি। বকুনির ভয়ে। আজ জানাচ্ছি কমরেড দশরথ দেব— তোমায় লাল সেলাম। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

ভালোবাসার মানুষ, শ্রদ্ধার মানুষ



প্রবীর সরকার

দশরথ দেব শুধুমাত্র তথাকথিত একজন রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি প্রচলিত রাজনীতির বিকল্প রাজনীতির অংশীদার ছিলেন, পথিকৃৎ ছিলেন, পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

ভালোবাসার বেশি ভালোবাসা যাঁদের প্রাপ্য, শ্রদ্ধার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা যাঁরা দাবী করতে পারেন, সম্মানের অতিরিক্ত সম্মান যাঁরা পেতেই পারেন তেমন একজন মানুষ আমাদের সামনে থেকে চলে গেলেন। যিনি একাধারে ছিলেন আমাদের অভিভাবক, পথপ্রদর্শক, সহযোদ্ধা এবং শিক্ষকও। ত্রিপুরার অবিসংবাদী জননেতা, 'রাজা' দশরথ দেব চলে গেলেন। তাঁর নামটি উচ্চারণের সাথে সাথেই পর্বতপ্রমাণ আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় জাগে, প্রতিকূলতাকে পায়ে দলে ভয়কে জয় করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জাগে। এই পর্বততনয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই ছোট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরায়। আবহমানকাল ধরে পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর, উপজাতিদের মধ্য থেকে এমন একজন সংগ্রামমুখর লড়াকু, সম্প্রীতিপ্রিয়, মানবতাবাদী মানুষের অভ্যুত্থান হয়তো কল্পনাও করা যেতো না যদি দশরথ দেব গতকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে না থাকতেন। যে উপজাতি সমাজ ছিলো পতিত জমির মতো, যেখানে শুধুমাত্র কাঁটা গুল্ম আগাছাই জন্মাতো, কোথাও বা তাও নয়, শুধুই ব্রহ্মডাঙা, রূঢ় মৃত্তিকা। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর বঞ্চনাই যে উপজাতিদের ভাগ্যলিপি তারাই অবশিষ্ট ভারতকে উপহার দিলেন অবিসংবাদী এই মানুষটিকে। শুধুমাত্র ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি, সংঘশক্তির কাছে অসীম আনুগত্য, দুর্জয় সাহস, অপরিমেয় শ্রম এবং আদর্শ চেতনাকে ক্রমাগত প্রয়োগ করতে করতে খোয়াই -এর আমপুরায় জন্ম নেয়া মানুষটিই হয়ে উঠলেন এক পর্বত-প্রমাণ ব্যক্তিত্ব। সারা ভারতের অগ্রসর আকাঙ্ক্ষী মানুষ তাঁর নামে চঞ্চল হয়ে উঠতো ঐসব চারিত্রিক গুণাবলীর সমাহার দেখে। নিজ সমাজশিক্ষা, সমাজসংস্কার, সমাজ মুক্তির চড়াই-উৎরাই ভরা পথ বেয়ে বেয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন শোষণমুক্তি মানবমুক্তির সরণী-তে যে সরণী আ-বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।

মাও সে তুং বলেছিলেন কোন কোন মৃত্যু পাখীর পালকের চেয়েও হালকা। কোন কোন মৃত্যু, খাই পাহাড়ের থেকে ভারী। জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুই। কিন্তু সেই মৃত্যু যদি জনগণের জন্য আত্মত্যাগ, যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আত্মদান,

যদি সবার বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার জন্য ব্যয় করে ইতিহাস হবার আকাঙ্ক্ষায় জীবন দান হয় তবে সে মৃত্যু নিশ্চিতভাবেই খাই পাহাড়ের মতোই ভারী। প্রবহমানতার কাছে, দোলাচলতার কাছে, অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণকারী ছাড়া আর যে কোন মানুষই কামনা করেন তেমন মৃত্যুকে। সবাই পারেন না, কেউ কেউ পারেন তেমন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। ঐসব মুষ্টিমেয়র মধ্যে দশরথ দেব শুধু অন্যতমই নন, অনন্যও।

দশরথ দেবের মৃত্যু-সংবাদ শোনার সাথে সাথেই আনন্দমঠের শেষ লাইনটি মনে পড়ে 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।' দশরথ দেব শুধুমাত্র তথাকথিত একজন রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি প্রচলিত রাজনীতির বিকল্প রাজনীতির অংশীদার ছিলেন, পথিকৃৎ ছিলেন, পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যে রাজনীতিতে জনগণই প্রথম এবং শেষ কথা। তাই আপামর জনতা এবং জননেতা দশরথ দেবের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোনকালেই ঘটেনি, তাঁকে যান্ত্রিক যেমন করেনি তেমনি জনগণের শক্তিতে অবিশ্বাসী করেনি। এর মধ্যে কোন রহস্য ছিলো না। ভালোবাসা, মানবতা, নিষ্ঠা, চেতনা এবং সংগ্রামের মোহনায় পরিণত হয়েছিলো তাঁর জীবন। যেখানে জাতি-উপজাতির ভেদাভেদের সংকীর্ণতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধ তাগিদ, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির হীনতা কিংবা ব্যক্তিতান্ত্রিকতার উন্মেষ ঘটাতে পারেনি। তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন তিলেতিলে। চৌদ্দ বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেও পৌঁছে গিয়েছিলেন আইন পড়া কিংবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনে ফিরে এসেছিলেন এই ত্রিপুরাতেই— অশিক্ষার জগদ্দল পাথর ভাঙবেন বলে, কুসংস্কারের পাহাড়কে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। কোন কোন মানুষ আসেন যাঁরা আত্মীয়করণের আগ্রহে, আকর্ষণের ক্ষমতায়, অধ্যবসায়ের জোরে, সৃজনশীল প্রতিভায় উজ্জীবনের দ্যুতিতে পাঁচ জনের মধ্যে থেকেও হয়ে উঠেন প্রথম, চলে আসেন একেবারে সামনের সারিতে। দশরথ দেবও ছিলেন তেমন একজন নেতৃত্ব তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলো, মৃত্যুভয় পদানত হয়েছিলো। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই আরো বড় সংগ্রামের মোহনায় উপনীত হয়েছিলো তাঁরই হাত ধরে --- শোষণমুক্তির সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরে চেতনার সর্বোচ্চ সোপানে সশস্ত্র সংগ্রামে। আবার বাস্তবতার অমোঘ আহ্বানে পা রেখেছেন সংসদীয় অঙ্গণে। নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে এগুলোর মতো প্রতিভা ও উদ্যম ছিলো বলেই দ্বিধাহীনতার মতো মহার্ঘ গুণ ছিলো তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী। আপোষহীনতাও ছিলো অস্থি মাংস মজ্জা ও মেধায় সংক্রমিত। ফলে মানুষের ভালোবাসা ও আস্থার অভিধা 'রাজা' যুক্ত হয়েছে তাঁর নামের আগে। 'রাজা দশরথ' কিন্তু জনতার সঙ্গ ছাড়েন নি। সংসদের বাইরে, আন্দোলনের ময়দান সমাবেশের মঞ্চে, মন্ত্রিত্বের ঘেরাটোপে বিধানসভার চৌহদ্দিতে সর্বত্রই জনগণই ছিলো তাঁর ভাবনার চালিকা শক্তি। সরোজ মুখার্জী লিখেছিলেন 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কত রাজনীতিবিদ যে বিকৃত ও ভ্রান্ত অজ্ঞতার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বহারা বিপ্লবের সর্বনাশ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।' দশরথ দেবের জীবনে বিকৃতি ও ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি, মার্কসবাদকে ব্যবহারও করেননি ব্যক্তিস্বার্থে। যদি তেমন ঘটতো তাহলে ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র অন্যরকম হতো। চোখের সামনে দেখেছেন কিভাবে সংখ্যাগুরু উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন, কিভাবে এ রাজ্যে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা নানা অব্যবস্থার শিকার হয়েছেন, কিভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্ট মুসলমানরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন (কমলপুরে), কতভাবে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়েছে শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে, দেখেছেন জাতি-উপজাতি দাঙ্গার লেলিহান অগ্নিশিখা, শ্বেত সন্ত্রাস

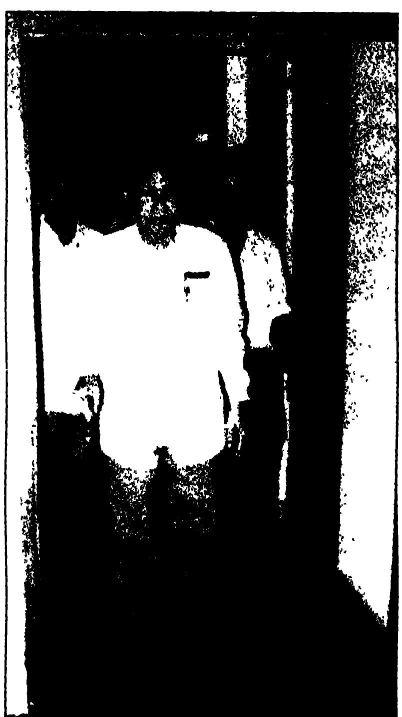
ও মতাদর্শগত সংগ্রাম। কিন্তু কখনোই বিভ্রান্ত হননি, সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দক্ষ নাবিকের মতো। আর এ সবের মুখোমুখি হয়েই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন মানবতার সদর দরজায়, আন্তর্জাতিকতার সিংহদুয়ারে। শুধু তো রাজনীতিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে তাঁর ছিলো উজ্জ্বল উপস্থিতি। ককবরক লিপি বির্তকে তাঁর গবেষণা ও সৃজনশীলতা ভাবীকালেও স্থান গ্রহণীয় থাকবে।

জরা, ব্যাধি, মৃত্যু জীবনের অন্তিম সত্য। তবু দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করছিলেন ব্যাধির সাথে সারা জীবনের আপোষহীন জীবনচর্চার মতোই। তবু মৃত্যুতে তাঁর জীবন চলা সমাপ্ত হলো।

জাতি-উপজাতির মৈত্রীর সেতু, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক, আন্তর্জাতিকতা-বাদের অগ্রণী সৈনিক দশরথ দেব প্রয়াত হলেন এমন এক সময়ে যখন নানা টানাপোড়েনে দেশ ভারাক্রান্ত, নীতিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের অভাব প্রকট, জনগণকে বোকা বানানোর প্রতিযোগিতায় সবাই কৌশল রচনায় ব্যস্ত। সাম্প্রদায়িকতার ও মৌলবাদের বিষবাষ্পে দেশ হাঁস-ফাস করছে, যখন রাজ্যের অভ্যন্তরে অশুভ শক্তিগুলি জোট বাঁধছে উন্নয়নকে থমকে দেবার জন্য, বিদেশী মদতপুষ্ট শ্বাপদরা রক্তলোলুপ হায়নার উল্লাসে মত্ত, জাতি-উপজাতির মৈত্রীর এই পুণ্যভূমিতে দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্তে উন্মত্ত পাহাড়ের সমতলের কুচক্রীরা এ সময় তিনি চলে গেলেন।

তাঁর মৃত্যুর ক্ষতির শূন্যতা আমাদের বহুদিন ধরে পূরণ করতে হবে। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৭-১০-৯৮]



১৯৯৩ — মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সচিবালয়ে

কিভাবে দেববর্মা থেকে দেব হলেন



ত্রিপুরার অবিসংবাদী জননেতা কমরেড দশরথ দেববর্মার পদবীর দেব হয়ে যাবার পেছনেও রয়েছে এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারতের প্রথম লোকসভার নির্বাচন। তাঁর মাথায় তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। জীবিত-মৃত ধরে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো জওহরলাল নেহরুর সরকার। সাধারণ নির্বাচনে পার্টি (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) তাঁকে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসন থেকে প্রার্থী করে। আত্মগোপন অবস্থায় লোকসভায় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর করতে গিয়ে দেখেন ভোটার তালিকায় পদবী দেব উঠেছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পদবী সংশোধনের জন্য আর কোন সুযোগ ছিলনা। সেই থেকেই কমরেড দশরথ দেববর্মা দশরথ দেব হিসাবে পরিচিত হয়ে যান। তিনি তাঁর 'মুক্তি পরিষদের ইতিকথা' বইয়ে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন।

কেন তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল ? ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি গড়ে শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা রাজ্যে। এরপর গড়ে তোলেন ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। পরে নামকরণ হয় ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ। বর্তমানে যা ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ নামে পরিচিত।

শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের সময়েই ত্রিপুরার মহারাজা টের পেয়েছিলেন জনশিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিক্ষাবিস্তার বা সমাজসংস্কার নয়— এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরো গভীরে। আন্দোলনের পেছনে কমিউনিস্টদের সমর্থন মহারাজা বীর বিক্রমকে বিচলিত করে তোলে। তিনি সংগঠন ভাঙ্গার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৯৪৮ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গড়ে উঠে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই গণমুক্তি পরিষদের নেতাদের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর এবং আইন পড়া ছেড়ে দশরথ দেব ঝাঁপিয়ে পড়েন মুক্তি পরিষদের আন্দোলনে। শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। ৫২ সালে সংগঠন সেই সংগ্রামে বিরতি ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল এই চার বছর আত্মগোপন অবস্থায় থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানো, জয়লাভ এবং আত্মগোপন অবস্থাতেই সংসদে অংশগ্রহণের সময়ে এক রোমাঞ্চকর বিপ্লবীর জীবন আমরা খুঁজে পাই। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে কি করে সংসদে



সুরেন্দ্র পাল

ত্রিপুরার দরিদ্র সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেব এবং তার সহকর্মীরা যে মুক্তির শিখা প্রজ্জ্বলন করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতেই ত্রিপুরা আজ গণ আন্দোলনের এক শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে সারা দেশের সামনে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করছে।

১৯৫২ সাল। সদ্য স্বাধীন ভারতর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরাও ভারতভুক্ত হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী করা হল জনপ্রিয় উপজাতি নেতা কমরেড দশরথ দেববর্মাকে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তখনও পুলিশের হুলিয়া জারি রয়েছে। দশরথ দেববর্মাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেয়ার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে হুলিয়া জারি করেছে কংগ্রেসী প্রশাসন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। প্রচারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন পার্টি-কর্মী এবং বিশেষ করে গণমুক্তি পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এদিকে দশরথ দেববর্মাকে ধরতে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী তাদের তৎপরতা আরও বাড়িয়ে তুলল। কিন্তু ওরা দশরথ দেববর্মার হদিশ বের করতে পারল না। নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত কেন্দ্রে কমরেড দশরথ দেববর্মা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ আসনে কমরেড বীরেন দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে বিপুলভাবে বিজয়ী হলেন। আত্মগোপন অবস্থায় দশরথ দেববর্মার এই বিপুল বিজয়ে প্রমাদ গুনল পুলিশ এবং প্রশাসন। তৎকালীন কংগ্রেস প্রশাসন ঠিক করল দশরথ দেববর্মাকে কোনভাবেই ত্রিপুরা থেকে বের হতে দেবে না। সাংসদ হিসাবে শপথ নেয়ার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। এইজন্য ত্রিপুরা থেকে বের হওয়ার সমস্ত রাস্তায় এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের যেসব গোপন রাস্তা কমিউনিস্ট পার্টি এবং নেতা কর্মীরা ব্যবহার করতেন সেসব রাস্তায় কড়া পুলিশ পাহারা বসানো হল। কিন্তু এতসব করেও কমরেড দশরথ দেববর্মাকে ওরা আটকাতে পারেনি। পার্টি নেতৃত্ব পুলিশের চোখে টুপি পরিয়ে তাঁকে প্রথমে কলকাতা নিয়ে যায়। কমরেড মুজফ্ফর আহমেদের তত্ত্বাবধানে সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এখানেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয় ছিল। এমনকি রেলওয়ে পুলিশকেও সতর্ক রাখা হয়েছিল দশরথ দেববর্মা সম্পর্কে। প্রতিপদে ধরা পড়ার আশঙ্কা নিয়েই কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ দশরথ দেববর্মাকে দিল্লী পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

গত ১৭ আগস্ট ('৯৮) খোয়াই পার্টি অফিসে বসে রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ার সূচনা পর্বের কিছু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এসব কথা বলছিলেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রঞ্জন

রায়। রঞ্জনদা বললেন কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়াও কমরেড দশরথ দেববর্মার পক্ষে সহজ ছিল না। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ তাকে স্যুট বুট কিনে দিলেন। এই পোষাকে কমরেড দশরথ দেব আপাদমস্তক সাহেব বনে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একজন পার্টি কর্মীকে অফিসার সাজিয়ে ট্রেনে পাঠানো হল দিল্লীতে। রাস্তায় পুলিশ কোন সন্দেহই করতে পারল না। দিল্লীতে পৌঁছেই তিনি দেখা করলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সংসদীয় নেতার সাথে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রঞ্জন রায় বললেন শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি কমরেড দশরথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি করে এলে? দশরথ দেব নাকি উত্তরে বলেছিলেন — সেটা তোমার পুলিশকে জিজ্ঞাসা করাই ভাল। এভাবেই কমরেড দশরথ দেব জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আত্মগোপন অবস্থায় থেকেও দিল্লীতে পৌঁছে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সাংসদ হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন।

কিন্তু একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে শপথ নেয়ার পরও ত্রিপুরার তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দশরথ দেববর্মার বিরুদ্ধে জারি করা হুলিয়া সহজে প্রত্যাহার করে নেয়নি। পরে দিল্লীর নির্দেশে এরা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল করেছিল। দশরথ দেববর্মা সাংসদ হিসাবে শপথ নিয়ে রাজ্যে ফেরার পর খোয়াই শহরে পার্টির ডাকে বের হল বিরাট মিছিল। তখন একটাই দাবি দশরথ দেববর্মা সহ জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বিনা শর্তে প্রত্যাহার করতে হবে। উত্তাল মিছিল যখন খোয়াই এস ডি ও অফিস অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন খোয়াই থানার দারোগা এসে হাত তুলে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, রঞ্জনবাবু আপনারা আর মিছিল করবেন না— ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার হয়েছে। পরে খোয়াই-র লালছড়া মাঠে বিরাট জনসমাবেশে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন কমরেড দশরথ দেববর্মা, কমরেড হেমন্ত দেববর্মা এবং রামচরণ দেববর্মা প্রমুখ জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতা যাদের বিরুদ্ধে পুলিশের জারি করা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল হয়েছিল।

কমরেড রঞ্জন রায় বলছিলেন— ১৯৪৯ সালে আমি স্থায়ী ভাবে ত্রিপুরায় আসি। তার চেয়ে বরং বলা ভাল পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে ত্রিপুরায় বাঙ্গালীদের মধ্যে পার্টি গড়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। অবশ্য এর আগেও ত্রিপুরার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি পার্টির ডাক আনা-নেয়ার কাজ করতাম। আমি দেখেছি কমরেড দশরথের কথা ত্রিপুরার পাহাড়ীরা তখন বেদবাক্যের মতো মনে করত। তখন সামন্ত শাসন এবং মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে। তিতুন প্রথার (বেগার শ্রম) বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রিপুরার পাহাড়ীরা কমরেড দশরথকে বলতো 'লাম্প্রা' অর্থাৎ 'পথপ্রদর্শক'। বাঙ্গালীরা বলতো 'রাজা দশরথ'। কারণ পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বাঙ্গালীদের এখানে আশ্রয় দানের প্রশ্নে তাঁর ছিল মুখ্য ভূমিকা। এভাবেই তিনি এ রাজ্যের উপজাতি-অনুপজাতি উভয় অংশের মানুষের মিলনসেতু হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর পরবর্তী ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা। তাই আজ শোকের দিনে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করছি না।

ত্রিপুরার দরিদ্র সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেব এবং তার সহকর্মীরা যে মুক্তির শিখা প্রজ্জ্বলন করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতেই ত্রিপুরা আজ গণ আন্দোলনের এক শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে সারা দেশের সামনে আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করছে। আজ কমরেড দশরথ দেব নেই। কিন্তু ত্রিপুরা তথা সারা দেশের শোষিত, বঞ্চিত খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের সংগ্রামে তিনি যে উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন তা অমর হয়ে থাকবে। আগামী দিনের সংগ্রামে এটাই হবে আমাদের পাথেয়। ●

[ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]

ফিরে দেখা



রমা দাস

রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের নারীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের হাতিয়ারে পরিণত হয় গণতান্ত্রিক নারী সমিতি যার পেছনে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল কমরেড দশরথ দেবের।

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জনগণের মিলনের সেতু, এ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম স্থপতি কমরেড দশরথ দেব চলে গেলেন। বলা চলে এক বিশাল কর্মময় জীবনের অবসান ঘটলো। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের খেটে খাওয়া জাতি-উপজাতি শান্তিকামী গণতান্ত্রিক জনগণ একজন নির্ভরশীল অভিভাবককে হারালো। গণ-আন্দোলনে আস্থাশীল গ্রাম-পাহাড়ের উপজাতিরা হারালো তাদের একান্ত, একান্তই আপন 'রাজা' দশরথকে।

সত্তর দশকের গোড়ার দিক। আমি তখন রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের একজন কর্মী। কিন্তু পার্টিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে ছাত্র সংগঠন ছেড়ে আমাকে আস্তে আস্তে নারী সংগঠনের কাজের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। তাই গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছি। কমরেড মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা (কমরেড দশরথ দেবের স্ত্রী) গণতান্ত্রিক নারী সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। কৃষ্ণনগরে বর্তমান টি আর টি সি যেখানে, সেখানেই কমরেড দশরথ দেবের বাড়ী ছিল। প্রায়ই যেতাম। এর আগেও কমরেড দশরথ দেবকে বহুবার দেখেছি, বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু রাজ্যের গণ-আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতাকে কাছ থেকে দেখা বা কথা বলার সুযোগ সে সময়েই বেশি ঘটে।

ত্রিপুরার গণ-আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ করে এ রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার অদম্য আগ্রহ থাকতো। আবার নিজের অজ্ঞানতায় শঙ্কিতও থাকতাম প্রচণ্ডভাবে। কমরেড দশরথ দেবকে দেখেছি কত খোলা মনে সে সমস্ত লড়াই-আন্দোলনের কথা বলে যেতেন। দীর্ঘ ঘটনাবহুল সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, তারই খণ্ড-ক্ষুদ্র চিত্র — রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তখনকার সময়ে ত্রিপুরার উপজাতি নারীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঘটনাগুলোই বিশেষভাবে তুলে ধরতেন। বলতেন— যে কোন সংগঠনের কাজ করতে হলে, তার অতীতকে জানতে হবে। অতীত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যা তোমাকে বর্তমানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার উপজাতি নারীদের সংগ্রাম ছিল খুবই কঠিন এবং দুর্ধর্ষ।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের এই পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরা ছিল সামন্ত রাজাশাসিত রাজ্য। রাজন্য শাসনে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ ছিল বঞ্চিত ও নিপীড়িত। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া, দারিদ্র্য-দূরীকরণ, অধিকার সুরক্ষার কোন উদ্যোগই ছিল না উপজাতি রাজার। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, অত্যাচার, কুসংস্কার, অশিক্ষা যুগ - যুগ ধরে উপজাতি নারীদের জর্জরিত করে রেখেছিল।

সেই সময়ে কিছু শিক্ষিত উপজাতি যুবক উপজাতি জনগোষ্ঠীর এই বঞ্চনার মূল কারণ খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হলেন। তারা উপলব্ধি করেছিলেন উপজাতিদের নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্য এই বঞ্চনার মূল কারণ। এই বঞ্চনার মূলোচ্ছেদ করতে হলে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজটি প্রথম শুরু করা দরকার।

১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কমরেড দশরথ দেব, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখের নেতৃত্বে 'জনশিক্ষা সমিতি' গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে গ্রাম-পাহাড় উপজাতি পাড়াগুলোতে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে। 'জনশিক্ষা সমিতি'-র নেতৃত্বে নিরক্ষর উপজাতি নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় সামাজিক কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে উপজাতি নারী-পুরুষদের সচেতন করার কাজ শুরু হয়। এ কাজে প্রয়াত জননেতা কমরেড বীরেন দত্তও বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। জনশিক্ষা সমিতির এসব কাজকর্ম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তদানীন্তন রাজার পুলিশ প্রশাসন ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা একযোগে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পুলিশ প্রশাসন এই সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে। কিন্তু রাজা বা পুলিশ প্রশাসন জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্ম বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়। সংগঠনের নেতৃত্ব আত্মগোপনে থেকে তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে যান। রাজার বাহিনী উপজাতি পাড়াগুলোতে ব্যাপক অত্যাচার সংগঠিত করে এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ শুরু করে। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আত্মরক্ষায় কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ'। এই সংগঠন উপজাতি নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীদের ব্যাপক হারে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করে। সবচাইতে পিছিয়ে পড়া উপজাতি নারীদের এ সংগ্রামের প্রথম সারিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কমরেড দশরথ দেব সুদক্ষ পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন— সমাজের অর্ধেক অংশ যে নারীসমাজ, শোষণ-নির্যাতন সবচেয়ে বেশি ...দের আঘাত করে, তাদের পেছনে রেখে কখনই এই বিরাট সংগ্রামে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

বস্তুতপক্ষে মুক্তি পরিষদের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সবচাইতে পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর উপজাতিরা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আস্থা ঘোষণা করেন। ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন।

সামন্ত রাজার শাসনে ত্রিপুরায় 'তিতুন' (বেগার শ্রম) প্রথা নামে একটি বর্বরোচিত প্রথা ছিল। রাজকর্মচারীরা খাজনা আদায় বা অন্যান্য কাজের জন্য উপজাতি গ্রামে গেলে উপজাতি যুবকদের বিনা পারিশ্রমিকে রাজকর্মচারী বা পুলিশবাহিনীর

বোঝা বহন করার পদ্ধতিকেই বলা হত 'তিতুন' প্রথা। রাজকর্মচারীরা উপজাতিদের কাছ থেকে খাজনা হিসাবে তাদের জুমে উৎপাদিত ধান, চাল, তিল, কার্পাস, ফল, সবজি, গৃহপালিত পশুপাখি এমন কি থালা-বাসন পর্যন্ত জবরদস্তি কেড়ে নিত। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে হতো উপজাতি জনগণকে। উপরন্তু সংগৃহীত এ সমস্ত জিনিস বিনাপারিশ্রমিকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিতে হতো।

জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে চেতনার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 'তিতুন' প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়। এই বেগার প্রথার বিরুদ্ধে উপজাতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সংগ্রামে সামিল হন।

১৯৪৯ সালে একদল রাজকর্মচারী খাজনা ও 'তিতুন' আদায় করতে খোয়াই মহকুমার পদ্মবিলে গেলে ঐ গ্রামের উপজাতি যুবকরা 'তিতুন' দিতে অস্বীকার করে। রাজার পুলিশ বাহিনী উপজাতি যুবকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু উপজাতি যুবতীরা রুখে দাঁড়ায় এবং যুবকদের গ্রেপ্তারে বাধা দেয়। তারা রাজসৈন্যদের ঘেরাও করে ফেলে। সংঘর্ষ বাঁধে। উপজাতি রমণীদের ঘেরাও মুক্ত হতে সৈন্যরা গুলি চালায়। উপজাতি পল্লী পদ্মবিলের বুকে তিন উপজাতি রমণী কুমারী, মধুতী ও রূপশ্রী সৈন্যদের গুলিতে শহীদ হন।

এটা ত্রিপুরার গণ-আন্দোলনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রতিবছর ২৮শে মার্চ দিনটি সেই তিন বীরাঙ্গনার স্মরণে শহীদ দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। পদ্মবিলের এই ঘটনা সমগ্র রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের সংগ্রাম হিসেবে বারুদের মত ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ত্রিপুরা ভারতের সাথে যুক্ত হয়।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তি ঘটলেও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। তাই মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত থাকে।

দেশভাগের ফলশ্রুতিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপক বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুর স্রোত ত্রিপুরায় বইতে থাকে। জনসংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। রাজ্যের জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু উপজাতিরা নিজ রাজ্যে ক্রমে ক্রমে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগই নেয়নি। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য উপজাতিরা চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। উপজাতি মায়েরা নিজেদের জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে সরে গেছেন, কিন্তু বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মায়েদের আশ্রয় দিয়েছেন। চরম আত্মত্যাগের এ ধরনের নজীর ইতিহাসে বিরল। উদ্বাস্তু আগমন এবং তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন করে রাজ্যের উপজাতি অংশের জনগণকে এ আন্দোলনে সামিল করানোর ক্ষেত্রে কমরেড দশরথ দেবের অবদান অনস্বীকার্য।

উপজাতি মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে গোলাঘাটিতে ১৯৪৮ সালের ৯ই অক্টোবর মহাজনী শোষণ ও লেভী বিরোধী সংগ্রাম তীব্ররূপ ধারণ করে। এই সংগ্রামে উপজাতি নারীরা ছিল বিপুল সংখ্যায়। সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর মোকাবিলায় সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠে। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে নারীরাও শহীদ হন।

নূতন চেতনায় সমৃদ্ধ উপজাতি নারীরা ১৯৫১ সালে সদর মহকুমার দারোগামুড়ায় প্রথম রাজ্যভিত্তিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ত্রিপুরা রাজ্য নারী সমিতি'। সংগঠনের প্রথম

সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে নন্দরানী দেববর্মা ও কিরণপ্রভা দেববর্মা।

এই সংগঠন দ্রুত সারা রাজ্যে উপজাতি নারীদের মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং দেশভাগের ফলে ত্রিপুরায় আসা উদ্বাস্তু বাঙালী নারীদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯৬৪ সালের পরে সংগঠনের নাম পরিবর্তন হয়। গড়ে উঠে 'ত্রিপুরা রাজ্য গণতান্ত্রিক নারী সমিতি'।

এই সংগঠন গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে কমরেড দশরথ দেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই মূলত কার্যকরী হয়েছে।

'গণতান্ত্রিক নারী সমিতি' ক্রমশঃ রাজ্যের গণ-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চলে আসে। উপজাতি জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতি, অধিকার রক্ষা, জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলন অনুপজাতি অংশের নারীদের মধ্যে প্রেরণা জোগায়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংঘর্ষ যত তীব্র হতে থাকে অনুপজাতি নারীদের মধ্যে সংগঠনের প্রভাব তত ছড়িয়ে পড়ে।

রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের নারীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের হাতিয়ারে পরিণত হয় গণতান্ত্রিক নারী সমিতি যার পেছনে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল কমরেড দশরথ দেবের।

সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের দিনগুলিতে ত্রিপুরার উপজাতি নারীরা পুরুষদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা, শত্রুর গতিবিধির উপর নজরদারী করা, একস্থান থেকে অপর স্থানে বিপ্লবীদের গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করা, এসব কাজের পাশাপাশি অনেক উপজাতি রমণী অস্ত্র হাতে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে নারীদের সমানাধিকার অর্জন ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চেতনা সঞ্চারের ক্ষেত্রে জনশিক্ষা সমিতি ও মুক্তি পরিষদের অবদান অনস্বীকার্য।

রাজন্য শাসন অবসানের পরের এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যের গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিকশিত করার ক্ষেত্রে কমরেড দশরথ দেবের সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শ প্রতিনিয়তই সংগঠনের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

ত্রিপুরাকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে নিয়ে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠনের দাবীতে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুক্তি পরিষদের দীর্ঘ গণ সংগ্রামে উপজাতি নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফরেস্ট জুলুমের বিরুদ্ধে, মহাজনী দাদন ও লেভীর জুলুমের বিরুদ্ধে, খাজনা মুকুবের দাবীতে, উপজাতি সংরক্ষিত এলাকা বাতিলের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্বে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে উঠে। যার প্রথম সারিতে ছিলেন উপজাতি মায়েরা। ফরেস্ট জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন 'মোহিনী ত্রিপুরা'।

তৎকালীন জনবিরোধী কংগ্রেসী সরকারের নীতির ফলে রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পাহাড়ে উপজাতি পাড়াগুলোতে ব্যাপক অনাহার-মৃত্যু ঘটতে থাকে। অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকার গরীব কৃষকদের কাছ থেকে জবরদস্তি লেভী আদায় করতে থাকে। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় খাদ্য ও কাজের দাবীতে, ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা ঘোষণার দাবীতে এবং লেভীর জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম গণসংগ্রাম গড়ে উঠে। জাতি-উপজাতি উভয় অংশের নারীরা সেই দুর্বার গণসংগ্রামে সামিল ছিলেন। অবশ্যই উপজাতি নারীরা সংখ্যায় বেশি। পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন, উপজাতিদের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষাকবচ চার দফা দাবী

আদায়ের সংগ্রাম রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কমরেড দশরথ দেবকে দেখেছি এই সমস্ত আন্দোলনে নারীদের ভূমিকাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। মূল্যায়ন করতেন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্বে কত সংখ্যক জাতি-উপজাতি মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিটি আন্দোলনের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করতেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন— নারীদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করা খুবই কঠিন। কারণ আমাদের সমাজে নারীরা নানা ধরনের সামাজিক বাধা-নিষেধ ও কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ। কোন নারীকে তোমার আন্দোলনে নিয়ে আসার আগে তোমাকে তার সমস্যা বুঝতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। তবেই সে তোমার সংগ্রামের সাথী হবে।

১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় কং (ই) সরকার দেশব্যাপী অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে প্রচণ্ড দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়। ত্রিপুরায় গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব তখন কেউ জেলে, কেউ বা আত্মগোপনে। সে সময়ে সংগঠনের কাজে কমরেড দশরথ দেবের সঙ্গে যখনই দেখা করেছি, তখনই বলতেন— গ্রামে চলে যাও। এ সময়ে পাহাড়ী গ্রামগুলোই তোমাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

তিন দশকের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৯৭৮ সালে রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সংসদীয় রাজনীতিতে কমরেড দশরথ দেবের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি চারবার লোকসভায়, চার বার রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকারগুলোর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে সরকারী অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাকে গরীব মানুষের কল্যাণে সম্প্রসারিত করে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার পেছনে কমরেড দশরথ দেবের আন্তরিক ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁর গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৮০ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে রাজ্যের ক্ষমতালোভী কায়েমী স্বার্থবাজরা গভীর ষড়যন্ত্র করে এ রাজ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাঁধায়। সেদিন দাঙ্গাবাজরা কমরেড দশরথ দেবকেই সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্য করেছিল। কারণ দশরথ দেব ছিলেন এ রাজ্যের জাতি-উপজাতি সহ সমস্ত গরীব মানুষের নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা অপপ্রচার ছড়িয়ে বাজারি পত্রিকাগুলো দাঙ্গাবাজদের মদত জুগিয়েছিল। কিন্তু তাতে দশরথ দেব এতটুকু বিচলিত হননি। বরং রাজ্যের জাতি-উপজাতি মানুষের দীর্ঘদিনের ঐক্যের এই মেলবন্ধনকে ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালে জোট সরকারের শাসনকালে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের দিনগুলোতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তির উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে দুর্বার সংগ্রাম পরিচালনায় কমরেড দশরথ দেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ সময়েও উপজাতি নারীরা ছিলেন সংগ্রামের পুরোভাগে। খাদ্য চাইতে গিয়ে দামছড়াতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন নারীকর্মী চিমতে হালাম। উজান ময়দানে আসাম রাইফেলসের জোয়ানদের একাংশের দ্বারা উপজাতি নারীদের উপর সংঘটিত হয় গণধর্ষণ। পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যে এই বীভৎস ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষ-মহামারী সহ সমস্ত রকম অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের প্রধান সমস্যা সন্ত্রাসবাদ। নির্বাচনে পরাজিত জনবিচ্ছিন্ন কং(ই)-টি ইউ জে এস - টি

এন ভি সহ রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, দেশী বিদেশী গোয়েন্দাচক্র এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে। এতে রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতি, সুস্থিতি এবং উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। আজকের এই অস্থিরতায় রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ সময়ে কমরেড দশরথ দেবের চলে যাওয়া আমাদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। আজকে কমরেড দশরথ দেবের স্মরণে আমাদের শপথ নিতে হবে -- উগ্র জাত্যভিমানী সাম্প্রদায়িক ভেদ বিদ্বেষের ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সব ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে জাতি উপজাতি জনগণের সুদৃঢ় একতা গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই সংগ্রামেও নারীরা যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। ●

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



১৯৯৪ — তীর্থমুখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

তিনি আমাদের রাজা

সিরাজুদ্দীন আমেদ

তাঁর চোখে স্বপ্ন ছিল সমতার
বুকে ছিল এক আগ্নেয় পর্বত
স্ফুলিঙ্গ থেকে ছুটে আসত
বলিভিয়া ভিয়েতনাম
চে গুয়েভারার ডায়েরি
তাঁর স্মৃতিতে ছিল জনশিক্ষার লণ্ঠন

জুমের ধানের রৌদ্রকিরিচে
ভেসে উঠত এক নতুন পরিচয়ের মুখ
খরা ঝঞ্ঝায় বিম্বিত তাঁর গড়িয়া মামিতা
আর লেবাংবুমানির অব্যর্থ কাকলি
তাঁর শব্দে ছিল এক অভিনব
সূত্রধরের নির্মাণ কৌশল
সময়ের ঘড়িতে তাঁর বেজে উঠত
জ্যামিতির চড়াই-উৎরাই
গণমুক্তির স্বরলিপি

তাঁর কবিতায় আঁকা ছিল
রূপকল্পের ব্যঞ্জনা অনন্য বর্ণমালা
কঠিন সময়ে ধ্বনিত হত গীতার এক অং
শ্লোক ঃ
আদিবাসী বালক-বালিকারা
গাইবে এক সূর্যের গান

দুঃখের বাষ্পমোচন থেকে জ্বলে উঠবে
মুক্তির সোপান
নীলকণ্ঠ পাখির পালক থেকে
ঝরে যাবে সামন্ত প্রজন্ম
তাঁর গূঢ়তম অভিমান
আত্মপ্রশ্নকারীর চোখে জ্বেলে দেবে
শতাব্দীর পদ্মবিল
আত্মগোপনের গর্ভ থেকে
কোনোদিন তাঁকে আর পৌছুতে হবে না
সংসদ ভবন
তাঁর ইস্পাতকঠিন যুদ্ধস্মৃতি
আমাদের এনে দিক খাণ্ডবদাহন
থেকে উত্তরণ ঃ সংঘবদ্ধ শক্তির কবিতা

তিনি আমাদের প্রপিতামহ ভীষ্ম
বিপ্লবের রক্তকরবী
মননের ব্যাপ্তি
প্রাণের সেতুবন্ধ

তিনি এই পার্বতী অহল্যার কৈলাসশিখর
তিনি আমাদের স্বর্ণভূমে ছত্রহীন
মুকুটহীন রাজা

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

একটি বিকল্পহীন উত্তর

রমেন্দ্র বর্মন

ছেলেবেলায় পরীক্ষায়
একটি প্রশ্নেরই উত্তর নির্দ্বিধায় করতে পারতাম
সেটি শূন্যস্থানে পূরণের উত্তর।

আজ ১৪ই অক্টোবর
ধূসর শতাব্দীর এই কালসন্ধ্যায়
সেই শূন্যেরই উত্তর খুঁজি
কে বললেন যেন
এ শূন্য সে শূন্য নয়।

সাথী দশরথের
স্বপ্ন আর ভালোবাসায়
পূর্ণ সেই শূন্য।

আমি জানি এ উত্তরের কোনো বিকল্প নেই।

.ডেইলি দেশের কথা ১৫-১০-৯৮]



রণাঙ্গনের বার্তা

(কমরেড দশরথ দেব স্মরণে)

সমীর পাল

জুমের ক্ষেতে আগুনের উন্মাদ ঘোড়ার মতো
ছুটলেন তিনি—
একটি স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠলো দাবানল
শতাব্দীর লাঞ্ছনা বঞ্চনা আর বেদনার ভারে
আকাশ নুয়ে পড়েছে
এক ঝলক আলোকের আভায়
ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠলো
দেখলো আলোকিত চারিধার —

পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে তখন ধ্বনিত
উৎপীড়িতের হাজারো আর্তনাদ
জন্ম দিল একটি প্রতিবাদ গর্জন
বিদ্যুতের মতো তাঁর আলোক উদ্ভাস
কেঁপে ওঠে রাজপ্রাসাদ— দিগন্তে দুরন্ত তুফান
নড়ে ওঠে, মাথা ঝাঁকায়
আঠারোমুড়া, লংতরাই থেকে জম্পুই শাখানটাঙ—
ছড়াগুলো ছুটে দুরন্ত, নদীর বুকে নামে ভরা যৌবন
সমতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জাগে ঢেউ
কে কোথায় আছো— ডাকো সবাইকে
প্রাণে প্রাণে বাঁধে আলিঙ্গন।

এক টুকরো রক্তে ভেজা লাল কাপড়ের ঠোঁট
ঘোষণা দিল নতুন জয়ের বার্তা
অরণ্য সমতলে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর কলতানে
উচ্চকিত হল জীবনের জয়গান ঃ
ফিরিয়ে দাও আমাদের বাঁচার অধিকার।

চমকে উঠল আসমুদ্র হিমাচল
ঘুম ভাঙার অপূর্ব সঙ্গীতে।
খোলসের আড়াল থেকে হঠাৎ
বেরিয়ে এল রক্তখেঁকো শ্বাপদেরা
ছড়াল বারুদের বিষাক্ত ঘ্রাণ
জর্জরিত করল শ্যামলী ত্রিপুরার অনাবিল সুন্দর
নিষ্ঠুর হিংস্রতায়,
বুলেট ঝাঁঝরা নিরীহ মানুষ
আর কচি শিশুর উপড়ে নেয়া হৃদপিণ্ডে
'স্বাধীনতা'র খাদ খোঁজে একদল মূর্খ
দুর্দিনের এই সন্ধিক্ষণে
আবার জ্বলে উঠুক ওই দাবানল
বুকে বুকে জ্বালিয়ে রাখো
শীতের ভোরের অমল আগুন।

রণাঙ্গণে প্রতিক্ষণে মনে রেখেছি
সেনাপতির সেই আহ্বান ঃ
এটা কোন মামুলি যুদ্ধ নয়
রক্তঝরা এক মহান যুদ্ধ
সামনে ভয়ঙ্কর গিরিখাত
ডানে বাঁয়ে পিছলে পড়ার বিপদ
অন্ধকারে বন্ধু, সাবধানে হাঁটো।
ভীরুরা পালাচ্ছে ? — পালাক
দুর্নিবার সাহসে এগিয়ে চলো
প্রতিরোধের বার্তা ছড়াও দিকে দিকে
শত্রু এখন মুখোমুখি।

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]

দশরথ দেব একক, অদ্বিতীয়



দীপক ভট্টাচার্য

কমঃ দশরথ দেবের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অপূর্ব। তাঁর বক্তব্য ছিল তীক্ষ্ণ। বিষয়কে বিনা দ্বিধায় অনর্গল তীক্ষ্ণ বাক্যবিন্যাসে পরিবেশন করতে পারতেন। শ্রোতাদের দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে তোলার মত কণ্ঠস্বর নিক্ষেপ করতে পারতেন।

আমরা উদয়পুর যাচ্ছি। গাড়িতে আমি আর শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব। বিশ্রামগঞ্জের বাজারের কাছে একটা মুরগী গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। তিনি গাড়ি থামাতে বলেন। নেমে মুরগীর মালিকের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে আনতে বলেন। আমি আর ড্রাইভার চন্দ্রহাস সিং মালিকের নাম-ঠিকানা নিয়ে আসি। গাড়ি ছাড়ে। পথে কোনো কথা নেই। নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা উদয়পুর পৌঁছে যাই। রাত্রে ফিরে আসি। ধীরে ধীরে এই ঘটনার কথা ভুলে যাই। প্রায় দিন পনেরো হবে। মুরগীর মালিক আমাদের অফিসে একটা চিঠি নিয়ে হাজির। চিঠিটা পড়ে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। দশরথ বাবুর নিজের হাতে লেখা চিঠি। ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। নিয়ে যাই চেম্বারে। ভদ্রলোক কথা বলবেন কি, আকুল হয়ে কেঁদে চলেছেন। আর বলছেন, পায়ের ধূলা দিন। আমি কিছু চাই না, শুধু পদধূলি। পা জড়িয়ে ধরতে চান। আমি তাকে একরকম জোর করেই চেয়ারে বসিয়ে দিই। তিনি চেয়ারে বসে চোখ মুছতে মুছতে বলেন, এই রাজ্যে এমন মন্ত্রী যে আছেন জানতাম না। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে দশরথ বাবু তাকে শান্ত করেন। আমি অফিস কক্ষে তাকে নিয়ে এসে আদর-আপ্যায়ন করে বিদেয় করি। দশরথবাবু এই মুরগীর মালিকের কাছে নিজের হাতে চিঠি লিখে জানতে চান, যে মুরগীটি তাঁর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে তার দাম কত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই মুরগীর ক্ষতিপূরণ দিতে চান। অনিচ্ছাকৃত গাড়ি চাপার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মুরগীর মালিক অনুপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি দশরথ দেবের মহান হৃদয়ের স্পর্শে অভিভূত হয়ে যান। আমরাও।

দশরথ দেব নিজে যেমন কাজ করতেন তেমনি কাজ করিয়ে নিতেন অপূর্ব কুশলীর ন্যায়। আমি সকাল আটটায় অফিস যেতাম। তিনি ৮.৩০ মি: বা নয়টায় আসতেন। অনেকেই জানতেন, সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে মহাকরণে গেলে দশরথ দেব তথা শিক্ষামন্ত্রীর অফিস খোলা পাবেন। কমরেড মতিলাল সরকার একদিন সকালে অফিসে আসেন। হেসে বলেন আর কাউকে না পেলেও আপনাকে আর দশরথদা-কে পাব জানি। তিনি তখন এম এল এ ছিলেন। সময় ও কাজের এক অপূর্ব সমন্বয় গড়ে তুলতে দেখেছি শিক্ষামন্ত্রী

দশরথ দেবকে। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিটি কর্মীকে আকর্ষণ করতেন। কাউকে অলসভাবে বসিয়ে রাখতেন না। এমন কি সূক্ষ্ম কাজের দায়িত্ব দিয়ে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরীক্ষাও নিতেন।

দশরথ দেব রাজ্যের কিংবদন্তি পুরুষ হয়েও আমাদের সঙ্গে মিশতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে কমরেড- সুলভ আচরণ করতেন। অনেক সময় আমাদের মনে হতো আমরা তাঁর সাবর্ডিনেট কর্মচারী নই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার সঙ্গে সময় পেলেই মার্কসীয় তত্ত্ব নিয়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনা করতেন। এর ফলে আমি মানসিক ভাবে খুব উপকৃত হয়েছি এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মৃত্যুর দুদিন আগেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি বাড়ি গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি। মনে হচ্ছিল অনেক কথা বলতে চান। কিন্তু বলতে পারছেন না।

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট শাসনকালে দশরথ দেব উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কাজে-কর্মে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী উদারচেতা মহানুভব বলে সর্বস্তরে খ্যাতিলাভ করতে থাকেন। বিশেষত আমলাশ্রেণীর কাছে এবং মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী লোকের কাছে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী দেবতুল্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। যে যা প্রার্থনা করছে সে তাই পেয়ে যাচ্ছে। অনেকে তাঁকে কল্পতরুর ন্যায় মনে করতো। সেই তুলনায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব সম্পর্কে একটা অপপ্রচার চালু হয়ে যায় যে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। কেবলমাত্র উপজাতিদের কথাই ভাবেন। অনুপজাতিদের কথা ভাবেন না। এটা যে কতবড় মিথ্যা প্রচার ছিল তা ইতিহাস ঘাঁটলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। আসলে দশরথবাবু ছিলেন খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি। নিয়ম-নীতির বাইরে তিনি কিছু করতেন না। এমনকি তাঁর আদেশ ছিল যে তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে এবং সরকারী পদমর্যাদার প্রভাব খাটিয়ে যেন আমরা কেউ ব্যক্তিজীবনে সুযোগ-সুবিধা ভোগ না করি।

দশরথবাবুর আরো একটা গুণ ছিল যে, তিনি তাঁর অফিসের স্টাফদের যথাযথ মূল্য দিতেন। অনেক সময় কোনো সরকারী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন। এতে একটা সুবিধা হয়েছিল যে আমরা অফিসে একটা টিম স্পিরিট আনতে পেরেছিলাম। এর ফলে অফিসে কোনো জটিলতা দেখা দেয়নি। দূর-দূরান্তের মানুষ এলে কখনো হয়রানি বোধ করেনি। কখনো ত্রুটি ধরা পড়লে তিনি পৃথকভাবে আমাকে ডেকে নিয়ে তা দেখিয়ে দিতেন। ফলে দ্বিতীয়বার ভুল হতো না। একটা চমৎকার মানসিকতার সাথে তিনি আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করাতেন। আমরাও কাজে উৎসাহ পেতাম। দিনরাত্র এবং ছুটির দিনও আমরা কাজ করেছি। বাইরে থেকে তাঁর সম্পর্কে যে লৌহকঠিন চরিত্রের মানুষ বলে আগে শুনেছি, তার কোনো লক্ষণই আমরা দেখিনি। বরং দেখেছি ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার সময় তাঁর অন্তর্বেদনা। কী গভীর ব্যথা নিয়ে তিনি দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা আমি দেখেছি। তাঁর কণ্ঠস্বর দুঃখে রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ অচিরেই ব্যর্থ হবে। কারণ, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাধনা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁর বক্তব্য শোনার পরেই আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম— "দাঙ্গার শ্রেণীচরিত্র" শিরোনাম দিয়ে। একটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত লেখক সমাবেশ নামক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। কমঃ দশরথ দেবের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ এই কারণে যে তিনিই আমাকে লেখার জগতে টেনে এনেছিলেন। এর সঙ্গে একটা ঘটনাও জড়িয়ে আছে। তখন কমরেড দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য জীবিত। তিনি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে একটা লেখার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। সে সময় মানসিকভাবে আমি খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলাম। সমস্ত দিক থেকে তখন আমি বিচ্ছিন্ন। আমার রাজনৈতিক অবস্থান কোথায় তা

আমি জানতাম না। অথচ আমি একজন কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে কাজ করছি। এই অবস্থায় আমি কোনো লেখার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করি। দিগ্বিজয় বাবু নিরাশ হয়ে চলে যান। পরের দিন দশরথবাবু আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি দিগ্বিজয়বাবু বসা। বুঝতে পেরেছি। দশরথবাবু ঝাড়া আধঘণ্টা আমাকে লেখা সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। যদি রেকর্ড করে রাখা যেত তবে বোঝা যেত তাঁর সেই সময়কার ওজস্বিনী বক্তব্যের ওজন কতখানি ছিল। হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করার মত শব্দবিন্যাসে তিনি আমাকে কলম তুলে নিতে বলেন। অসি কখনো মসি হতে পারে না, কিন্তু মসিকে অসিতে পরিণত করা যায়। লেখক হিসেবে যে আমি আত্মপ্রকাশ করতে পারি তার বিশ্বাস যেন আমার অপেক্ষা দশরথবাবুর বেশি ছিল। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেদিন থেকেই বলা যায় আমি কলম তুলে নিই।

মন্ত্রী দশরথ দেবের আত্মগরিমাবোধ বা অহংকার ছিলনা। তিনি যে এতবড় একজন নেতা সে বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরতেন। এদিক থেকে তিনি তার অফিস-কর্মীদের যথাযথ প্রটেক্শন দিতে ভুল করতেন না। আমার মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী আমার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেয়ে দশরথবাবুকে ডেকে নিয়ে বলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে চেম্বারে ডেকে নিয়ে যান। আমার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি পড়ে শোনান। আমি মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। আমি মানুষ খেপিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি। কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নেই। সমস্ত অভিযোগ বলার পর আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আমার কিছু বলার আছে কিনা। তখন বিনীতভাবে আমি বলি যে যাঁরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাঁরা যদি গ্রাম-পাহাড়ের গরীব-কৃষক-শ্রমিক-জুমিয়া শ্রেণীর মানুষ হন তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে আমার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ সত্য। কিন্তু কোনো অভিযোগই এদের কাছ থেকে আসেনি। আমাকে আর বেশি বলতে হলনা। পরম সুবিধাবাদী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। দশরথবাবু সমগ্র বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এক লহমায়। আর কোনোদিন আমার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগে আমল দেননি। প্রচন্ড ধী শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। অল্প কথা শুনেই সমগ্র বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যাওয়ার, অসাধারণ ক্ষমতা রাখতেন তিনি।

কমঃ দশরথ দেবের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অপূর্ব। তাঁর বক্তব্য ছিল তীক্ষ্ণ। বিষয়কে বিনা দ্বিধায় অনর্গল তীক্ষ্ণ বাক্যবিন্যাসে পরিবেশন করতে পারতেন। শ্রোতাদের দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে তোলার মত কণ্ঠস্বর নিক্ষেপ করতে পারতেন। বিনা সংকোচে নিজের মনের কথা দ্রুত বলতে পারতেন। তাঁর মত সুবক্তা ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। দশরথ দেব নিজেই একক এবং তাঁর বিকল্প নেই। সংস্কৃত ভাষাতেও দখল ছিল দারুণ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় তাঁর যেন মুখস্থ ছিল। গীতার ভাববাদ ও বস্তুবাদ নিয়ে কয়েকবার আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি তাঁর কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে গীতার বস্তুবাদ নিয়ে প্রবন্ধ লেখার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু লিখে উঠতে পারিনি। অবশ্য এর মধ্যে অধ্যাপক ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গীতার উপর বস্তুবাদী ব্যাখ্যামূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতা সম্পর্কে প্রদত্ত ধারণাটি এই পুস্তকে ত্রুটিপূর্ণ থাকায় আমি জয়ন্তানুজবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন পরবর্তী সংস্করণে তিনি এর সংশোধন করে নেবেন।

সর্বশেষে বলি যে কমঃ দশরথ দেব সম্পর্কে বলার মত বহু কথা আছে। বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু বড় কথা হলো যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাকে তাঁর জুনিয়র কমরেড হিসেবে গণ্য করে গেছেন, কখনই তাঁর পি এ ভাবেননি। এমন একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তির স্মৃতি তর্পণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ●

[পূর্বাভাস - দশরথ দেব স্মরণ সংখ্যা]

কমরেড দশরথ দেব প্রয়াত

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আগরতলায় হাজার হাজার শোকবিহ্বল মানুষের স্রোত

[ডেইলি দেশের কথা ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮]

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ আজ ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই অকস্মাৎ সূর্যাস্ত হলো ত্রিপুরায়। একটা মাত্র খবরে ! অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এত ভারী খবরটা কী করে ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে ! প্রথমে রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায়, তারপর মহকুমার শহরগুলো থেকে গ্রামে-পাহাড়ে রাজ্যময় ! কমরেড দশরথ দেব আর নেই ! ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিসংবাদী সেনাপতি, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি, বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব-এর জীবনদীপ নিভে গেছে আজ ভোর চারটা নাগাদ। জি বি হাসপাতালের ১৭ নং কেবিনে হৃদরোগের আক্রমণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বয়স হয়েছিল ৮২। ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগ-উপসর্গে ভুগছিলেন। ১২ তারিখ রাতে শ্বাসকষ্ট হতে থাকায় জি বি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছিল। ১৩ তারিখ রাতেও ডাক্তাররা তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু — ১৩ তারিখের রাতটা ভোর হবার আগেই অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগের প্রবল আক্রমণে থেমে যায় তাঁর নাড়ীর স্পন্দন। বুকফাটা হাহাকারে বিদীর্ণ হয় ভোরের আকাশ। খবর পেয়েই ঘুম ভেঙে ওঠা মানুষের দল ছুটতে থাকেন হাসপাতালের দিকে। ছুটে য়ান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্য নেতারা। খবর যতই দূরে ছুটে যায়, মানুষ তত ছুটে কাছে আসে। হাহাকারের উৎসের কাছে। জি বি হাসপাতাল থেকে একসময় মরদেহ আনা হয় অফিসার্স কোয়ার্টার্স লেনের বাড়ীতে, সেখান থেকে সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তরে। শোকাহত মানুষের স্রোত নেমে আসে চারদিক থেকে পার্টি অফিসের দিকে। বিকেলে ফুলমালার স্তূপের নীচে শায়িত কমরেড দশরথ দেব। তাঁর গাড়ীর সামনে— পেছনে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যায় মহাকরণে, সেখান থেকে বিধানসভা ভবন হয়ে রবীন্দ্রভবনে। এ খবর লেখার সময়ও তিনি সেখানেই শুয়ে আছেন। দলে দলে মানুষের শেষ শ্রদ্ধা অশ্রু আর ভালোবাসা বুকে ধারণ করে চলেছেন। কাল সকালে যাবেন খোয়াই। বিকেলে নিজ গ্রাম আমপুরায় হবে শেষকৃত্য। আজই সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর অন্যতম প্রবীণ সদস্য বিনয় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির দুই সদস্য বিমান বসু ও অনিল বিশ্বাস আগরতলায় ছুটে এসেছেন। কাল সকালে গুয়াহাটি হয়ে দিল্লী থেকে এসে পৌঁছবেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ। তাঁরা এবং পার্টি ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন শেষকৃত্যে।

কমরেড দশরথ দেব কী ছিলেন, কতটা ছিলেন— আজ অনেকেই নতুন করে বুঝেছেন। এর আগে আর কোনও মৃত্যুতে এভাবে কাতারে কাতারে মানুষ নেমে আসেনি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

উপজাতি-বাঙালী-মণিপুরী-হিন্দুস্তানী হিন্দু কিংবা মুসলমান— সব পরিচয় মিলেমিশে একাকার ছিল সেখানে। কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুরার সব জনগোষ্ঠীর মানুষের মিলনের সেতু। এই সেতুর অক্ষয় শক্তির রূপ দেখেছে আজ আগরতলা।

কমরেড দশরথ দেব মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্যা, দুই মেয়ে, এক ছেলে, নাতি-নাতনি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়।

কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুর খবর আসতেই রাজ্যজুড়ে পার্টি পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে। তিনদিন রক্ত পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিসে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তাছাড়া রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছে। অর্ধনমিত থাকছে জাতীয় পতাকা।

অফিসার্স কোয়ার্টার লেনের বাড়িতে

বুধবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে জি বি হাসপাতাল থেকে সুসজ্জিত কনভয়ে কমরেড দশরথ দেবের মরদেহ এসে পৌঁছায় শহরের অফিসার্স কোয়ার্টারস লেনে তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে। রাস্তার দু'ধারে তখন অপেক্ষমান বিশাল জনতা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শত শত নারী-পুরুষ। দশরথ দেবের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনদের বুকভাঙা কান্না। গভীর শোকের পরিবেশ। যুবক-যুবতী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, সরকারী কর্মী সহ সমাজের সকল অংশের মানুষ সারিবদ্ধ ভাবে বাড়ির সামনের ফটক দিয়ে ঢুকছেন, আর চোখের জলে শেষবারের মতো দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। জনতার মাঝে সেখানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, বনমন্ত্রী নারায়ণ রুপিনি, শিল্পমন্ত্রী পবিত্র কর এবং মৎস্যমন্ত্রী সুকুমার বর্মন। টি ইউ জে এস নেতা নগেন্দ্র জমাতিয়া, রবীন্দ্র দেববর্মা, জগদীশ দেববর্মা, কংগ্রেস নেতা রতন চক্রবর্তী, টি এন ভি নেতা বিজয় রাংখল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দশরথ দেবের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এছাড়া এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড) এর চেয়ারম্যান দিলীপ দাম, ও এন জি সি-র জি পি এম পি কে আদক, শিক্ষা অধিকর্তা রণজিৎকুমার দেবনাথ প্রমুখ।

হঠাৎ শোনা গেল সাইরেনের শব্দ। রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ গাড়ী থেকে নেমে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের মরদেহে মাল্যদান করলেন এবং তাঁর পরিবারের লোকদের সান্ত্বনা জানালেন। এদের মধ্যে দেখা গেল সারিবদ্ধ লাইনে ১৪২ জন উপজাতি ছাত্রী নিজস্ব পোষাকে সুসংবদ্ধভাবে ...র পর শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল তাদের প্রিয় দশরথ দেবকে। এদের কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। এভাবে দু'ঘণ্টা চলার পরও অগণিত মানুষ শ্রদ্ধা জানানোর অপেক্ষায়। দুপুর ১২টায় ...াড়িতে করে ...'দেহ নিয়ে সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন পার্টি-কর্মীরা। তখ... মিছিলের কর্মসূচী ছিল না। কিন্তু গাড়ীর পেছনে জনস্রোত। রাস্তার দু'পাশেও মানুষ আর মানুষ। আই জি এম চৌমুহনী, প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে মেলারমাঠে রাজ্য দপ্তরে মরদেহ পৌঁছাতে সময় নিল আধ ঘণ্টা। রাজ্য দপ্তরের সামনে এবং পাশের রাস্তায় তখন অপেক্ষমান জনতার ভীড় উপচে ...ড়ছে।

পার্টির রাজ্য দপ্তরে

ইথারে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সকাল না হতেই। জাতি-উপজাতি জনগণের প্রিয় নেতা কমরেড দশরথ দেব নেই। খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথেই স্রোতের মতো নর-নারী ছুটে আসতে শুরু

করেছেন প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। এসেছেন সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তরে, যেখানে মরদেহ রাখা হয় দীর্ঘ সাড়ে তিনঘণ্টারও বেশি সময়। চলন্ত সারিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি চলে শোক পুস্তিকায় স্বাক্ষর।

পার্টির রাজ্য-কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী-সমর্থক, জাতি-উপজাতির মা-বোন, শ্রমিক-কৃষক, কর্মচারী সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটে আসেন মেলারমাঠে, পার্টির রাজ্য দপ্তরে। প্রয়াত নেতাকে ফুলে ফুলে ঢেকে দেন। কেউ জানান মৌন শ্রদ্ধা, কেউবা মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে জানান নীরব অভিবাদন। সব পদমর্যাদা ভুলে মন্ত্রী থেকে ঠেলা শ্রমিক, মা-বোন একই লাইনে দাঁড়িয়ে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অবিসংবাদিত নেতা কমরেড দশরথ দেবকে। এককথায় দুপুর সাড়ে বারটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মেলারমাঠ পার্টি অফিস এবং সংলগ্ন হরিগঙ্গা বসাক রোড মানুষে মানুষে ছয়লাপ হয়ে যায়।

দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ প্রয়াত নেতার মরদেহ এনে রাজ্য দপ্তরের সামনে রাখা হলে প্রথমেই কাস্তে হাতুড়ি খচিত রক্ত পতাকায় মরদেহ ঢেকে দেন সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বৈদ্যনাথ মজুমদার। এরপর মরদেহে পুষ্পস্তবকে ঢেকে দেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভানু ঘোষ, দীনেশ দেববর্মা, তপন চক্রবর্তী, অঘোর দেববর্মা, বাদল চৌধুরী প্রমুখ। শ্রদ্ধা জানান বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ — আর এস পি-র গোপাল দাস, মুরারিমোহন সাহা, সি পি আই নেতা সুনীল দাশগুপ্ত, প্রশান্ত কপালী প্রমুখ। এরই মাঝে চলতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান, পুষ্পস্তবক অর্পণ। একে একে মরদেহে মাল্যদান করেন সি পি আই (এম) রাজ্য কমিটির সদস্য বিষ্ণু দত্ত, বিদ্যা দেববর্মা, ভুবনেশ্বর দে, পবিত্র কর, সুকুমার বর্মন, রমা দাস, ছায়া বল, গজেন্দ্র ত্রিপুরা, ভানুলাল সাহা, সুব্রত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্র চৌধুরী, রাধাচরণ দেববর্মা, খঞ্জনী দেববর্মা প্রমুখ। প্রাক্তন বিধায়ক মাখন চক্রবর্তী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

দুপুর ঠিক দেড়টায় কমরেড দশরথ দেবের মরদেহে মাল্যদান করে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এর পরপরই রানীরবাজারের কমরেডরা হাতে হাতে ফুল-মালা নিয়ে দীর্ঘ লাইনে হেঁটে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। অন্যান্য অঞ্চলের কমরেডরাও এসে দাঁড়ান কিউতে। পার্টি অফিসের সামনে তখন তিলধারণের জায়গা নেই। সকলেই উন্মুখ কমরেডের মুখ শেষবারের জন্য দেখে নিতে, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সবাইকে সুযোগ দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত খেটে যান।

ফুল আর মালায় বার বার যেন পাহাড় জমে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়েই স্বেচ্ছাসেবকরা কিছু কিছু ফুল সরিয়ে নিচ্ছেন, অন্যদের মাল্যদান করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

আড়াইটে নাগাদ শ্রদ্ধা জানাতে দীর্ঘ কিউতে দাঁড়ান ডেইলি দেশের কথার সাংবাদিক, অসাংবাদিক, ত্রিপুরা প্রিন্টার্স এবং জনশিক্ষা প্রেসের কর্মীরা, যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কমরেড দশরথ দেবের কর্মময় জীবন জড়িয়ে ছিল প্রায় শেষদিন পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে যান ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বি আর বর্ধন, ও এস ডি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, পার্টি নেতা হরিমোহন দেববর্মা, আরবের রহমান, প্রশান্ত সাহা, ফয়জুর রহমান, এ ডি সি চেয়ারম্যান মংসাজাই মগ, কালীকুমার দেববর্মা, কর্মচারী নেতা সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অশেষ দেবরায়, প্রদীপ সরকার, প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী দুর্গাদাস শিকদার প্রমুখ। বিভিন্ন সংগঠন গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, আই এম এ, এ ডি জে ডি এ, এস ইউ সি আই, টি ভি এ, এ আই টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে জানানো হয় শোক ও শ্রদ্ধা।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভীড়ও প্রচণ্ডবেড়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে শোক মিছিল বের করার সময় হয়ে গেছে। হাজারো জনতা ফুল মালা নিয়ে তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এর মধ্যেই প্রয়াত কমরেডের মরদেহ তুলে নেওয়া হয় খোলা ট্রাকে। বের হয় শোকমিছিল। উন্মুখ জনতা শেষবারের মতো দেখে নেন খোলা গাড়িতে কাঁচের আধারে শায়িত তাদের প্রিয় নেতার মুখ। শরতের পড়ন্ত বিকেলে হাজার হাজার জনতার মধ্য দিয়েই তিনি শেষবারের মত বেরিয়ে যান মেলারমাঠ সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তর থেকে। শান্তি-সম্প্রীতির আন্দোলনের দীর্ঘ রণক্লান্ত অগ্রণী সৈনিকের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল জনগণের মধ্য দিয়েই বটতলার দিকে এগিয়ে যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের উদ্দেশ্যে।

শব্দহীন মহামিছিলে সর্বহারার মহাসঙ্গীত

বিকাল চারটায় সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তর থেকে কমরেড দশরথ দেবের মরদেহবাহী শকট হাজার হাজার মানুষের ভীড় সরিয়ে যাত্রা শুরু করে। শোক মিছিলের শুরুতেই ট্রাফিক পুলিশের মোটর বাইক এবং এসকর্ট কার। এর পেছনে অর্ধনমিত লালপতাকাবাহী দুটি মোটরবাইক। প্রচারগাড়ী।

কমরেড দশরথ দেব অমর রহে — বিরাট ফেস্টুনের পেছনে ৮২টি অর্ধনমিত লালপতাকাবাহী জাতি-উপজাতির স্বেচ্ছাসেবকরা। এরপরই রাজ্যপুলিশের টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা এসকর্ট করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর পেছনে শব গাড়ী। গাড়ীর উপরে লাল কাপড়ের ফেস্টুনে লেখা 'জাতি-উপজাতির জনগণের প্রিয় নেতা কমরেড দশরথ দেব অমর রহে।' পেছনেই পার্টি ও বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। স্রোতের মত এগিয়ে চলা মিছিলে শিল্পীরা গাইছিলেন ইন্টারন্যাশনেল। দু'সারিতে মহিলারা। পেছনে অন্যান্য অংশের হাজার হাজার মানুষ। কে ছিলেন না এই মিছিলে ? বাগান-শ্রমিক, দিনমজুর, ছাত্র-যুবক বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন অংশের মানুষ পা মেলান এই মিছিলে।

রাস্তার দু'ধারের শত সহস্র মানুষকে পাশে রেখে মিছিল বটতলা, ফায়ার সার্ভিস হয়ে এগিয়ে যায় সচিবালয়ে। যেখানে কেটেছে তাঁর কর্মময় জীবনের ১৫টি বছর। হাজার হাজার মানুষের সুশৃঙ্খল শোক-মিছিলে ইন্টারন্যাশনেল ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না। শোকস্তব্ধ মানুষের ঢেউ এগিয়ে গেছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ একটি বার প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে।

কিসের টানে তারা এভাবে ছুটে এলেন ? একটি শোক-মিছিলে বাঁধভাঙ্গা মানুষের স্রোত বইতে পারে তা কেবলমাত্র সম্ভবত দশরথ দেবের জন্যই সম্ভব? জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির সেতু কমিউনিস্ট থেকে অবিসংবাদী জননেতায় রূপান্তরিত হওয়ারই প্রমাণ মিলেছে আজকের হাজারো মানুষের পদচারণায়।

সচিবালয়ের লনের সামনে মরদেহে মাল্যদান করেন মুখ্যম ী মানিক সরকার, মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, অঘোর দেববর্মা, নারায়ণ রুপিণি, দূর্বাজয় রিয়াং, পবিত্র কর, অনন্ত পাল, গোপাল দাস, ফয়জুর রহমান, সুবোধ দাস, নিরঞ্জন দেববর্মা, জিতেন্দ্র চৌধুরী, সুকুমার বর্মন, রমেন্দ্র নাথ, সুধীর দাস, মুখ্যসচিব, অন্যান্য সচিবগণ, জেলাশাসক আরক্ষা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ প্রমুখ।

এখান থেকে শোকমিছিলে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। শুরু থেকেই মিছিলে ছিলেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভানু ঘোষ, পার্টি নেতা বিদ্যা দেববর্মা, সরোজ চন্দ, চিত্ত চন্দ, মানিক দে সহ বামফ্রন্ট এবং গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সচিবালয় থেকে বেরিয়ে মিছিল আই জি এম

হাসপাতাল, পুরাতন আর এম এস চৌমুহনী, বিদুরকর্তা চৌমুহনী, রবীন্দ্রভবনের পাশ দিয়ে বিধানসভা ভবন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ তিনি ছিলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য। ১৯৮৮-৯৩ জোট সরকারের দিনগুলি ছাড়া তাঁকে এখানে দেখা গেছে শিক্ষামন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে। জোট আমলের শেষদিকে ছিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা ভবনের সামনে পুষ্পস্তবক মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র সরকার, উপাধ্যক্ষ সুবল রুদ্র, সাংসদ সমর চৌধুরী, আসামের সাংসদ এস কে বসুমাতারী, পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ সুধীর গিরি, বিরোধী দলনেতা সমীর বর্মন, বিধায়ক বীরজিৎ সিংহ, কাশীরাম রিয়াং, সুদীপ রায়বর্মন।

মিছিল টাউন হলের পাশ দিয়ে এসে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ী রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মোটরস্ট্যান্ড, কামান চৌমুহনী, সূর্য চৌমুহনী, ওরিয়েন্ট হয়ে শবদেহ পৌঁছায় রবীন্দ্র ভবনে।

সি পি আই (এম) রাজ্য দপ্তর থেকে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিটি স্থানে ফুলের তোড়ায় ভরে উঠে শবদেহ। স্বেচ্ছাসেবকরা এই ফুল সরাতেই হিমসিম খাচ্ছিলেন। এত ফুল। যেন মানুষের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

যারা কমরেড দশরথ দেবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে গেছে সেই সম্প্রীতির শত্রুদের বুকে সত্যিই কাঁপন ধরিয়েছে আজকের মহামিছিল। শেষ মিছিলে সম্প্রীতির পতাকাই উড্ডীন হল আরো সুদৃঢ়ভাবে।

রবীন্দ্রভবনে আগে থেকেই ছিলেন শত-সহস্র মানুষ। তাঁরা এসেছেন সদরের প্রত্যন্ত উপজাতি জনপদ থেকে। কাতারে কাতারে। সাত সকালে খবর পেয়েই ঘর ছাড়েন তাঁরা। সাথে নিয়ে আসেন মুঠো-মুঠো ফুল। রবীন্দ্রভবনে প্রিয় নেতার দেহে তুলে দেন ফুলের অর্ঘ্য।

বিশালগড়, সোনামুড়া, উদয়পুর, বিলোনীয়া সহ রাজ্যের নানা স্থান থেকে। সন্ধ্যা পাঁচটা চল্লিশ মিনিট নাগাদ মরদেহ এখানে পৌঁছালে রাজ্য পুলিশের তরফে টি এস আর বাহিনী 'গান স্যালুট' জানায়।

রবীন্দ্রভবনের বারান্দায় শবদেহ রাখা হয়। এখানে শ্রদ্ধা জানান — পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য বিনয় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য গৌতম দাশ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদার, প্রাক্তন সাংসদ শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক ব্রজগোপাল রায়। লাইন ধরে অগণন মানুষ জানান শ্রদ্ধা। আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার, পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন আশিস সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায়, বিধায়ক জহর সাহা, দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সম্পাদকগণ। রাজ্য পুলিশের পদস্থ অফিসারগণ, সেইল-এর কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাধারণ মানুষ। রাত সাড়ে আটটা অব্দি লাইন ধরে শ্রদ্ধা জানালেন মানুষ। গভীররাতেও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মানুষ।

কমরেড দশরথ দেবের মরদেহ আগামীকাল সকাল ৮টা অব্দি থাকবে রবীন্দ্র ভবনে। আজ সারা রাত ফুলে ফুলে ঢাকা মরদেহের পাশে থাকবেন স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রতি পল, প্রতি মুহূর্তে ওঁরা থাকবেন প্রিয় নেতার পাশে। ●

রাজা দশরথের চিরবিদায়

[দৈনিক সংবাদ ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮]

সংবাদ প্রতিনিধি ঃ আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 'রাজা' দশরথ দেব মঙ্গলবার শেষ রাতে জি বি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শ্বাসকষ্টের কারণে গত সোমবার তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গতকালও চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরাতে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং ভোর চারটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সর্বত্র গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সাত সকালেই শত শত মানুষ প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অফিসার্স কোয়ার্টার লেনে তাঁর বাড়ীতে ছুটে যান। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন শ্রীদেবের সহধর্মিণী ও তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের সহযোদ্ধা শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেবী। স্ত্রীকে ছাড়াও তিনি এক পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য সরকার দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ রাজ্য সরকারের সব অফিস ও রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতিও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দোকানপাট বন্ধ রাখে। রাষ্ট্রীয় শোক চলাকালীন সময়ে রাজ্যের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সমস্ত আনন্দ-অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

আগামীকাল খোয়াই এর আমপুরায় তাঁর পৈতৃক ভিটেতে শ্রীদেবের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। বৃহস্পতিবার সকালে শোকমিছিল করে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর দীর্ঘ রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র খোয়াই শহরে। পরে সেখান থেকে আমপুরায়। এই উপলক্ষে খোয়াই মহকুমার সমস্ত সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবারও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বিকালেও তাঁর মরদেহ নিয়ে বাড়ী থেকে এক শোকমিছিল বের হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মরদেহ এনে রাখা হয়েছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। শহরের মানুষ যাতে প্রয়াত নেতার প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তার জন্য আগামীকাল সকাল পর্যন্ত মরদেহ এখানেই রাখা হবে। পথে মরদেহ সচিবালয়, বিধানসভা ও সি পি এম পার্টি অফিসেও নিয়ে যাওয়া হয়। মরদেহটি ছিল সি পি এম-এর দলীয় পতাকায় মোড়া।

প্রয়াত নেতার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে সি পি এম-এর তিন কেন্দ্রীয় নেতা পলিটব্যুরোর সদস্য বিনয় চৌধুরী ও দুই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসু ও অনিল বিশ্বাস আজই এখানে এসে পৌঁছেছেন। আগামীকালের শোকমিছিলেও তাঁরা যোগ দেবেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

মানিক সরকার ও সি পি এম রাজ্য সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদার। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎও আগামীকাল এখানে আসছেন।

দশরথ দেবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এক সময় তিনি রাজ্যের উপজাতিদের অবিসংবাদি নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের উপজাতি জনগণ নিজেরাই তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনীতি বরাবরই নানা বির্তকের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। খোদ উপজাতিদের মধ্য থেকেই তাঁর নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে তিনি যেমন রাজ্যের জাতি-উপজাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসাবে পূজিত হয়েছেন তেমনি কেউ কেউ তাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসাবেও চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু প্রবীণ নেতার মহাপ্রয়াণ যেন তাঁকে ঘিরে সৃষ্ট সব বিতর্ককে নিমেষে দূরে ঠেলে দিয়েছে। সব রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সব মত ও পথের মানুষই এই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে গেছেন। এদের মধ্যে কে না ছিলেন। কংগ্রেস নেতা সুধীররঞ্জন মজুমদার, সমীররঞ্জন বর্মণ, গোপাল রায়, রতন চক্রবর্তী, বি জে পি নেতা ডঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, যীশু দেববর্মা প্রমুখ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আসেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুমেধানন্দজীও। এক সময় রাজ্যের উপজাতি জনগণ যাদের মধ্যে দশরথ দেবের বিকল্প নেতৃত্ব খুঁজেছিলেন সেই শ্যামাচারণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখও বাদ যাননি। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের এক সময়ে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অঘোর দেববর্মা। এক সময় রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে এসে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান।

এত মানুষের ভীড়েও আজ একটি মানুষের অনুপস্থিতি আজ সকলেরই নজর কেড়েছে। তিনি হলেন দশরথ দেবের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সহযোদ্ধা, বহু সুখ-দুঃখের সঙ্গী, তাঁর অগ্রজ প্রতিম নৃপেন চক্রবর্তী। পলিটব্যুরোর প্রাক্তন এই সদস্য ১৯৯৫ সালে দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্তও রাজ্য সি পি এম-এ নৃপেন দশরথের নাম ছিল যেন একই বৃন্তে দুটি ফুলের মতো। কিন্তু এই শোকের দিনে প্রবৃদ্ধ এই নেতাকে তাঁর শারীরিক অক্ষমতা, কোন গভীর অভিমান নাকি শেষ জীবনের রাজনৈতিক মতপার্থক্য গৃহবন্দী করে রেখেছিল তা জানা যায়নি। সি পি এম দলের পক্ষ থেকেও কেউ তার দীর্ঘদিনের এই সহযোদ্ধার মহাপ্রয়াণের দুঃসংবাদটি নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেন নি।

তবে এক বিবৃতিতে 'রাজা দশরথে'র মৃত্যুতে শ্রীচক্রবর্তী তাঁর গভীর মর্মবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি সদ্য পুত্রহারা ও স্বামীহারা মঙ্গলেশ্বরী দেবীর প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক মাস আগে শ্রীদেবের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, সমগ্র রাজ্য তাঁর শোকের বোঝা বহন করার জন্য আজ প্রস্তুত। লক্ষণীয় বিষয় হল দশরথ দেবের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যায়নের দিকটি শ্রীচক্রবর্তী সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন।

খোয়াই-র আমপুরায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য

জাতি-উপজাতির অগণন মানুষের মাঝেই শেষ বিদায় নিলেন কমরেড দশরথ দেব

[ডেইলি দেশের কথা, ১৬ অক্টোবর, '৯৮]

খোয়াই থেকে ফিরে বিজয় পাল, ধ্রুবরঞ্জন সেন, অঞ্জন দে ঃ জাতি-উপজাতি বিপুল জনতার মাঝেই শেষ বিদায় নিলেন জননেতা কমরেড দশরথ দেব। আগরতলা থেকে খোয়াই হয়ে আমপুরা— ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘপথে অগণিত মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় শেষ বিদায় জানালেন তাঁদের প্রিয়তম নেতাকে। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটি, কুমারী-মধুতী রূপশ্রীর রক্তঝরা সেই খোয়াই-এর আমপুরায় বৃহস্পতিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হলো তাঁর। এই শেষকৃত্যানুষ্ঠান ত্রিপুরার বুকে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ, পলিটব্যুরোর সদস্য বিনয় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, পার্টির আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক হেমেন দাস এখানে ছুটে আসেন। খোয়াইয়ের পাহাড়-সমতলের সমস্ত জনপদ থেকে জাতি-উপজাতি হাজার হাজার মানুষ কাতারে কাতারে সমবেত হয়েছিলেন দশরথ দেবকে শেষবারের মতো দেখতে, বিদায় জানাতে।

রবীন্দ্রভবন থেকে

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ঠিক আটটা। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে জাতি-উপজাতি জনগণের প্রিয় নেতা কমরেড দশরথ দেবকে নিয়ে শেষ যাত্রা শুরু হয়। সে যাত্রাপথের মাঝে বড়মুড়ার জনহীন পাহাড়ী পথ বাদ দিলে ছিয়ানব্বই কিলোমিটার পথের দুধারেই ছিলেন সারিবদ্ধ মানুষ। রাস্তার পাশে জনগণ ছুটে এসেছিলেন প্রিয়তম নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। দুপুর বারোটায় যখন মরদেহবাহী কনভয় খোয়াই শহরে গিয়ে পৌঁছায় তখনও দলে দলে মানুষ ছুটে আসছেন। কনভয়ের শুরুতেই ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচার গাড়ি। তার পেছনে এসকর্ট। ঠিক তার পরেই খোলা ট্রাকে কাঁচের আধারে কমরেড দশরথ দেবের মরদেহ। তারপরই বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা, বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, প্রয়াত কমরেডের আত্মীয় স্বজন, গণসংগঠন, সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিকদের গাড়ি। গাড়ির দীর্ঘ কনভয় যত এগিয়েছে তার কলেবর হয়েছে আরও দীর্ঘ। আগরতলা শহরের আশ্রম চৌমুহনী পার হয়ে চন্দ্রপুরে যেতেই কনভয়ের গতি শ্লথ হয়ে যায়। রাস্তার দু'ধারের জনগণ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মুহূর্ত সময় পান। আবার এগিয়ে চলা। এবার থামতে হয় রানীরবাজার নলগড়িয়ায়। রাস্তার দু'পাশে মা-বোনেরা ফুল-মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। ভোরে উঠে যে ফুল কুড়িয়েছেন তারই মালায় শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রিয় কমরেডকে। কনভয়কে যারা পথে পথে থামিয়েছেন তাদের প্রতি কোন নির্দেশ ছিলনা, এটা ছিলনা কোন সংগঠিত

জমায়েত। দীর্ঘ পথে মা-বোনদের সারি ছিল চোখে পড়ার মতো। মান্দাইয়ের বৈদ্য ঠাকুর পাড়ার উপজাতি কন্যা আট বছরের শিথিলা তার বোন দীপিকাদের মতো পথের পাশে অগণন মা-বোনদের এমন সারির জন্যই কনভয় থেমেছে বার বার।

মরদেহবাহী শকট নিয়ে কনভয় জিরানীয়া এবং চম্পকনগরে বিভিন্ন অংশের জনগণের হৃদয়নিংড়ানো ভালবাসা কুড়িয়ে ঢুকে যায় জনপদহীন বড়মুড়া পাহাড়ে। কিন্তু মাঝ পাহাড়েই আবার শ্লথ হয়ে হয়ে আসে কনভয়ের গতি। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রিয় নেতাকে। টি এস আর জওয়ানরা জানান গার্ড অব অনার। আবার গতি বাড়ে কনভয়ের। বনপাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে গাড়ির দীর্ঘ মিছিল এগিয়ে যায়।

অসাধারণ আকর্ষণে □ রাস্তার পাশে জাতি-উপজাতির সারি

আগরতলা থেকে যখন কনভয় বের হয় তখন গাড়ির সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন। বড়মুড়া পাহাড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে মনে হল ঐ সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে। খোয়াই শহরের এক হোটেলবয় বলল, একশ পর্যন্ত গুণেছি আর গুণতে পারিনি।

বড়মুড়া পাহাড় পার হয়ে তুইসিন্দ্রাই অতিক্রম করে বাঁয়ে মোড় নিতেই তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়ক। এই পথে কনভয় এগোনোর সাথে সাথে ঘরবাড়িতে যে পোষাকে যিনি ছিলেন সেই পোষাকেই রাস্তায় ছুটে আসছেন। কেউবা পাছড়াকে লুঙ্গির মতো করে পরেছেন। কারোর পরনে এমনি লুঙ্গি। কথা ছিল কল্যাণপুরের আগে কনভয় থামবে না। জনগণের ইচ্ছাতেই বার বার থামাতে হয়েছে। প্রতিটি জনপদের জমায়েতই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সংগ্রামী শৃঙ্খলার ঐতিহ্যবাহী খোয়াইকে। গণ-আন্দোলনের দুর্জয় ঘাঁটি খোয়াইর প্রতিটি মিনি জমায়েতই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সুশৃঙ্খল। মনে হচ্ছিল যেন সুশৃঙ্খল বাহিনীকে কেউ কমান্ড দিয়ে রাস্তার দু'পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কনভয় যাচ্ছিল ত্রিশাবাড়ির পাশ দিয়ে। রাস্তার এপাশে-ওপাশে দাঁড়িয়ে জাতি-উপজাতি। শেষযাত্রায়ও কি অসাধারণ প্রভাবে সবাইকে এক লাইনে করেছেন জননেতা ! মোহরছড়া পার হয়ে কল্যাণপুরে ঢুকতেই রাস্তার দু'পাশে স্বেচ্ছাসেবকদের রচিত মানব-শৃঙ্খলের পেছন থেকে হাজারো মানুষের গগনবিদারী শ্লোগান কমরেড দশরথ দেব লাল সেলাম। রাস্তার ডানপাশে খোয়াই নদীকে রেখে শববাহী কনভয় একে একে অতিক্রম করে যায় বাগান বাজার, গৌরাঙ্গটিলা, রামচন্দ্রঘাট, চেবরী। খোয়াই শহরের মাঝামাঝি থেকেই পথের দু'পাশে স্বেচ্ছাসেবক লাল সেলাম জানাতে ঠায় দাঁড়িয়ে। এগিয়ে যায় মরদেহবাহী ট্রাক। দুপুর বারটায় মরদেহ যখন খোয়াই পার্টি অফিসের সামনে গিয়ে পৌঁছয় গাড়ির কনভয়ের লেজ তখন এক কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা দখল করে আছে।

দীর্ঘ অপেক্ষমান জনতার ভীড়

আর এগোনোর জো নেই। কারণ সি পি আই (এম) বিভাগীয় দপ্তর আর তার সামনের শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের ময়দান জনতার দখলে। তাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন সেই সকাল থেকেই। কারোর হাতে ফুলের মালা, আঁচলে বাধা ভোরের ফুল। ময়দান জুড়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে একের পর এক সারিতে। মা-বোনদের কি বিরাট সেই কিউ ! সারাটা ময়দান এঁকেবেঁকে সেই লাইন দীর্ঘ। চমৎকার সুশৃঙ্খল। কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবক হাতে হাত মিলিয়ে পর পর তিন-চার সারির ব্যারিকেড করেছেন।

তখন খোয়াই পার্টি অফিসে

পার্টি অফিসের সামনে ফুল-মালা গেঁথে, কাস্তে-হাতুড়ি খচিত লাল ঝান্ডায় তৈরি মঞ্চ। স্বেচ্ছাসেবকরা ধীরে ধীরে শবাধার নিয়ে গেলেন

সেখানে। কি পরম যতন তাঁদের। কেঁদে কেঁদে চোখ ওদের লাল টকটকে। কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রিয় নেতার দিকে। কে একজন বলে উঠলেন কমরেড দেখবেন যেন টাল না খায়। হাজারো কণ্ঠে তখন শ্লোগান উঠে — 'জাতি-উপজাতি মানুষের সংহতি সেতু কমরেড দশরথ দেব অমর রহে।' হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেই জন কল্লোলিত শ্লোগান আছড়ে পড়েছিল চারদিকে। শোক-বিহ্বল শিল্পীরা গাইছিলেন 'আন্তর্জাতিক'। প্রিয়তম নেতার মরদেহবাহী শকটটি কাস্তে হাতুড়ি খচিত রক্ত পতাকায় ঢেকে দেন পার্টির বিভাগীয় সম্পাদক বিধায়ক সমীর দেব সরকার ও বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য বিশ্বজিৎ দত্ত। এরপর একে একে বিভাগীয় অঞ্চল কমিটির নেতৃবৃন্দ, হরিমোহন দেববর্মা, রানা বাহাদুর দেববর্মা, কালিকুমার দেববর্মা, হেমন্ত জমাতিয়া, কিরণমালা দেববর্মা, খঞ্জরী দেববর্মা প্রমুখ, বিভিন্ন গণ সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এবার সুশৃঙ্খল সারিতে জনতার শ্রদ্ধার্ঘ্য। সেই ভোর থেকে অপেক্ষমান তাঁরা। নানা রঙের ফুলের মালায় শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ওরা সবাই এসেছিলেন তুলাশিখর, প্রমোদনগর, আশারামবাড়ী, চাম্পাহাওর, বাচাইবাড়ী, সিঙ্গিছড়া, সোনাতলা, জাম্বুরা, তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। সংখ্যা দিয়ে জনস্রোতের আকুতি বোঝানো যাবে না। এমনি সময়ে নামল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি নামলেও সুশৃঙ্খল সেনানীরা জায়গা ছাড়েননি এক মুহূর্তের জন্যও। বেলা বারোটা থেকে দুটো অব্দি চলে জনতার মিছিল। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন ময়দান থেকে কয়েক সারিতে মানুষ এগিয়ে যান ধীরে ধীরে। নেতাকে শেষবারের মতো দেখতে। ভালবাসা আর শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটাতে।

আমপুরার উদ্দেশ্যে

এরপর যাত্রা শুরু আমপুরার দিকে। পেছনে বিশাল কনভয়। ত্রিপুরার ইতিহাসে আর কোন জননেতাকে মানুষ ঠিক এমনভাবে বিদায় জানাননি। শব্দহীন মিছিল এগিয়ে যাওয়ার পথে অতিক্রম করে চরগণকী। দু'পাশে অপেক্ষমান মানুষ। ২-২৫ মিনিটে পহরমুড়া বাজারে মিছিল ঢুকে। আবার বৃষ্টি কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজেই দু'পাশে দাঁড়িয়ে মানুষ। প্রকৃতিও হার মেনে যায় সংগ্রামে শাণিত চেতনার জনতার কাছে। এক সময় বিশাল কনভয় পেছনে ফেলে কুমারী-মধুতী-রূপশ্রী সেতু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কমরেড দশরথ দেবই এর উদ্বোধন করেছিলেন যা এপার-ওপার দু'পারের মানুষকে দিয়েছে যোগাযোগের সুবিধা।

দেড় ঘণ্টা পর সাড়ে তিনটায় মরদেহ আমপুরায় পৌছার সাথে সাথে চারিদিকে উঠে মা-বোনদের কান্নার রোল। কমরেড দশরথ দেবের অনুজ অরুণ দেববর্মার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এন এল এফ টি ঘাতক বাহিনীর অত্যাচারে তিনি স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। বুধবার 'দাদা'র মৃত্যুসংবাদ পেয়েও যিনি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। আজ বিকেলে দাদার নিথর নিস্তেজ দেহ দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেননি।

এদিকে চারটি খুঁটির ওপর ধূপ গাছের ডালপালায় তৈরি 'ফাইক্রা'। প্রধান পুরোহিত নবকুমার দেববর্মা উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রথায় শেষকৃত্যের আয়োজন করছেন। দেখা হলো পার্টির রামচন্দ্রঘাট অঞ্চল কমিটি সম্পাদক রতিরঞ্জন দেববর্মার। তিনি দেখছিলেন যাবতীয় কাজ; বললেন— চল্লিশ বছরের সংগ্রামের সাথী, 'কী হারিয়েছি— মূল্যায়ন করবে আগামীদিন'— কমরেড দশরথ দেবের দুই ছোট বোন শ্রীমতী দোপ্তি এবং শ্রীমতী পুস্তি দেববর্মা। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন ওরা পরিজনদের নিয়ে। সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। বাইজ্জা বাড়ির সুরেন্দ্র দেববর্মা (৭৮)। সাথী ছিলেন জনশিক্ষা

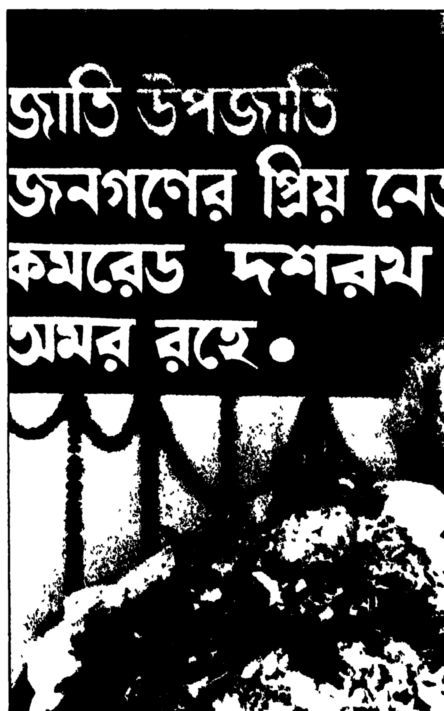
আন্দোলনের। বললেন, 'দাদা ছিলেন সংগ্রামের অনুপ্রেরণা।

বয়সের বোঝা যাঁকে এখনো কাবু করেনি জনশিক্ষা আন্দোলন ও গণমুক্তি পরিষদ গঠনের সময় থেকে কমরেড দশরথ দেবের ছায়াসঙ্গী জয়চন্দ্র দেববর্মা (৯৮)। আত্মগোপনের সময় পরিচিত ছিলেন জীবন নামে। বললেন, 'প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে।' তারপর কান্না ....

এভাবে হাজার হাজার মানুষ চিরবিদায় জানালেন— তাঁদের প্রিয় জননেতাকে। রাজন্য শাসন, দেওয়ানী শাসন, জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে অকুতোভয়— আপোষহীন জাতি-উপজাতি মানুষের প্রিয় নেতা কমরেড দশরথ দেবকে।

তোমায় ভুলছিনা ভুলব না ....

আমপুরার ময়দান তখন মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ। আগরতলায় সকাল ৮টায় যখন শেষযাত্রার শুরু আমপুরামুখী জনস্রোত আরম্ভ হয় তখনই। বড়মুড়ার কোলের বিভিন্ন জনপদ থেকে উপজাতি অংশের মানুষ আসতে থাকেন তাঁদের প্রিয় নেতাকে শেষ বার দেখতে। আমপুরা বাজার লাগোয়া কমরেড দশরথ দেবের বাড়ির পাশে তাঁদেরই পারিবারিক মাঠে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান মঞ্চ ঘিরে সে কি ভিড় ! প্রেস এবং পার্টি নেতৃত্বকে সেখানে ঢুকতে হিমসিম খেতে হয়। কনভয়বাহী মরদেহ আমপুরায় পৌছার পর কমরেড দশরথ দেবকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক হরকিষেন সিং সুরজিৎ, পলিটব্যুরো সদস্য বিনয় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক হেমেন দাস, পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, বামফ্রন্ট নেতৃত্ব, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা, পার্টির রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ অংশের মানুষ। সেখানেও জনতার ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয় স্বেচ্ছাসেবকদের। বিকেল সাড়ে চারটায় টি এস আর জওয়ানরা তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রীয় অভিবাদন জানায়। এর আগে আসাম রাইফেলস, সেনাবাহিনী, টি এস আর, পুলিশের পদস্থ পদাধিকারীরা শ্রদ্ধা জানান। প্রশাসনের পক্ষে শেষ শ্রদ্ধা জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক। বিউগলের করুণ সুর আর গণ কান্নার রোলে বাতাস তখন ভারি। এরই মধ্যে ফাইক্রায় (চিতা) তোলা হয় দশরথ দেবকে। আগুন জ্বালেন একমাত্র ছেলে রণজিৎ, ভাইপো রঞ্জু। জ্বলে উঠে ধূপ আমলকী আর কাঞ্চন কাঠের লাকড়ী। ইথারে ছড়িয়ে পড়ে হাজারো কণ্ঠের শ্লোগান কমরেড দশরথ দেব তোমায় মোরা ভুলছি না, ভুলব না।



রবীন্দ্রভবনে অন্তিম শয়নে দশরথ দেব
১৫-১০-৯৮ ইং

একজন অসাধারণ কমিউনিস্ট নেতার সমস্ত গুণ ছিল দশরথ দেবের ঃ পলিটব্যুরো

নয়াদিল্লী, ১৪ অক্টোবর ঃ কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেছে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো। এক শোক প্রস্তাবে পলিটব্যুরো বলেছে, মৃত্যুকালে কমরেড দশরথ দেব-এর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। কমরেড দেব ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উপজাতি জনগণের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন। আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

প্রস্তাবে বলা হয়, যে সব যুবকরা ১৯৪৫ সালে উপজাতি জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে জনশিক্ষা সমিতি শুরু করেছিলেন কমরেড দেব ছিলেন তাদের অন্যতম। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল ত্রিপুরার মহারাজার শোষণমূলক শাসনের বিরুদ্ধে উপজাতি জনগণের সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালে গঠিত হয় গণমুক্তি পরিষদ। দশরথ দেব এর সভাপতি। সংগঠন স্বৈরতান্ত্রিক রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ এই সময়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সশস্ত্র রাজন্য বাহিনীর প্রচণ্ড দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। এই সংগ্রামই কমরেড দশরথ দেবকে কিংবদন্তি পুরুষে পরিণত করে।

দশরথ দেব এবং গণমুক্তি পরিষদের গোটা নেতৃত্ব ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে তিনি প্রথম লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়ী হন। ১৯৫১ সালেই তিনি সি পি আই-র কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এবং তারপর তিনি সি পি আই (এম) গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৬৪ সালে, সপ্তম কংগ্রেসে গঠিত সি পি আই (এম) এর কেন্দ্রীয় কমিটিতেও তিনি নির্বাচিত হন। পার্টির ষোড়শ কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন। এখানে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে অবসর নেন।

ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টিকে গড়ে তোলা এবং তাকে সংহত করার জন্যে তিনি বেশ কয়েক দশক ধরে অক্লান্ত শ্রম করেছেন। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে কমরেড দশরথ দেব শিক্ষামন্ত্রী এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৯৩ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কমরেড দেব পার্টির রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। তিনি চারবার লোকসভায় নির্বাচিত হন।

প্রস্তাবে পলিটব্যুরো বলেছে, একজন অসাধারণ কমিউনিস্ট নেতার সমস্ত গুণ ছিল কমরেড দশরথ দেব-এর মধ্যে। তিনি জনগণের ও তাদের আশা-

তাঁর মৃত্যুতে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হলো। সমস্ত কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল জনগণ সর্বদাই তাঁর বিপ্লবী জীবন ও দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা নেবেন।

কমরেড দশরথ দেব-এর স্মৃতির প্রতি পলিটব্যুরো গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। তাঁর পত্নী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা এবং পুত্র ও কন্যাদের প্রতি জ্ঞাপন করছে আন্তরিক সমবেদনা। ●

[ডেইলি দেশের কথা]

শেষ শ্রদ্ধা জানালেন সুরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৫ই অক্টোবর ঃ আজ বিকেলে আমপুরা গ্রামে কমরেড দশরথ দেবের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, পলিটব্যুরোর অন্যতম প্রবীণ সদস্য বিনয় চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদ্বয় বিমান বসু ও অনিল বিশ্বাস, আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক হেমেন দাস এবং পার্টি ও গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সুরজিৎ আজই গুয়াহাটি থেকে হেমেন দাস সহ বিমানে আগরতলা আসেন এবং সোজা খোয়াই-র আমপুরা গ্রামে চলে যান। পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তপন চক্রবর্তী তাঁদের নিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটায় আমপুরা পৌঁছান। বিনয় চৌধুরী, বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস প্রমুখ মরদেহের সঙ্গেই সকালে খোয়াই চলে যান। সুরজিৎ কমরেড দশরথ দেবের স্ত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেবী ও অন্য আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গভীর সমবেদনা জানান।

[ডেইলি দেশের কথা]



প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের মরদেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন অগণিত শোকাহত মানুষ। ১৫ অক্টোবর, '৯৮ নিজগ্রাম খোয়াইয়ের আমপুরায় তোলা ছবি

লোকসভায় একসাথে ছিলাম — রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৪ ই অক্টোবর ঃ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। তিনি প্রয়াত নেতার পরিবার-পরিজনদেরও সমবেদনা জানান। দশরথ দেব-এর পত্নী শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার কাছে পাঠানো এক শোক বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, এই মৃত্যু ত্রিপুরার জনগণের বিরাট ক্ষতির পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত ক্ষতিও বয়ে এনেছে। আমরা লোকসভায় একসাথে ছিলাম।

দশরথ দেব এর স্মৃতিচারণা করে রাজ্যপাল বলেছেন, তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত ও নিঃস্বার্থ এক কর্মী। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী থেকে উঠে এসে সমাজের সকল অংশের জনগণের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে গেছেন।

[ডেইলি দেশের কথা]

এক নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে হারালাম — মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকার এক শোকবার্তায় বলেছেন, "দশরথ দেব ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক এবং ত্রিপুরার গণসংগ্রামের ইতিহাসে এক জনবরেণ্য অবিসংবাদী কিংবদন্তি নেতা। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি জনজাগরণের, সংগ্রামের ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি ও প্রাণপুরুষ।

শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে, সামন্ততন্ত্রের রুদ্ররোষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জনশিক্ষা আন্দোলন প্রসারে, স্বাধীন ভারতবর্ষের গণ সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশে জাতি-উপজাতি জনগণের মধ্যেকার সম্প্রীতির সেতুবন্ধে, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের একতা সংহতি সুদৃঢ় করতে এবং ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির সংগ্রামে অকুতোভয়ে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দশরথ দেব যোগ্য সংগঠক ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

জনস্বার্থ, দেশের স্বার্থ ও বিশেষ করে ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে লোকসভায় দশরথ দেবের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

শিক্ষা ও উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করে গেছেন।

জনবরেণ্য এই মহান দেশপ্রেমিক নেতার প্রয়াণে আমরা এক নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে হারালাম।

তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

তাঁর সংগ্রামী কর্মময় জীবনধারা আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।"

[ডেইলি দেশের কথা]

রাজ্যের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিক্রিয়া

সমীররঞ্জন বর্মণ (বিরোধী দলনেতা) ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট জননেতা দশরথ দেব প্রয়াত হয়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং আমি সুনিশ্চিত যে রাজ্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

যেভাবে একটি দরিদ্র উপজাতি পরিবারের মানুষ হয়েও দশরথ দেব রাজ্যের শিক্ষাঙ্গণে এবং রাজনীতিকে আলোকিত করেছেন— তা স্মরণীয়। চারবারের লোকসভা সদস্য এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত দেবের সাথে আমাদের রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের পার্থক্য ছিল। তথাপি প্রয়াত বর্ষীয়ান এই জননেতার প্রতি আমি সব সময়ই ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। আমি প্রয়াত দেবের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মুরারিমোহন সাহা (আর এস পি রাজ্য সম্পাদক) ঃ শ্রদ্ধেয় কমরেড দশরথ দেব এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কিংবদন্তি পুরুষ। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার সংগ্রামী ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি হলো বলা যায়। জাতি-উপজাতি ঐক্যের প্রতীক এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো— তা সহজে পূরণীয় নয়। আজকের অস্থির পরিবেশে তাঁর সংগ্রামী জীবনকে সামনে রেখে শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। শুধু এভাবেই আমরা তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

সুনীল দাশগুপ্ত (সি পি আই রাজ্য পরিষদ সম্পাদক) ঃ রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে তা সহজে পূরণ হবে বলে মনে হয় না। আজকের জটিল পরিস্থিতিতে যখন তাঁর খুব বেশি প্রয়োজন ছিল — তখনই তিনি চলে গেলেন। সি পি আই রাজ্য পরিষদ তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বিজয়কৃষ্ণ রায় (ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য সম্পাদক) ঃ আজীবন সংগ্রামী মহান নেতা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেবের অকাল মৃত্যুতে আমি এবং আমার পার্টি গভীর মর্মাহত। তাঁর নিরলস সংগ্রাম এবং আদর্শ ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী মানুষের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

প্রদেশ কং (ই) সভাপতি গোপাল রায় ঃ দশরথ দেব ছিলেন ত্রিপুরার রাজনীতি প্রবাদ-পুরুষ। তিনি ছিলেন জাতি-উপজাতি মানুষের প্রিয় নেতা। সুমহান এই নেতার মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে

— তা অদূর ভবিষ্যতে পূরণ হবার নয়। আমি তাঁর মৃত্যুতে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিজনদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

টি ইউ জে এস সভাপতি রতিমোহন জমাতিয়া ঃ দশরথ দেব শুধু উপজাতি মানুষের নেতা নন, তিনি ছিলেন রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষের প্রিয় নেতা। আজীবন কমিউনিস্ট এই নেতার সাথে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৫৫ সালে। রমেশ স্কুলে পড়ার সময় তাঁর নেতৃত্বে জনশিক্ষা আন্দোলনের অভূতপূর্ব ভূমিকার কথা শুনে আমি আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হই। দশরথ দেব, বীরেন দত্ত, সুধন্বা দেববর্মারা ছিলেন আমাদের অভিভাবক। '৬৪ সালে পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবার পর ১৯৬৭ সালে আমি যুব সমিতির সাথে যুক্ত হই। জোট সরকারের সময় আমি উপাধ্যক্ষ ছিলাম। যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি তাঁর কাছে ছুটে যেতাম পরামর্শ নিতে। জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শান্তিকামী মানুষের প্রিয় নেতা দশরথ দেবের কাছে আমাদের অনেক 'দেনা' রয়েছে। তাঁর ও পরিজনদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বি জে পি রাজ্য সভাপতি ডাঃ এইচ এস রায়চৌধুরী ঃ আমরা শোকগ্রস্ত। দশরথ দেব ছিলেন একজন বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার রাজনীতির যেমন ক্ষতি হলো— তেমনি জাতি-উপজাতি অংশের মানুষ হারালেন এক মহান রাজনীতিবিদকে।

বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (সি পি আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) ঃ সারাজীবন ধরে দেখছি। খোয়াই বয়েজ স্কুলের ছাত্রাবাসে একসঙ্গে ছিলাম। জনশিক্ষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শিক্ষা সম্প্রসারণে সচেষ্ট ছিলেন। সার্বিক গুণাবলী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। নিপীড়িত মানুষের উন্নয়নে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। পার্টি কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে তাঁর ভূমিকা বিরাট। শোষিত মানুষকে তাঁর নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের গণ-আন্দোলনে ক্ষতি হয়েছে। তবে এই ক্ষতিপূরণে আমাদের আন্তরিক হতে হবে। সম্প্রীতি রক্ষা করে তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে হবে।

রঞ্জন রায় (সি পি আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) ঃ সকালে রেডিও'র মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনি। তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতেন। তাঁর মৃত্যু ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি নক্ষত্র পতনের সামিল। অসুস্থ হলেও তাঁর উপস্থিতিই ছিল আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। উপজাতিরা তাঁকে পথপ্রদর্শক বা লাম্প্রা হিসেবে জানতেন। তাঁর মৃত্যু পার্টি ও গণ আন্দোলনের এক অসামান্য ক্ষতি। তবে আমরা কমিউনিস্টরা কখনো পিছু হটি না। সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে করি না। এই ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারব বলে মনে করি।

কামিনী ঠাকুর সিংহ (সি পি আই (এম)-এর প্রাক্তন বিধায়ক) ঃ উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিরাট। এই আন্দোলনে উপজাতিদের সামিল করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজ্যবাসী বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, কারণ তিনি ছিলেন অত্যাচারিত মানুষের বিরাট বন্ধু। গণ আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি। তবে কমিউনিস্ট পার্টি এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে। কারণ পার্টি এখন যথেষ্ট পরিণত। দশরথ দেব-এর মৃত্যু একটি ইতিহাসের সমাপ্তি। উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিকাশের একটি অধ্যায় হলো তার গোটা জীবন।

যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক) ঃ একটি রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি। পিছিয়ে

পড়া উপজাতিদের জনজাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

অরুণ কর (প্রাক্তন জোট মন্ত্রী) ঃ রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে। তবে একথা বলতে পারি তিনি এক বিরাট এবং বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। শোকপ্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের সকলের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। তাঁর কর্মকৃতির ফলেই জাতি-উপজাতির একতা ও সংহতি একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। উগ্রবাদীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবেও তিনি সফল ছিলেন। আমি প্রধানশিক্ষক থাকাকালে তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট এবং আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি।

যতীন্দ্রমোহন বণিক (প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) ঃ তিনি ছিলেন প্রকৃষ্ট স্তরের একজন রাজনীতিবিদ। মানুষের আর্থিক-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তিনি ছিলেন আন্তরিক। তিনি মনে করতেন সম্প্রীতি ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সনৎকুমার দে (খোয়াই-র প্রবীণ নাগরিক) ঃ তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে অবিশ্বাস্য। রাজ্যবাসীর বিরাট ক্ষতি। এই ক্ষতি রাজ্যবাসী কাটিয়ে উঠতে পারবে না। তাঁর কর্মজীবন এক বিরল ইতিহাস।

শশীমোহন দেবসরকার ঃ (খোয়াই শহরের প্রবীণ নাগরিক) ঃ ব্যক্তিগত ভাবে শোকপ্রকাশ করি। আমার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

কালীপদ পাল (খোয়াই-র প্রবীণ ব্যবসায়ী) ঃ ত্রিপুরার উন্নয়নে নতুন দিগন্ত সূচনা করেছিলেন তিনি। ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের তিনি ছিলেন কাছের মানুষ। শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

মাখনলাল চক্রবর্তী (পার্টির খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য) ঃ তিনি ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাজের ফলেই দেশের মধ্যে ত্রিপুরা মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে। তিনি নিজেই একটি ইতিহাস। নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখেছেন।

[ডেইলি দেশের কথা]



দার্জিলিং-এ টাইগার হিলের সামনে দশরথ দেব। সঙ্গে অনিরোধ দাস, আপ্ত-সহায়ক

দশরথ দেব ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে

অশোক ভট্টাচার্য

বিধানসভায় ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল — এই সময়টাতেই আমি তাঁকে পেয়েছি অনেক কাছাকাছি। তখন আমি বিরোধী দলনেতা। খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা। এমন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান ত্রিপুরার কোন অ্যাসেম্বলীতে আমি পাইনি। সভার মধ্যে আলোচনা-বিতর্কের সময় ওঁর কথা বলার ধরন, সরস মন্তব্য — এসব শুনে মনে হতো একটা জীবন্ত পরিবেশে বসে আছি। আমাদের সাথে বয়সের ফারাক ছিল অনেক, কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গী এতটাই সুন্দর ছিল- রাজনৈতিক আক্রমণ, তির্যক মন্তব্য, সে খোঁচাও উপভোগ করতাম। তাঁর হাতে শিক্ষা দপ্তর ছিল। অনেক সময়ই আমাদের অভিযোগ থাকত। আমরা সেসব বিধানসভায় তুলেছি। কোন কোন সময় অভিযোগ উত্থাপনেও শ্লেষ মাখানো কথাবার্তা হয়ে যেতো। কিন্তু দশরথ দেব কখনো ওভাবে নেননি। উনি নিজে আমাদের অভিযোগের নোট নিতেন। খুব ক্বচিৎ শতকরা একটা বা দুটো ছাড়া সব অভিযোগ সমস্যার প্রতিকার পেয়েছি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের প্রতি মর্যাদা, সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে তিনি এতটাই সজাগ ছিলেন। আমরা অনেক সময় শালীনতার মাত্রা ঠিক রাখতে পারিনি। তিনি কিন্তু শালীনতার নিচে নামেননি। কখনো না। তাঁর সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল আমাদের। কিন্তু তাঁর গুণাবলী আমাদের আকৃষ্ট করেছে। আজ তিনি নেই বলে বলছি না। বহুবার, অনেককে বলেছি, দশরথ দেবের মতো পার্লামেন্টারিয়ান অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানিনা। তিনি উপজাতি পরিবারে জন্মেছিলেন— কিন্তু তাঁর মুখে এমন কোন কথা বা ব্যবহারে এমন কিছু পাইনি যাতে কোন অনুপজাতি আঘাত পেতে পারে। গণতান্ত্রিক উন্নত মানসিকতায় ভরপুর ছিলেন দশরথ দেব। তাঁর মৃত্যুতে আমরা যে কত বড় মাপের পার্লামেন্টারিয়ান হারালাম তা চিন্তা করা যায় না। শত শত বছর তাঁকে মানুষ মনে রাখবে।

ডাঃ নীলমণি দেববর্মা

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ডাঃ নীলমণি দেববর্মা বলেন— ত্রিপুরার 'মুকুটহীন রাজা' দশরথ এর সাথে আমার প্রথম দেখা ১৯৪০ সালে আগরতলা ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস-এ। তখন তিনি ক্লাশ সেভেনের ছাত্র। বোর্ডিং-এ থেকে স্টাইপেন্ড নিয়ে উমাকান্ত একাডেমীতে পড়তেন। আমি তখন ক্লাশ থ্রিতে। উমাকান্তের বোর্ডিং-এ থেকে পড়ি। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল আকর্ষণীয়। কথা বলার ভঙ্গি, চাহনি, হাসি-হাত নাড়া সবই অন্যকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করত। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সহজ-সরল অথচ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চলাফেরা— ভোলা যায় না।

ডাঃ দেববর্মা বলেন— স্কুল জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলিতে

নিজের ঘরের চাল এনে নিজের খরচে বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করতে চেয়েছিলেন কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র। বোর্ডিং-এর সুপার রাজী হলেন না। দশরথদা সুপারের ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হলেন, সেজন্য বোর্ডিং থেকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করল। মাথা নত করলেন না দশরথদা।

ডাঃ দেববর্মা বলেন— ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ত্রিপুরার সব নেতারা জেলে। দশরথদা আন্ডারগ্রাউন্ডে। কলকাতা থেকে ডাঃ বি কে বসু এলেন ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য। দশরথদা আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। তারপর ত্রিপুরা ও ভারতের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি নাটকীয় ভাবে দিল্লীতে সংসদ ভবনে, সংসদের অধ্যক্ষের সামনে হাজির হলেন। সংসদেও তিনি নানাভাবে নিজের প্রতিভা এবং মেধার স্বীকৃতি পেয়েছেন। হাউসের পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। এর সুবাদে নানা প্রদেশে ঘুরে কাজ করার এবং অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

ডাঃ নীলমণি দেববর্মা বলেন — দশরথদা জাতি-উপজাতির মিলিত প্রয়াসে বিশ্বাসী ছিলেন। দশরথদার নেতৃত্বে তাঁর অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুপজাতিদের সক্রিয় সহযোগিতায়, সকলের মিলিত জোরালো আন্দোলনের ফলে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। দশরথদার অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

জাতি-উপজাতির ঐক্যবদ্ধ মিলিত চেষ্টায় সব সমস্যারই সমাধান সম্ভব— এই বিশ্বাস দশরথদার ছিল এবং এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। সব সমাধান এখনো হয়নি। অনেক কাজ বাকী। ঐক্য ও সম্প্রীতির মধ্যে তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের এগোতে হবে।

শ্যামাচরণ ত্রিপুরা

উপজাতি যুব সমিতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা বলেন, প্রয়াত দশরথ দেব বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা অনেকেরই সাহস হয় না। তর্ক করা তো অনেক দূরের কথা। কেউ যদি সাহস করে তর্ক করতেও চায় তাঁর যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য। সে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষা যাই হোক না কেন। এই গুণাবলীর জন্যই তিনি উপজাতি সমাজে এক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এমনই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। ত্রিপুরায় জন্ম না হয়ে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে জন্ম হলে তিনি একজন জাতীয় নেতা হতেন।

এক নাগাড়ে অর্ধ শতাব্দী ধরে জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা অনেক নেতার কপালেই জোটে না। সেদিক থেকে আমাদের দশরথ দেব অবশ্যই অনন্য। ১৯৪৫ থেকে '৯৮ — তাঁর জনপ্রিয়তা, বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। অবশ্য লোকসভার নির্বাচনে দুই বার হেরেছিলেন। সেটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে মহারাজা কিরীট বিক্রম প্রার্থী হওয়ায় অনেকেই রাজভক্তি দেখাতে ভোট দেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। আমি নিজেও নেহাতই instinct বশতঃ মহারাজাকে ভোট দিই, কংগ্রেস বলে নয়।

১৯৮৩ থেকে '৮৭ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছর বিধানসভায় আমি দশরথ দেবকে পাই। ঐ সময় তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করেছিল। খুব সহজে উত্তেজিত হয়ে যেতেন। আমরা উপজাতি যুব সমিতির ছয়জন বিধায়ক সতর্ক ছিলাম যাতে আমাদের বক্তব্যে উনি উত্তেজিত না হন। উত্তেজিত

হলে ওঁর শরীর খারাপ হতো, এই কারণে। এটা একপ্রকার আনুগত্য এবং ব্যক্তিত্বের কারণে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না।

বৃটিশ ভারতে যে কোন রাজন্যশাসিত রাজ্যেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা তাও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। তারপর গোটা উপজাতি সমাজ ছিল নিরক্ষরতার ঘোর অন্ধকারে। ঐ সময় জনজাগরণ ঘটানো জাদুটোনা থেকেও বেশি বিস্ময়কর ছিল। সেটা সম্ভব হয়েছে প্রয়াত দেবের অপূর্ব জনপ্রিয়তা, বাগ্মিতা এবং ব্যক্তিত্বের কারণে।

যশোদা দেববর্মা, বিরজা দেববর্মা

মগলাম বাড়ি, খোয়াই — দশরথ দেব মগলামবাড়িতে আসতেন। তিনি তখনো আত্মগোপনে। তাঁর মাথার দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা। গ্রামে গ্রামে স্কুল চাই — এই শ্লোগানে জনশিক্ষা আন্দোলন চলছে চারিদিকে। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় মিলিটারীরা। বাধ্য হয়ে আমরা আশ্রয় নিই গভীর জঙ্গলে। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল মিলিটারী ক্যাম্প। বীরচন্দ্র দেববর্মা, জীবন দেববর্মা, ভাদ্রমণি দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা— প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধরা পড়ে যায় মিলিটারীর হাতে। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উপর খুব অত্যাচার করে মিলিটারীরা। তখন আমরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছে দিতাম। চিঠি লিখে দিতেন দশরথ দেব। বাঁশের চোঙের মধ্যে চিঠি ঢুকিয়ে সে চিঠি আমরা বয়ে বেড়াতাম। চোঙ-এর মাথায় থাকত একটা করে মরিচ। শুকনো লঙ্কা। মরিচ বাঁধা থাকলেই বোঝা যেত চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিঠি পড়া হয়ে গেলে তা পুড়িয়ে ফেলা হতো। বিভিন্ন স্থানে দশরথ দেবকে লুকিয়ে রাখতেন গ্রামবাসী। এমন কি গর্ত খুঁড়েও তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

তাঁরা বললেন— সামরিক শাসনের পর প্রকাশ্যে মিছিল মিটিং হতে শুরু করে। তুলাবাড়ি থেকে গানের স্কোয়াড নিয়ে আমরা একবার একটানা কয়েক দিনের মিছিলে হাঁটতে শুরু করি। রাতযাপন করতে হয় বড়মুড়া পাহাড়ে। আশারাম বাড়ি চাম্পাহাওরের কমরেডরাও ছিলেন আমাদের সাথে। মনে পড়ে তখনো মিলিটারীরা আমাদের কাছে জানতে চাইতো দশরথ কোথায় আছে ?

১৯৫২ সালে ভোটের প্রচারেও আমরা গানের দল নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছি। দশরথ দেব সামনাসামনি নেই। কিন্তু সমস্ত ভোটের প্রচার চলছিল তাঁর নির্দেশে। নারী নেত্রীরা বলেন— মাঝে মাঝে গোপন সভায় আসতেন দশরথ দেব। নারী স্বাধীনতা, সব কিছুতে তাদের সমানভাগের বিষয় খুব সহজ-সরল ভাষায় বোঝাতেন। বলতেন— ঘরে ঘরে এই কথাগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা দরকার। কর্মীদের খুবই ভালবাসতেন দশরথ দেব। তবে ভীষণ কড়া ছিলেন। বিশৃঙ্খলা একদম পছন্দ করতেন না। আমরা প্রা... সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করতাম।

খঞ্জনী দেববর্মা

আমার কাকাবাবু প্রয়াত কমরেড রজনী দেববর্মার মাধ্যমেই ১৯৪৮ সালে দশরথ দেবের সাথে পরিচিত হই। আমি তাঁকে কাকা বলে সম্বোধন করতাম। উনি আমাদের বাড়ি আসতেন। রাতের বেলা। চলে যেতেন কাকভোরে, অন্ধকার থাকতেই। সেই ছোটবেলা থেকেই দশরথ দেবের চিঠি বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়ার কাজ শুরু করি। চুলের খোঁপায় গুঁজে চিঠি দিতাম। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতেন দশরথ দেব। এতটুকু ক্লান্ত হতে দেখিনি। কর্মীদের প্রতি তাঁর মনে ছিল দরদ।

জাতি-উপজাতির মৈত্রী ও ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের প্রতি তিনি জোর দিতেন সবসময়।

তরুবালা দেববর্মা

প্রধান, লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েত

১১ পৌষ — সন্ধ্যায় আমাদের এলাকার বাড়ি বাড়ি প্রদীপ জ্বেলে জনশিক্ষা দিবস পালন করা হতো অনেক আগে থেকেই। সেই সন্ধ্যায় মুখে মুখে আলোচনা হতো দশরথ দেবের নাম। খাদ্যের দাবির আন্দোলন, লেভীর জুলুমের আন্দোলনে— দশরথ দেবের আহ্বানে গ্রাম উজাড় করে মানুষ সামিল হতেন। তিনি গরীব মানুষের একতার উপর জোর দিতেন বরাবর।

রঞ্জনী দেববর্মা

নারী সমিতির রামচন্দ্রঘাট অঞ্চল কমিটি

রাজতন্ত্র ও তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে সমগ্র উপজাতি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে দশরথ দেবের নেতৃত্ব ছিল বলিষ্ঠ। তিনি উপজাতি সমাজে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হন। জনশিক্ষা আন্দোলনের ফলে সে কাজ দ্রুত হয়। এখন যতটুকুই শিক্ষাদীক্ষার প্রকাশ ঘটেছে উপজাতি এলাকায়— তার পেছনে দশরথ দেবের অবদান কেউ কি অস্বীকার করতে পারে ? শেষ দিকটায়, ৮০ সালের দাঙ্গার পর থেকে তিনি ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে খুব আহত হতেন। তিনি বলতেন — উপজাতি যুবকরা যাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে বন্দুক হাতে নিয়েছে— তারা সবচাইতে বেশি ক্ষতি করছে উপজাতিদেরই। এর ফলে উপজাতিদের উন্নয়নের কর্মসূচী পিছিয়ে যাচ্ছে। এরকম চললে চরম সর্বনাশ হবে। ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতির মানুষ এক হয়ে ছিলেন, এভাবেই তাঁদের চলতে হবে।

[ডেইলি দেশের কথা ২১-১০-৯৮]



মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী এবং জি এম পি-র শোক

ঐক্য সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ, এ রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি ও শিক্ষক, সর্বজনশ্রদ্ধেয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা ও রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব-এর জীবনাবসানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী কমরেড দশরথ দেব-এর মহান স্মৃতির প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা ও পুত্র-কন্যাদের প্রতি জানিয়েছে গভীর সমবেদনা। পার্টি এই মহান কমিউনিস্ট বিপ্লবীর প্রতি রক্তিম অভিবাদন জানিয়ে সারা রাজ্যে তিনদিনের জন্য লাল পতাকা অর্ধনমিত করেছে।

এক বিবৃতিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী বলেছেন — কমরেড দশরথ দেব খোয়াই-এর এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খোয়াই, আগরতলা ও হবিগঞ্জে প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতক স্তর অবধি শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং কলকাতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ অসমাপ্ত রেখে রাজ্যের নিরক্ষর পশ্চাৎপদ ও শোষিত উপজাতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি গঠন করে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের গৌরবময় সংগ্রাম পরিচালনা, কুসংস্কার ও রাজন্য শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনজাগরণ সৃষ্টিতে, গণমুক্তি পরিষদ গঠন ও স্বাধীনোত্তর কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনায় কমরেড দশরথ দেব জনপ্রিয় শীর্ষ নেতা হিসেবে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে সি পি আই (এম) - এর নেতা হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতাকাতলে উপজাতি-অনুপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই ঐক্যকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার সংগ্রামে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ত্রিপুরার ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৫১ সাল থেকে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন সদ্য সমাপ্ত ষোড়শ কংগ্রেস পর্যন্ত। পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক হিসেবে জোট আমলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও তিনি নেতৃত্ব দেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। উগ্র উপজাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াইয়ে তিনি ছিলেন ঐক্য-সম্প্রীতির স্তম্ভস্বরূপ। সংসদে ত্রিপুরার উন্নয়ন তথা উপজাতি জনগণের স্বশাসনের অধিকারের দাবীতে তাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। তেমনি প্রথম - দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে, রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কমরেড দশরথ দেব-এর প্রয়াণে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আমরা শোষণহীন সমাজ গঠনে কমরেড দশরথ দেব-এর আরব্ধ কাজ এগিয়ে নেবার শপথ গ্রহণ করছি — আজীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এবং তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দ এ রাজ্যের জাতি-উপজাতি জনগণের যে ঐক্য গড়ে তুলেছেন— তাঁকে ভাঙবার সমস্ত অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করব। আমরা আবার তাঁর স্মৃতির প্রতি লাল সেলাম জানাই। কমরেড দশরথ দেব — অমর রহে।

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি কমঃ দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, কমঃ দশরথ দেবের মৃত্যুতে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ শুধু তার সভাপতিকে হারাল না, ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাদের একজন উজ্জ্বল নেতৃত্বকে এবং ত্রিপুরাবাসী তাদের একজন পরম নির্ভরশীল অভিভাবককে হারালেন।

১৯৪৫ সালে তাঁর নেতৃত্বেই 'জনশিক্ষা সমিতি' জন্ম নিয়েছিল যা শুধুমাত্র এই রাজ্যে নয়— গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম সংগঠিত জনশিক্ষা আন্দোলন। জনশিক্ষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। গড়ে উঠে 'ত্রিপুরা মুক্তি পরিষদ' এবং তা থেকে 'ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ'। রাজতন্ত্রের অবসানে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং পরবর্তীকালে ত্রিপুরা রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশে পুরোধা ছিলেন কমঃ দশরথ দেব। বাম আন্দোলনের একজন অবিসংবাদী নেতা, সুদক্ষ প্রশাসক, জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের সামগ্রিক বিকাশের একজন অগ্রণী কর্মী এবং রাজ্যের উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের একজন উজ্জ্বল পথ-প্রদর্শক হিসেবে কমঃ দশরথ দেবের নাম চির অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আজ এমন সময়েই তাঁকে আমরা হারালাম যখন একাংশ যুবক ভুলপথ অনুসরণ করে এই রাজ্যের অগ্রগতি, ঐক্য ও ঐতিহ্য সব ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য কমঃ দশরথ দেব আমৃত্যু যে লড়াই করে গেছেন সেই অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ কমঃ দশরথ দেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁর সকল সহযোদ্ধা, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু সকলের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

[ডেইলি দেশের কথা]

রাজ্যে নারী আন্দোলন বিকাশে তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শ ভুলবার নয়

গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব, জাতি-উপজাতি মানুষের মিলনের সেতু কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে এক বিশাল কর্মময় জীবনের অবসান ঘটলো।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সভানেত্রী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা ও পরিবার পরিজনদের প্রতি জানাচ্ছে গভীর সমবেদনা।

কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে রাজ্যের খেটে খাওয়া জাতি-উপজাতি শান্তিকামী গণতান্ত্রিক জনগণ একজন নির্ভরশীল অভিভাবককে হারালো।

কমরেড দশরথ দেবের নেতৃত্বে জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠী রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করেছিল, সেটাই পরবর্তীকালে দুর্বার গণআন্দোলনের রূপ নেয়। সমস্ত রকম সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনজাগরণ সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ সংঘটিত হয় 'তিতুন' প্রথা সহ নানা ধরনের সামাজিক অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে রাজ্যের উপজাতি নারী সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রয়াত কমরেড দশরথ দেব বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই প্রচেষ্টায় রাজ্যে জাতি-উপজাতি উভয় অংশের নারীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠে, 'গণতান্ত্রিক নারী সমিতি'।

রাজন্য শাসন অবসানের পরের দীর্ঘ সময়ে রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল নেতৃত্ব ও পরামর্শ বারে বারে সাহায্য করেছে।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক নারী সমাজ এ কথা কোনদিনই বিস্মৃত হতে পারবে না। তাঁর মৃত্যুতে আজ যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, তা অপূরণীয়। গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রাজ্যের প্রতিটি সংগঠনের কর্মীর কাছে আহ্বান রাখছে— কমরেড দশরথ দেবের স্বপ্ন— জাতি-উপজাতি ঐক্যকে সুদৃঢ় করার শপথ নিন, তবেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা বৃন্দা কারাত পৃথক এক তারবার্তায় বিপ্লবী নেতা কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মার প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করে বলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জনশিক্ষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিপুরায় শোষিত বঞ্চিত এবং পিছিয়েপড়া জনগণের সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন কমরেড দশরথ দেব।

সারাভারত যব লীগের রাজ্য কমিটি শোকবার্তায় দশরথ দেবকে মেহনতী মানুষের সংগ্রামের বীর সেনানী ও রাজ্যের জাতি-উপজাতি জনগণের মিলনের প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়। ত্রিপুরা ল্যাম্পস্ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি তাদের শোকবার্তায় দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের সমবেদনা জানিয়েছে। ত্রিপুরা গভঃ আয়ুর্বেদিক ডক্টরস্ এসোসিয়েশন থেকে বলা হয় কমরেড দশরথ দেব ছিলেন রাজ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা নেতা। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করে গেছেন জাতি-উপজাতি মৈত্রী এবং দরিদ্র ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণে।

[ডেইলি দেশের কথা]

শোকবার্তা ঃ সারা দেশ থেকে

সি আই টি ইউ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

সি আই টি ইউ'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী এক শোকবার্তায় বলেছে ত্রিপুরার গণ আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তিনি ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। ব্রিটিশ-বিরোধী রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে উপজাতি জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এবং জাতি-উপজাতির উভয় অংশের জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান চিরকাল স্মরণে থাকবে এবং আমাদের সকলের কাছে তা নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে।

সি আই টি ইউ এই মহান নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করার পাশাপাশি তাঁর অসমাপ্ত সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করছে।

সি পি আই জাতীয় কার্যনির্বাহী

কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি পি আই-র জাতীয় কার্যনির্বাহী এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন।

সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদারের কাছে লেখা শোকবার্তায় এ বি বর্ধন বলেছেন, কমরেড দশরথ দেব ত্রিপুরার বামপন্থী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি শ্রমজীবী জনগণের বিশেষ করে উপজাতি জনগণের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য লড়াই করে গেছেন। সরকারী এবং দলীয় স্তরে বিভিন্ন পদে থেকে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন আমরা তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। কমরেড দেবের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ত্রিপুরার বামপন্থী আন্দোলন এগিয়ে যাবে।

সি পি আই (এম) পঃ বঙ্গ রাজ্য কমিটি

ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্ত কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন— "ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এবং দেশের উপজাতিদের স্বাধিকার রক্ষায় লড়াইয়ের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব, সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন অনন্য কমিউনিস্ট নেতাকে হারালো। আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ হতে কমরেড দেবের মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করছি এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্য সহ ত্রিপুরার সকল সদস্য, অনুরাগী ও শ্রমজীবী জনগণকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।"

সি পি আই (এম) বিহার রাজ্য কমিটি

সি পি আই (এম) বিহার রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্পাদক গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী কমরেড দশরথ দেবের জীবনাবসানে এক শোকবার্তায় গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিহারে সর্বত্র পার্টির পতাকা দু'দিন অর্ধনমিত থাকবে। শোকবার্তায় বিদ্যার্থী বলেছেন, এই প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা তাঁর সহযোগী কমরেডদের নিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করেন গণমুক্তি পরিষদ স্থাপনের মাধ্যমে। তাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি অংশের মানুষ, সি পি আই (এম)-এর সাথে সন্ত্রাসবাদী এবং বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় সংবিধানের ৬নং ধারা অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেন। ত্রিপুরার বুকে সি পি আই (এম) এর ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

সি পি আই (এম) বিহার রাজ্য কমিটি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে এবং শোকাহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

সুশীলা গোপালন

সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেবের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন কেরালার এল ডি এফ সরকারের শিল্প ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সুশীলা গোপালন। পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মজুমদারের কাছে লেখা শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, পার্টি এবং দেশের বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং পার্টির নেতা হিসাবে তিনি ত্রিপুরাকে প্রগতির পথে নিয়ে গেছেন। পেছনে পড়া জনগণের উন্নয়নে তিনি বিরাট অবদান রেখে গেছেন, পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যেও তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য রেখে গেছেন। সুশীলা গোপালন প্রয়াত কমরেডের পরিবার-পরিজন ও রাজ্যবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা

দেশের অন্যতম কৃষক নেতা, ত্রিপুরার প্রবাদপ্রতিম মানুষ এবং উপজাতি কৃষক জনগণের জীবন-জীবিকার সংগ্রামের প্রতীক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড দশরথ দেবের দেহাবসানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত।

পরাধীন ভারতে, ১৯৪৫ সালে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্মার রাজত্বকালে উপজাতি জনগণের সচেতন ও সাক্ষর করার অভিযান থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য ‘মুক্তি পরিষদ গঠনের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। সামন্ততান্ত্রিক ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনই ছিল গণমুক্তি পরিষদের প্রধান লক্ষ্য। অ উপজাতি মানুষদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলে আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে— যার প্রধান সংগঠক ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই তাঁর জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায় লোকসভায় বিজয়ী হবার মধ্য দিয়ে। সারা ভারত কৃষক সভার মেগা সম্মেলনে ১৯৫৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় কিষান কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরের বছর ১৯৫৫ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের আমন্ত্রণে সারা ভারত কৃষক সভার তিনি ছিলেন

অন্যতম প্রতিনিধি। কমরেড দশরথ দেব আমৃত্যু শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক জনগণ এবং শোষিত মানুষদের অকৃত্রিম বন্ধু, একান্ত আপনজন ও নেতা।

কমরেড দশরথ দেব ছিলেন আমাদের রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের কাছে এক প্রেরণা। তাঁর দেহাবসানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

সি পি আই (এম) মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটি

কমরেড দশরথ দেব-এর প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে পার্টির মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটি। সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদকের কাছে পাঠানো শোকবার্তায় মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটি বলেছে, তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী জীবন, জাতির জন্য আত্মত্যাগ ও সেবা, প্রায় পাঁচ দশকের পার্টি জীবন গোটা দেশের পার্টি সদস্যদের অবিরাম অনুপ্রাণিত করবে।

সি পি আই (এম) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটি

দেশের অন্যতম অসাধারণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে সি পি আই (এম) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটি গভীরভাবে মর্মাহত। এক শোকবার্তায় রাজ্য কমিটি বলেছে, ত্রিপুরা তথা দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর অবদান সমস্ত কমিউনিস্টদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সি পি আই (এম) তামিলনাড়ু রাজ্য কমিটি

কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে তামিলনাড়ু শাখা। ত্রিপুরার জনগণ ও পার্টি কমরেডদের প্রতিও জানিয়েছে আন্তরিক সমবেদনা।

সি পি আই (এম) কর্ণাটক রাজ্য কমিটি

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ সি পি আই (এম) নেতা কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সি পি আই (এম) কর্ণাটক রাজ্য কমিটি। কমিটি শোকবার্তায় বলেছে, তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারাল শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে সংগ্রামের এক মহান যোদ্ধাকে। কমরেড দশরথ দেব-এর প্রতি আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ শোক জ্ঞাপন করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং ত্রিপুরার জনগণ ও পার্টি সদস্যদের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সারাভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন

সারাভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ইউনিয়ন। ইউয়িন তার শোকবার্তায় বলেছে, রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে আমরা দেখেছি কিভাবে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য নিজেকে তৈরি করেছিলেন। এই সংগ্রামে ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরাকে ভারতের সাথে ঐক্যবদ্ধ করে। একজন সরব সাংসদ এবং একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও তাঁর কথা আজ আমাদের মনে পড়ছে। সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে তাঁর দক্ষ নির্দেশিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী গোটা দেশকে সামগ্রিকভাবে পথ দেখিয়েছে। জনগণের অধিকারের জন্য তিনি সারাজীবন লড়াই করে গেছেন এবং কংগ্রেসের বিভেদকামী কৌশল ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সামনের সারিতে ছিলেন।

শোকবার্তায় আরও বলা হয়েছে, উপজাতি জনগণের মধ্যে উজ্জ্বল এই ব্যক্তিত্বের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি মহান প্রতিশ্রুতির কারণেই ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ বামপন্থী আন্দোলনের সামনের সারিতে আসতে পেরেছিলেন। রাজ্যের জনগণ যখন সমস্ত রকমের বিভেদকামী ও

সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন তাঁর মৃত্যু ঘটল। এই কিংবদন্তি বিপ্লবী নেতার প্রতি কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এবং ত্রিপুরার জনগণ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ডি ওয়াই এফ আই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সাংসদ মহম্মদ সেলিম এক শোকবার্তায় কমরেড দশরথ দেব-এর পরিবার-পরিজন ও রাজ্যের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে সেলিম বলেছেন, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা। ত্রিপুরায় শক্তিশালী বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। ত্রিপুরার মতো একটি অন্যতম পশ্চাৎপদ রাজ্যের জনগণের কল্যাণে ও প্রগতির লক্ষ্যে তাঁর নিরলস সেবা দেশ সব সময় স্মরণে রাখবে।

সি পি আই (এম) ওড়িশা রাজ্য কমিটি

পার্টির ওড়িশা রাজ্য কমিটি এক শোকবার্তায় বলেছে পার্টি ও ত্রিপুরার জনগণের প্রবীণ নেতা কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজ্য কমিটি গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর দৈহিক মৃত্যু সত্ত্বেও কমরেড দেব রয়েছেন উপজাতি জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর অবদান, জাতীয় সংহতির জন্যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর অসামান্য অবদানের মধ্যে। ওড়িশার লড়াকু জনগণ ও পার্টি-কর্মীদের কাছে কমরেড দেব অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ছিলেন এবং থাকবেন। প্রয়াত নেতার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও রাজ্যের জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে পার্টির ওড়িশা রাজ্য কমিটি।

[ডেইলি দেশের কথা]



নাতি-নাতনীর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শোকবার্তা

সি পি আই (এম) দিল্লী রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় প্রবাদ প্রতিম কমিউনিস্ট নেতা কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। পার্টির রাজ্য সম্পাদকের কাছে ত্রিবান্দ্রম থেকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন পলিটব্যুরো সদস্য ভি এস অচ্যুতানন্দন, পিনারবি বিজয়ন।

থিরুভানন্তপুরম এ কে জি সেন্টার থেকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নুরুল হুদা। শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, কমরেড দশরথ দেব ছিলেন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক অসাধারণ নেতা। তিনি গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন শোষিত - নিপীড়িত মানুষের জন্য। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং সুদক্ষ প্রশাসক। তাঁর মৃত্যুতে দেশের বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরাট ক্ষতি হল।

পৃথক শোকবার্তা পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। কলকাতা টেলিফোনের মঙ্গল দেববর্মা এবং দিল্লীর জনৈক জগন্নাথ সরকার শোকবার্তায় কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোকবার্তা পাঠিয়েছে ডাক-তার কর্মচারী ইউনিয়নের উত্তর পূর্বাঞ্চল সমন্বয় কমিটি। তাঁর মৃত্যুতে শুধু ত্রিপুরাবাসীই তাদের এক মহান বন্ধু, চিন্তাবিদ এবং যোগ্য নেতাকে হারাননি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ গোটা দেশ হারালো একজন সৎ, নিপীড়িত মানুষের জন্য নিবেদিত-প্রাণ সংগ্রামী যোদ্ধাকে।

প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের প্রতি শোকশ্রদ্ধা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে জনতা দলের ত্রিপুরা শাখা, ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিপ্লবী যুব ফ্রন্ট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লিবারেশন) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন এমপ্লয়ীজ এসো, টি এস আই সি এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন, শিলচর ডিভিশন ইন্সুরেন্স এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন, এন এফ আই বি ই ত্রিপুরা শাখা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কেন্দ্রের কর্মচারিবৃন্দ। রিলিভার্স সামাজিক সংস্থা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি এবং ত্রিপুরা পূর্ত সেচ ও কারিগরী কর্মী ইউনিয়ন। নবগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকেও প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠন সংস্থার শোক-শ্রদ্ধা

সোনামুড়া প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা বেসরকারী শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড), ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটি, টি ওয়াই এফ কেন্দ্রীয় কমিটি, সি আই টি ইউ রাজ্য কমিটি, ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য মৈত্রী পরিষদ, টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, এস সি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, ত্রিপুরা বিকলাঙ্গ যুব সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল-রাজ্য শাখা, এ আই টি ইউ সি রাজ্য কমিটি, ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, এফ এ সি এস আই, ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষৌরকর্মী ইউনিয়ন, এস ইউ সি আই, ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি, আর্ক বিজ্ঞান ও সামাজিক সংস্থা, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, এ টি জে ডি এ, ত্রিপুরা চটকল কর্মী সমিতি, ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ভেটেরিনারী এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা কলেজ শিক্ষক সমিতি, দ্য ইনস্টিটিউশন অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (ইন্ডিয়া) আগরতলা লোক্যাল সেন্টার, স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন, গণদূত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স ইউনিয়ন, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন, বি আর দীক্ষা দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, ট্রেড কো-অর্ডিনেশন সেন্টার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি, ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষা বিভাগীয় গেজেটেড অফিসার্স এসোসিয়েশন, বেকার স্নাতক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন, কৃষি স্নাতক সমিতি, এস এফ আই রাজ্য কমিটি, অল ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা প্রেস কর্মচারী সমিতি রাজ্য কমিটি, অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টর্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা টেকনিক্যাল এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন (এইচ বি রোড), রোজভ্যালি রিসোর্স অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন লিমিটেড, টি জি টি এ (এইচ বি রোড), ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি, এম বি বি কলেজ এলামনি এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন, পাওয়ার ইঞ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি, রেলায়েন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটি, নেতাজী জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, ত্রিপুরা হকার্স ইউনিয়ন, জনগণতান্ত্রিক মোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটি, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের পরিচালন কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটি, ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী কমিটি, ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড), ত্রিপুরা সরকারী অফিসার্স এসোসিয়েশন, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতি, ও এন জি সি ওয়াকার্স ইউনিয়ন, অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়ন জননেতা দশরথ দেবের জীবনাবসানে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

এছাড়া প্রদেশ যুব কং(ই) সভাপতি বিল্লাল মিঞা, ত্রিপুরা টাইমসের সম্পাদক অপাংশুমোহন লোধ, এ ডি সি চেয়ারম্যান মংসাজাই মগ, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী সদস্য গজেন্দ্র ত্রিপুরা, নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার পৃথক পৃথক শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

[ডেইলি দেশের কথা]

শ্রদ্ধায় স্মরণে দশরথ দেব

বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি ঃ

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড দশরথ দেবের স্মৃতির প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৬ই অক্টোবর, ১৯৯৮ বার্তা পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন এবং পলিটব্যুরো সদস্য হায়দর আকবর খান রনো।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কাছে প্রেরিত শোকবার্তায় রাশেদ খান মেনন লেখেন — 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দশরথ দেবের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতার কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। কমরেড দশরথ দেব সংখ্যালঘু জাতি সত্তাসহ মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর দৃঢ় ও অগ্রণী ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।'

পৃথক শোক বার্তায় হায়দর আকবর খান রনো লিখেছেন — 'কমরেড দশরথ দেববর্মনের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ত্রিপুরা তথা ভারতের মেহনতি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে এবং পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা তাঁর কাছ থেকে যে সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছিলাম, তা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করছি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।'

ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারী বৃন্দ ঃ

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জননেতা দশরথ দেবের স্মৃতিতে ১৫ই অক্টোবর (১৯৯৮) কলকাতা ত্রিপুরা ভবনের কর্মচারী ও আবাসিকবৃন্দ এক স্মরণসভায় মিলিত হন। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের আলোচনায় ত্রিপুরার জাতি-উপজাতিসহ সমগ্র অংশের মানুষের কল্যাণে কমরেড দশরথ দেব যে অবদান রেখে গেছেন তার উল্লেখ করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক গৌরকান্তি গোস্বামী। সভার শুরুতে একটি শোক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বিভিন্ন সংগঠন ঃ

- ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অফিসার ও কর্মচারীদের এক সভায় প্রয়াত দশরথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় — ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন আজীবন নিষ্ঠাবান। ত্রিপুরার অন্যতম জনগোষ্ঠীর ভাষা ককবরকের আধুনিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

■ উপাজাতি নাগরিক মঞ্চের তরফে এক শোকবার্তায় বলা হয় — রাজ্যের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, বিশেষ করে ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে অগ্রণী পুরুষ দশরথ দেবের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

■ উমাকান্ত একাডেমির ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা ১৬ অক্টোবর (১৯৯৮) এক সভায় মিলিত হয়ে এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র প্রয়াত দশরথ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. স্বপন মুখার্জী ও শিক্ষক প্রদীপ চক্রবর্তী প্রয়াত জননেতার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ডঃ মুখার্জী জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, জাতি-উপজাতি মৈত্রীর সেতুবন্ধন প্রয়াত দশরথ দেবের উত্তরাধিকার বহনের আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রয়াত জননেতার উন্নত মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শের অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে।

■ অল ইন্ডিয়া পিয়ারলেস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কলকাতা থেকে এক ফ্যাক্স বার্তায় খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু, জাতি-উপজাতি ঐক্যের কারিগর দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

■ সারা ভারত ছাত্র ব্লকের ত্রিপুরা রাজ্য শাখা, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফিসার্স এসোসিয়েশন. ত্রিপুরা সাহিত্য সমিতি ও ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

■ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জননেতা দশরথ দেবের মৃত্যুতে নিখিল ত্রিপুরা ডিডরাইটার্স এসোসিয়েশন এবং খো খো এসোসিয়েশন পৃথক পৃথক শোক বার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি জ্ঞাপন করেছে সমবেদনা।

[ডেইলি দেশের কথা]



সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

দশরথ দেবের জীবনাবসানে শোকগ্রস্ত রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গন

[ডেইলি দেশের কথা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮]

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগরতলা, ১৪ অক্টোবর ঃ 'জনশিক্ষা আন্দোলনে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে' — প্রয়াত জননেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে স্থানীয় ক্রীড়ামহলের ছিল এটা প্রধান সুর। ৭৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে তৃণমূলে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা প্রথম নিয়েছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দশরথ দেবই। ক্রীড়া পর্ষদকে শুধুমাত্র সরকারী ব্যবস্থাপনায় না চলার চেষ্টা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রিয়রঞ্জন দেববর্মন অনেকটা এইভাবেই স্মৃতিচারণ করে গেলেন। গ্রাম-পাহাড়ে ক্রীড়াবিদরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যাদের খবর কেউ রাখে না তাদের বের করে আনার প্রয়াস তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। যার প্রতিফলন এখন পাওয়া যাচ্ছে।

দশরথ দেবকে 'জাতি-উপজাতিদের সম্প্রীতির সেতু' বলে অভিহিত করে ক্রীড়া পর্ষদের সম্পাদক কমল সাহা বলেন, 'ক্রীড়া ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের মূল ভিত্তি ছিলেন কমরেড দশরথ দেব, প্রায় সাজানো বাগানই আমরা পেয়েছি তাঁর দৌলতে যেখানে এখন শুধু আমরা ফুল সাজাচ্ছি'। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির পরামর্শ আর পাব না, সেটাই কষ্ট'— বললেন ক্রীড়া পর্ষদ সচিব।

নবম পূর্বোত্তর ক্রীড়া উৎসবের সময় মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়ামের কাজ রেকর্ড সময়ে শেষ করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর তখনকার ভূমিকা ছিল পরিচালকের। বীর বিক্রম স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হবার পর এই কাজে লিপ্ত সমস্ত কর্মীদের ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি প্রত্যেক কর্মীর উৎসাহ যেভাবে বাড়িয়েছেন তা সকলকেই আজ অভিভূত করেছে।

আজ সারাদিন ব্যস্ততার মাঝেও ক্রীড়ামন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, 'কমরেড দশরথ দেব বিশ্বাস করতেন একটি পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করতে গেলে ক্রীড়াকে অবজ্ঞা করা যায় না, মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে উন্নত ক্রীড়া মানসিকতা থাকা প্রয়োজন বলে কমরেড দেব মনে করতেন। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও তিনি নবম পূর্বোত্তর গেমস উদ্বোধনে গিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁর ক্রীড়া মানসিকতা কতটা উঁচু ছিল, এই ধরনের অভিভাবককে হারিয়ে আমরা শোকাহত।'

'৭৮ সালে রাজ্যে প্রথম জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। রাজ্য ফুটবল এসোর সাধারণ সম্পাদক সমীরবরণ চক্রবর্তী আজ শোক প্রকাশ করে বলেন, 'সেবার কাছ থেকে দেখেছি এতবড় কর্মকাণ্ডকে কি সহজে তিনি সম্পন্ন করতে সাহায্য করে গেলেন, এত বড় মনের মানুষ ছিলেন বলেই আজ রাজ্যে সম্প্রীতির কথা উঠলেই তাকে মনে

রাখতে হবে'। জনশিক্ষা, জনগণের শিক্ষা, সমাজে শোষণ থাকবে না, তোষণ থাকবে না, থাকবে শিশুর মত সারল্য এবং প্রাণ চঞ্চলতা এবং সেজন্যই ক্রীড়াক্ষেত্রকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রাম-পাহাড়ে— এটাই ছিল কমরেড দশরথ দেবের '৭৮ সালের জুনিয়র ন্যাশনাল ফুটবলের ফাইন্যালের শেষের ভাষণের মূল সুর। সমীরবরণ চক্রবর্তীর মতে 'আজ সেই ডাক যেন বার বার ভেসে আসছে কানে।' মহিলারা বাড়ীতে বসে থাকবে না, তাদেরও মাঠে আনতে হবে এবং ফুটবল তাদের কাছে অপাংক্তেয় হবে না।

১৯৮১ সালে কলকাতা থেকে আসা দুটি মহিলা ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে কমরেড দশরথ দেব ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। সেদিনের মহিলা ফুটবল দল আনার অন্যতম উদ্যোক্তা প্রখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক, ব্রজলাল ভৌমিক আজ শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 'মহিলাদের নিয়ে ফুটবল মাঠে খেলার একটা ভয় ছিল। কমরেড দশরথ দেবের ঐ কথার পর ভরসা পেয়ে গেলাম। সেদিন দলটাকে ফেরত পাঠানোর টাকা ছিল না সংগঠকদের, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সব ব্যবস্থা করেছিলেন। মহিলাদের হ্যান্ডবলে ফেডারেশন কাপ জিতে আসা ত্রিপুরা দলকে প্রথম আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল তখনই। ব্রজলাল ভৌমিক বলেন, 'রাজ্যের ক্রীড়া জগতের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন কমরেড দশরথ দেব।'

'জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির সেতু কমরেড দশরথ দেবের মৃত্যুতে আমি শোকাহত।' জানালেন — ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীরণ চক্রবর্তী। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ক্রীড়া উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন তার বাস্তব রূপায়ণ তিনি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে।

বাস্তবমুখী ক্রীড়া পরিকল্পনার বাস্তবসম্মত রূপায়ণের প্রধান পথিকৃৎ কমরেড দশরথ দেব স্মৃতিচারণার মাঝে আজ উপচে পড়া ক্রীড়ামহলের মাঝ থেকে একটি কথাই বার বার বেরিয়ে আসছিল, 'ক্রীড়াক্ষেত্রই সম্প্রীতির সেতু হিসেবে কাজ করুক' — সেটাই হবে কমরেড দশরথ দেবের প্রতি [illegible] শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।



মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পতাকা উত্তোলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব

সবার জন্য ক্রীড়া-র সংগ্রামে অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড দশরথ দেব

[ডেইলি দেশের কথা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮]

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দশরথ দেব নেই। বিদায় নিলেন ত্রিপুরা রাজ্য ক্রীড়া ক্ষেত্রের অন্যতম মুখ্য স্থপতি। আজ ফুলে-ফলে ক্রমশ পল্লবিত যে ক্রীড়াঙ্গন আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত, তার ভিত্তিভূমি কিন্তু রচনা হয়েছিল ৭৮-৮৩ সালে। কমরেড দশরথ দেব শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে। 'সকলের জন্য ক্রীড়া' সমাজতান্ত্রিক শ্লোগান হলেও এই শ্লোগান কিন্তু রাজ্যে উচ্চারিত হয় জনশিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা কমরেড দশরথ দেবের কণ্ঠেই। তিনিই প্রথম রাজ্যের শিক্ষাবিদদের স্মরণ করিয়ে দেন ক্রীড়া শিক্ষা বাদে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্ভব নয়। তৃণমূলস্তরে ক্রীড়াকে নিয়ে যেতে পারলেই রাজ্যের প্রকৃত ক্রীড়া বিকাশ সম্ভব— রাজ্যে এই তত্ত্বের প্রবক্তাও ছিলেন তিনি।

আজকের যে ক্রীড়া পর্ষদ রাজ্য ক্রীড়াঙ্গনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে এর পেছনেও কিন্তু দশরথ দেবের গঠনমূলক চিন্তাধারা কার্যকর। ক্রীড়াক্ষেত্রের নীতি-নির্ধারক সংস্থা হিসাবে সরকারী গণ্ডীর বেড়া ডিঙ্গিয়ে ক্রীড়া পর্ষদে জনসাধারণের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটাতে পর্ষদের গঠনশৈলীর স্থপতি তিনিই। বহু ক্রীড়া সংস্থার সাথেও যুক্ত ছিলেন দশরথ দেব। দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন জিমন্যাস্টিক্স সংস্থার সভাপতি। ক্রীড়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে তিনি ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশে কাজ করে গেছেন। শুরুর সেই দিনগুলোতে ক্রীড়াবিভাগ বলতে কিন্তু কিছু ছিল না। শিক্ষা বিভাগের অংশ হয়ে থেকেও ক্রীড়াক্ষেত্র গঠন প্রক্রিয়া যে সুচারুরূপে তিনি সম্পন্ন করেছেন তা ক্রীড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ না থাকলে সম্ভব হত না। এমন একটি ব্যক্তিকে হারিয়ে রাজ্য ক্রীড়াঙ্গন আজ শোকগ্রস্ত। কমরেড দশরথ দেব বিশ্বাস করতেন মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্বের সেতু রচিত হয় ক্রীড়াঙ্গনে। অটল বিশ্বাসের এই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে সুন্দর সমাজের ছবি কল্পনা করতেন তাকে সার্থক করে তোলার গুরুদায়িত্ব এখন উত্তরসূরিদের হাতে। তাই আজ রাজ্য ক্রীড়াঙ্গনের শপথ হোক— আগামী দিনের সুন্দর সমাজ। যা ছিল কমরেড দশরথ দেবের স্বপ্ন।



ডেইলি দেশের কথার শ্রদ্ধার্ঘ্য

কমরেড দশরথ দেব লাল সেলাম

১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী খোয়াই মহকুমার অখ্যাত গ্রাম আমপুরায় যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিল একটি দরিদ্র কৃষক পরিবারে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত যার স্কুলে পড়ারই সুযোগ হয়নি, কালক্রমে গোটা দেশেই তিনি এক বিরাট পরিচিতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কমরেড দশরথ দেব। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন বিপুল কর্মকাণ্ডে ভরা। ১৯৪৫ সাল থেকে এই ৫৩ বছরে জনশিক্ষা সমিতি গঠন থেকে শুরু করে কখনো সশস্ত্র লড়াই, কখনো সংসদীয় লড়াই, কখনও বা গণ আন্দোলন পরিচালনায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ইতিহাসের এক গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটল।

কমরেড দশরথ দেব তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করছিলেন শিক্ষার গুরুত্ব। রাজ আমলের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে চল্লিশের দশকে ত্রিপুরার দুর্গম গ্রাম-পাহাড়ে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ত্রিপুরার মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন। পরবর্তী সময়ে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়ে ত্রিপুরায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ককবরক ভাষার উন্নয়নে ছিল তাঁর বিরাট অবদান। বহু ভাষায় দখল ছিল তাঁর। একজন সুলেখক এবং সুবক্তা হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতে। একসময় তাঁর ভাষণ সংসদ কাঁপাতো।

১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদ থেকে শুরু করে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড দশরথ দেব। এই সংগঠন পরিচালনায় তিনি নিয়েছিলেন স্বচ্ছ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী। শুরুতে উপজাতি জনগণের উপর কংগ্রেস সরকারের ব্যাপক দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল তাঁকে। রাজ আমলের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তী সময়ে দেশের শাসক ও শোষকশ্রেণীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, উপজাতি জনগণের আত্মবিকাশের জন্য, জাতি-উপজাতি জনগণের অধিকার রক্ষায় কঠিন, কঠোর লড়া করেছেন তিনি। তবে তিনি উপজাতীয়তাবাদে ভোগেননি, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও জীবন-জীবিকার স্বার্থেও সংগ্রাম করেছিলেন এই জননেতা। জাতি-উপজাতি ঐক্য রক্ষার উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন কমরেড দশরথ দেব। তিনি হয়ে উঠেছিলেন জাতি-উপজাতি জনগণের ঐক্য ও সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক।

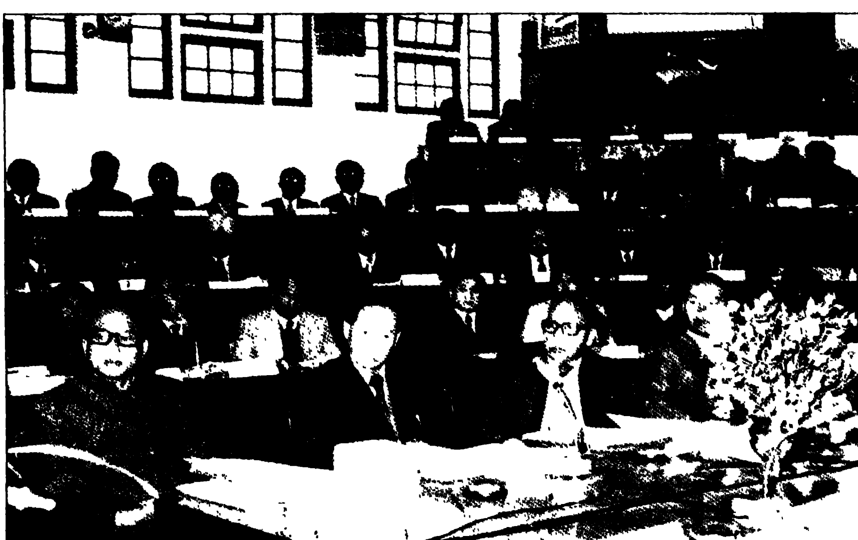
১৯৫০ সালে পার্টি সভ্যপদ পাওয়ার পরের বছরই কমরেড দশরথ দেব পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এত তাড়াতাড়ি পার্টির নেতৃত্বে আসা অভূতপূর্ব ঘটনা। কমরেড দশরথ দেব তাঁর

যোগ্যতা বলেই পার্টির প্রথম সারির নেতৃত্বে এসেছিলেন। ১৯৯৮ সালে পার্টির সদ্য সমাপ্ত ষোড়শ কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে। দীর্ঘ পার্টি জীবনে কমরেড দশরথ দেব মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে অবিচল ছিলেন। পার্টির শৃঙ্খলা রক্ষায় ছিলেন দৃঢ়। পার্টি মিটিংগুলিতে তিনি নির্দিষ্ট সময়েই উপস্থিত হতেন। ত্রিপুরায় জাতি-উপজাতি ঐক্য গড়ার সাথে সাথে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে কমরেড দশরথ দেবের অবদান অপরিসীম। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণে তাঁর ছিল সারল্য, ছিল কমিউনিস্ট নেতার গুণ। মানুষের সুখে-দুঃখে তাদের খুব কাছাকাছি থেকেছেন এবং মানুষের লড়াইয়ে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন বলেই হয়ে উঠতে পেরেছিলেন জনগণের হৃদয়ের রাজা।

কমরেড দশরথ দেব বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এজন্য সন্ত্রাসবাদীরা যেমন তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল, তেমনি উগ্রজাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কম কুৎসা ও অপপ্রচার করেনি। ত্রিপুরায় এ ডি সি গঠনে এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তিনি যে দীর্ঘ লড়াই করেছেন তাও এক উজ্জ্বল ইতিহাস।

কমরেড দশরথ দেব আমাদের আগামীদিনের লড়াই-সংগ্রামের প্রেরণা। তাঁকে আমরা কখনো ভুলব না। ত্রিপুরার মানুষ যখন শান্তি-সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় এক কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ তখন কমরেড দশরথ দেব এই লড়াইয়ের দিশারী হয়ে থাকবেন। শ্রেণীসংগ্রাম এবং শোষণমুক্তির লড়াইয়ের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন তিনি।

কমরেড দশরথ দেব লাল সেলাম
কমরেড দশরথ দেব অমর রহে



জননেতা দশরথ দেবের প্রতি শিশুমহলের শ্রদ্ধার্ঘ্য

দশরথ এক নাম

রণজিৎকুমার দে

নিপীড়িতের
মুখের ভাষা।
অসহায় জুমিয়ার
মনের আশা।
দশরথ এক নাম।

কল কল রবে
গোমতী আজ
গায় তার জয়গান।।

রাইমা শরমা
হাতে হাত রেখে
যেমনে বিলায় আলো।

গ্রামে-পাহাড়ে
তেমনি তুমি
ছড়াইলে শিক্ষার আলো।

তুমি যে মোদের
মনের রাজা।
তুমি যে মৈত্রীর সেতু।
অসহায় নিপীড়িতেরা
হারিয়ে তোমায়
কাঁদিছে তোমার হেতু।

মুক্তি সূর্য

সাগ্নিক সরকার

সকালবেলা পড়ছি আমি
পড়ার টেবিলে
আমার বাবু শুনছে খবর
সদর দরজা খুলে
হঠাৎ শুনি বাবু বলছে
হায় ! হায় ! হায় !
রেডিও ফেলে সাইকেল নিয়ে
কোথায় চলে যায়,
একটু পরে আসছেন বাবু
দেখি বিষণ্ণ বদন
বলছে বাবু শুনছে খোকা
হয়েছে আজ কি
দুইটি জাতির বিশাল সেতু
আমরা হারিয়েছি।
তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক
রাজা দশরথ
ত্রিপুরাবাসীকে দেখিয়েছেন
বেঁচে থাকার পথ।
ওগো রাজা তুমি মহান
তুমি মুক্তি সূর্য
কোনদিন শেষ হবে না
তোমার তেজস্বী ঐশ্বর্য।।

দিক্‌দিশারী দশরথ দেব

নিশিকান্ত বাদ্যকর

সবার শ্রদ্ধেয় কমরেড
ভুলব তোমায় কেমনে,
শয়নে-স্বপনে পড়বে মনে
থাকবে সবার স্মরণে

তুলে ধরব তোমার স্মৃতি,
গাইব মোরা তোমার গীতি,
তোমার স্মৃতিতেই দেখব তোমায়
তোমার স্মৃতির দর্পণে।

ফলে ফুলে অশ্রুজলে
দীপ মশালের মাল্যদানে,
সখ্যতার ওই ঐক্যতানে
রাখব প্রীতির বন্ধনে।

অমর বীর তুমি মহান
গেয়েছিলে সমতার গান,
তিলে তিলে প্রাণ করে গেলে দান
গণ মুক্তির কল্যাণে।

[ডেইলি দেশের কথা]

মানুষ নামে মানুষটির জন্য

বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী

এখানে বন ছিল আর পাহাড় ছিল
মধ্যে ছিল মানুষ,
কিছু কিছু দুষ্ট ছিল
উড়াতো কথার ফানুস।

তাই ক্ষুধা ছিল জরা ছিল
বুকটি ভরা ব্যথা,
বন পাহাড়ই শুনতো কেবল
তাদের দুঃখ গাথা।

একদিন একটি ছেলে শুনল সে সব
বন পাহাড়ের থেকে,
সহজ সরল মনটি তাঁহার
উঠল আমূল কেঁপে

তারপর সেই ছেলেটি বলল ডেকে
সবাই শুনে যাও,
শিক্ষা থেকে চেতনা হয়
বই হাতে নাও।

কেননা চেতনা হলে বুঝবে সবাই
কেন দুঃখ জরা,
শুধুই মোদের জীবন কেন
হাহাকারে ভরা।

হায় কোথায় তারা শিক্ষা পাবে
কোথায় পাবে বই,
পাহাড় বনে ঘেরা এদেশ
বিদ্যালয় বা কই।

তখন রাজ্যজুড়ে দামামা বাজে
নেইকো কারো ভয়,
বাধ্য হয়ে রাজামশাই
বানান বিদ্যালয়।

রাজ্যে একটি করে স্কুল বসে আর
শিক্ষা ছড়ায় দেশে,
সবাই মিলে ছেলেটিকে
সাজায় রাজার বেশে।

মানুষের দুঃখ গেলো সুখ এলো
বিভেদ হল লয়,
জাতি-উপজাতি নয়, সবার
মানুষ পরিচয়।

কালের নিয়মে
মহান মানুষটি চলে গেলেন
দেখিয়ে মোদের পথ
আমরা গড়ি
বুকের মাঝে পাহাড়চূড়া
নামটি দশরথ।

[ডেইলি দেশের কথা]

বলে গেলেন

কাজল দত্ত

পাহাড় ঘেরা
সবুজ বন
বাঘ-হাতীতে খেলা
পাহাড়ী মা-র
কোলে সেদিন
বসল চাঁদের মেলা।
ষোল সালের
দ্বিতীয় মাস
ফেব্রুয়ারীর দুই।
দশরথের
জন্মে ফোটে
বুলতলীতে জুঁই।।
চৌদ্দ বছর
চষে গেলেন
পাহাড়-টিলার গ্রাম।
গ্রামের স্কুলে
ভর্তি হলেন
খাতায় তুলে নাম।
পড়তে গিয়ে কলকাতাতে
পুলিশ সাধল বাদ।
মনের নেশা
গোপন করে
পেলেন নতুন স্বাদ।।
রাজ্যে তখন
রাজ শাসন
দুঃশাসনের রাজ।
পাহাড় টিলা
সমতলে
অত্যাচারের সাজ।।
রাজার সেনা
বর-কন্দাজ
সান্ত্রী-সেপাই যত।
মায়ের হাসি
ছিনিয়ে নিল
হিংস্র বাঘের মত।।
এসব দেখে
হৃদয় কাঁদে
বারুদ জাগে বুকে।
প্রতিবাদের
আগুনবাণী
দশরথের মুখে।।
ছড়িয়ে পড়ে
দশরথের
প্রতিরোধের ডাক।
পাহাড়-টিলা
সমতলে
বাজল রণ ঢাক।।
গাঁয়ের ছেলে
ছড়িয়ে গেল
রাজ্যবাসীর মাঝে।।
শোষক রাজা
ভীতির কোলে
সকাল-সন্ধ্যা সাঁঝে।।
রাজা, ব্রিটিশ
সবই গেল
রইল দশরথ।
ঐক্য সেতুর
প্রতীক হয়ে
টানেন বিজয়রথ।।
আজকে তিনি
দশরথদা
সবার আপন জন।
সবার কাছে
বলে গেলেন
'ঐক্য' পরম ধন।।

[ডেইলি দেশের কথা]

স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ

প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশ্যে ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৮ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট স্মরণসভা। স্মরণসভায় ঐক্য সম্প্রীতিকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। স্মরণসভায় সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য শৈলেন দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন বক্তা প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের স্মৃতিচারণ করেন।

শৈলেন দাশগুপ্ত

সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর অন্যতম প্রবীণ সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের তরফ থেকে কমরেড দশরথ দেবের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং স্মরণ-সমাবেশে উপস্থিত কমরেড দেব-এর সহধর্মিণী শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেবী ও তাঁর কন্যাকে সমবেদনা জানান।

দাশগুপ্ত বলেন, কমরেড দশরথ দেব-এর নাম জানেন না এমন লোক ত্রিপুরায় নেই। ত্রিপুরার বাইরেও তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা অনেকেই জানেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদের সকলের নেতা, আমাদের শিক্ষক। তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের মিলন ঘটিয়ে কী করে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হয়, পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হয় তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। দাশগুপ্ত বলেন, একটা মানুষের কিছু সহজাত গুণ থাকে। হাসি দেখলে আনন্দ হয়, কাঁদতে দেখলে কষ্ট হয়। শোষণ-অত্যাচার দেখলে ক্ষোভ হয়, অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা জাগে। অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়লে অনেকের এসব গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কমরেড দেব-এর তা হয়নি। এই সহজাত গুণের জন্যই তিনি শোষিত অত্যাচারিত জনগণের জন্য প্রথমে রাজার শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পরে স্বাধীন ভারতের ধনিক জমিদার শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করেছেন। অত্যাচার শোষণের কারণগুলো এবং তার প্রতিকারের উপায়টা কেবল তত্ত্বগতভাবে বুঝলেই হয় না, কাজে কর্মে তাকে প্রয়োগ করতে হয়।

কমরেড দশরথ দেব বুঝেছিলেন এবং শোষিত পশ্চাৎপদ উপজাতি জনগণকে সচেতন করার কাজ হিসেবে প্রথমেই শিক্ষা প্রসারে হাত দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শোষণ ব্যবস্থার অবসান ছাড়া মুক্তি নেই। আর একমাত্র কমিউনিস্টরাই শোষণ মুক্তির সংগ্রাম করে আর কেউ করে না। তাই তিনি কমিউনিস্ট হলেন।

দাশগুপ্ত বলেন, ভারতবর্ষের ৯২ কোটি মানুষ এক জটিল অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রে বর্তমানে যারা সরকারে আছে তারা সব কিছুর মধ্যেই একটা বিভেদপন্থার বীজ ঢোকানোর চেষ্টা করছে। ইংরেজদের বিভেদের বীজও রয়ে গেছে। দেশভাগও সেই বিভেদ-রাজনীতির ফল। নানা ধরণের বিদ্রোহ হচ্ছিল পাঞ্জাব ও বাংলায়। তাই ওরা এই দুটোকে ভাগ করে দিল। কিন্তু শোষণ মুক্তির সংগ্রাম করতে গেলে এই বিভেদ-নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে দশরথ দেব হচ্ছেন সেই ঐক্যের সেতু। কিন্তু এই ঐক্য ভাঙবার জন্য প্রচেষ্টা থেমে নেই। প্রায় দৈনিক খুন হচ্ছে। বিপথে গিয়ে কিছু উপজাতি যুবক নিজেদেরও মঙ্গল করছে না, রাজ্যেরও মঙ্গল করছে না। এদের পেছনে অন্য শক্তি আছে। বিদেশিরাও আছে। শৈলেন দাশগুপ্ত বলেন, কমরেড দশরথ দেব পথ দেখিয়েছেন - মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন করতে না পারলে মুক্তি নেই। পশ্চিমবঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ বামফ্রন্টের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। আমরা বলেছি, সব সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা এ ব্যবস্থায় নেই। শোষকরা অল্প লোকের উন্নতি করছে, আমরা বিপরীত কাজ করছি অর্থাৎ বেশির ভাগ লোকের উন্নতির জন্য কাজ করছি। কাজটা কঠিন। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়। গণতন্ত্রের অগ্রবর্তী ঘাঁটি বলে কথিত পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় আমরা এ কাজের মধ্য দিয়ে সারা দেশে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

দাশগুপ্ত বলেন, এটা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, কমরেড দশরথ দেব-এর পথই একমাত্র পথ। এর কোন বিকল্প নেই। যে বীজ তিনি বপন করেছেন তা ঘরে ঘরে দশরথ দেব-এর জন্ম দেবে। যে কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, তাকে এগিয়ে নিতে হবে। একদিকে উন্নয়ন, আর একদিকে ঐক্য রক্ষার লড়াই এবং মানুষকে সচেতন করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কমরেড দশরথ দেব-এর মৃত্যুর অপূরণীয় ক্ষতি কিছুটা তাহলে পূরণ হবে।

সবশেষে দাশগুপ্ত বলেন, অভিজ্ঞতা চালান করা যায় না। কমরেড দশরথ দেব-এর বিশাল অভিজ্ঞতা আর কারও পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার কাছ থেকে শিখতে হবে। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হবে। মানুষ আমাদের পক্ষে আছে।

বৈদ্যনাথ মজুমদার

দশরথ দেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছেন, শিক্ষা বিস্তার করতে গিয়ে তাঁকে রাজ আমলের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। তবে তিনি বুঝেছিলেন শুধু শিক্ষার মাধ্যমেই অনগ্রসরতা দূর করা যাবে না, শোষণ বন্ধ করা যাবে না। তাই গঠন করেছিলেন মুক্তি পরিষদ। এই সংগঠন আওয়াজ তোলে প্রজার ভোটে সরকার গঠন করতে হবে, দেওয়ানী শাসন বাতিল করতে হবে। তখন উপজাতিদের উপর ব্যাপক দমনপীড়ন সংগঠিত করা হয়েছিল। বহু বাড়িঘর ও সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছিল। ত্রিপুরার একাংশে বলবৎ করা হয়েছিল সামরিক আইন। দশরথ দেব দীর্ঘ আত্মগোপন অবস্থায় থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াই করেছেন।

বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছেন, দশরথ দেবের লড়াই শুধু উপজাতিদের জন্য ছিলনা, জাতি-উপজাতি সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য এবং শোষণ মুক্তির জন্য ছিল তাঁর লড়াই। শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই তিনি জনগণের অবিসংবাদী নেতা হয়েছেন। মজুমদার বলেন, যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ও শ্রেণিচেতনা থেকে দশরথ দেব আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাকে রক্ষা করা পার্টি ও বামফ্রন্টের দায়িত্ব। তবেই, তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের হাতে বিমল সিংহ, আনন্দ রোয়াজা, ক্ষীরোদ দেববর্মা প্রভৃতি নেতার হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেন, বাছা বাছা উপজাতি নেতাদের খুন করা হয়েছে। সাংসদ বাজুবন রিয়াং-এর ছেলে অপহৃত হবার পর ছয়মাস হয়ে গেল। এ সবের পেছনে রয়েছে গভীর চক্রান্ত। বিদেশি শক্তির মদত রয়েছে।

একতা খান্ খান্ করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আগামীদিনে সমস্ত প্ররোচনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

ঐক্য সংহতি রক্ষার করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

মানিক সরকার

স্মরণসভায় সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কমরেড দশরথ দেবের সংস্পর্শে থেকে যে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা পেয়েছেন তা তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, পশ্চাৎপদ, অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত উপজাতি জনগণের মধ্যে সামন্তরাজ শাসনের বিরুদ্ধে, মানুষকে জাগাতে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদেরকে চেতনায় উদ্ভাসিত করার জন্য কমরেড দশরথ দেব কাজ শুরু করেছিলেন। তাদের পশ্চাৎপদতা ঘুচাতে, সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শুরু করেছিলেন জনশিক্ষা আন্দোলন।

কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শুধুমাত্র একটা অংশের নির্যাতিত মানুষকে সংগঠিত করার মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখলে তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সব অংশের মানুষের পশ্চাৎপদতার অবসানে সব অংশের শ্রমজীবী শোষিত-নির্যাতিত মানুষকে সংগঠিত করতে হবে।

তিনি বলেন, আজকে যারা বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছেন, তাদের এপথ সম্পূর্ণ ভুল পথ। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যখন সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ শুরু করে তখন থেকেই হতাশাগ্রস্ত রাজনীতিকরা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙতে উপজাতি অংশের দীর্ঘ বঞ্চনাজনিত পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে কাজে লাগাতে শুরু করে। দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে রাজ্যের উন্নয়নে কিছুই করা হয়নি। রাজ্যের তৎকালীন সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে সার্বিক অগ্রগতির স্বার্থে একটি কথাও বলেননি। এখন পর্যন্তও তারা সম্প্রীতি উন্নয়নের স্বার্থে কোন কথা বলছেন না, বরং বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে অসহযোগিতা করছেন। ঘোলা জলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন। বামফ্রন্ট যখন আন্দোলন করেছে তা ভাঙার ষড়যন্ত্র করেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সাধারণ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের সাথে সহযোগিতা করছেন।

তৃতীয় বামফ্রন্ট আমলে কেন্দ্রের নরসীমা রাও সরকারের রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী কংগ্রেস। জোট আমলে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কায়েম করে এ ডি সি, শিক্ষা, ভূমি হস্তান্তর, চাকুরি সর্বোপরি উপজাতি উন্নয়নে ভাষা কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিকাশের প্রচেষ্টা টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করেছে। আর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সেনা দেওয়ার পরিবর্তে যা ছিল তার তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুরু হয়েছে নতুন ষড়যন্ত্র —সম্প্রীতি-ঐক্য ভাঙার। বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নির্দিষ্টভাবে কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে। বর্ডার সীল করার প্রস্তাব দিয়েছে। ৮৫১ কিমি বর্ডার। পুরোটা খোলা। বাংলাদেশের ভেতরে এন এল এফ টি এবং টাইগার ফোর্সের ঘাঁটি। এন এস সি এন, উলফা, পি এল এ ইত্যাদি উগ্রপন্থীরা তাদের অস্ত্রের ট্রেনিং দিচ্ছে। আই এস আই সাহায্য করছে। এখানে ত্রিপুরা সরকারের কিছু করার নেই। দায়িত্ব কেন্দ্রের সরকারের বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলার। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় একদিকে যেমন সেনা-পুলিশকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার ব্যাপার রয়েছে তেমনি যে সমস্যা থেকে সন্ত্রাসবাদের জন্ম অর্থাৎ পশ্চাৎপদতা তা কাটিয়ে তুলতে উপজাতি জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নও

প্রয়োজন। এই প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নরসীমা রাও সরকার কিছুই করেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবন-যন্ত্রণার উপশমে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখার পরও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তুলে নিয়ে গেল কেন্দ্র শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকারকে কুপোকাৎ করতে। শুধু ত্রিপুরা নয়, ত্রিপুরাসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জন্য মূল দায়ী একশ বারো বছরের কংগ্রেস। এরপরও কংগ্রেস রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী সমস্যা নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে। এসব মন্তব্য অন্তত ত্রিপুরার জনগণ কেউ বিশ্বাস করবেন না।

মানিক সরকার আরো বলেন, কমরেড দশরথ দেব যে কথাগুলো বার বার বলে গেছেন, তাঁর জীবৎকালে, তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় পার্লামেন্টের ভিতর, বিধানসভার ভিতর তারই প্রতিধ্বনিত করছি। যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে জড়িত আমি বিশেষ করে তাদের কাছে বলব, উপজাতি জনস্বার্থের সংগ্রামে দশরথ দেবের কোনো বিকল্প নেই।

যারা তাঁর শত্রু তাঁরাও তা অস্বীকার করেন না। আমি আবারও বলছি, প্রতিদিন যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে আপনাদের হাতে, তা বন্ধ করুন। আমি অনুরোধ করব আপনাদের সম্বিত ফিরে আসুক। যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত তারা সন্ত্রাসের পথ পরিহার করুন। সন্ত্রাসের পথে কোনো ভাল কাজ হয়না। অস্ত্র পরিহার করুন। আলোচনা করে অস্ত্র সংবরণ করুন, শান্তির পরিবেশ তৈরি করুন। আলোচনার টেবিলে বসুন। ভারতবর্ষের সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে উপজাতি জনগণের স্বার্থে এই অঞ্চলের স্বার্থে আলোচনার টেবিলে বসুন। রাজ্য সরকারের সাথে বসতে চাইলে বসুন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বসতে চাইলে বসুন। আমাদের কোন আপত্তি নেই। এটা হচ্ছে দেশপ্রেমিক আবেদন। আজ দশরথ দেবের স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে সারাজীবন তিনি যে ঐক্যের জন্য, শান্তির জন্য, সম্প্রীতির জন্য, সংহতির জন্য লড়াই করে গেছেন তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমি আবারও তাদের কাছে আবেদন করছি এ পথ পরিহার করুন। এ পথ দেশের এবং উপজাতি জনগণের সর্বনাশ করছে। এ রাজ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিশেষ — যে কোন দলের হোক এগিয়ে এসে বলেন এ প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য মধ্যস্থতা করতে চাই, আমরা সাদরে এ প্রস্তাব বিবেচনা করব।

তিনি বলেন, দশরথ দেবের স্মরণসভায় বলতে চাই তিনি পঞ্চাশ বছরে সংগ্রামী জীবনে পলে পলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তার জীবন এবং কর্মধারা দিয়ে যে শিক্ষায় আমাদের উদ্ভাসিত এবং উজ্জীবিত করেছেন, স্মরণসভার মধ্য দিয়েই তা যেন শেষ না হয়ে যায়। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঘর থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন অথৈ সমুদ্রে, এ লক্ষ্যে পৌঁছার পথ অনেক দূর। অনেক হাঁটতে হবে আমাদের। তাঁর প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধা দেখাতে চাই তবে দল-মত, ভাষা-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে ত্রিপুরার সকল প্রান্তে দেশপ্রেমিক শান্তিপ্রিয় মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষ, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আসুন হাতে হাত ধরে দাঁড়াই, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলি। মাটির নীচের এবং উপরের সম্পদ, মানব সম্পদ কাজে লাগিয়ে প্রকৃত অর্থেই নতুন ত্রিপুরা গড়ে তুলি।

কমরেড দশরথ দেবের আবেদন তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তি এবং সম্প্রীতি নিয়ে কেউ নোংরা রাজনীতি করবেন না। যারা করবার চেষ্টা করবেন দলমত নির্বিশেষে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন। উভয় অংশের জনগণকে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দশরথ দেবের যে আকুল

আকুতি তা বাস্তবায়িত করতে আসুন হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাই। এটা করতে পারলেই তাঁর প্রতি আমরা শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে পারব। আসুন, আমরা তার লক্ষ্যে পৌছার সংগ্রামকে তীব্রতর করি। নতুন নতুন মানুষকে এই সংগ্রামে শামিল করি। এর মধ্য দিয়েই আমরা দশরথ দেবের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করি।

দীনেশ দেববর্মা

সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দীনেশ দেববর্মা কমরেড দশরথ দেবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, রাজার আমলে কি ধরনের অত্যাচার হতো তা অনেকেই জানেন না। রাজার বিনন্দিয়ারা খাজনা আদায় করত, সম্পত্তি ক্রোক করত। আর এই সম্পত্তি আমাদের গ্রামের পর গ্রাম বহন করে নিয়ে যেতে হতো। রাজকর্মচারীদের এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা যারা একটু পড়াশোনা করেছি তারা প্রতিবাদ করি। কমলপুরের মহারাণীতে লংতরাই ক্লাব গড়ে তুলে তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। এ খবর পেয়ে পায়ে হেঁটে কমরেড দশরথ দেব কমলপুর যান। আমাদের বলেন, বিক্ষিপ্ত আন্দোলন করলে কোন লাভ হবে না। জনশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে গোটা রাজ্যের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, এ রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য, চীফ কমিশনারের শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বিধানসভার দাবিতে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে সর্বোপরি জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি রক্ষা এবং রাজ্য ও মানুষের কল্যাণে দশরথ দেব কাজ করে গেছেন।

সুনীল দাশগুপ্ত

সি পি আই রাজ্য পরিষদের সম্পাদক সুনীল দাশগুপ্ত বলেন, কমরেড দশরথ দেবের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ৫০ বছর অব্দি বিস্তৃত ছিল। দশরথ দেব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। ৫০-এর দশকের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দাশগুপ্ত বলেন, একটা সময় ছিল যখন যে কোন সমাবেশের আয়োজকরা দশরথ দেবকে প্রথমে বক্তা হিসাবে চাইতেন। কোনো সমাবেশ হবে আর দশরথ দেব বক্তা হিসাবে থাকবেন না এটা ভাবতেও পারতেন না আয়োজকরা। এতই জনপ্রিয় ছিলেন কমরেড দশরথ দেব। তাকে নিয়ে চালু হয়ে গিয়েছিল রূপকথার মত অনেক গল্প। তিনি সারাজীবন জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি আর রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করে গেছেন।

সুদর্শন ভট্টাচার্য

আর এস পি নেতা সুদর্শন ভট্টাচার্য বলেন, আমার মত একজন সাধারণ কর্মীর পক্ষে কমরেড দশরথ দেবের সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন যখন শুরু আমাদের তখন জন্মই হয়নি। তিনি এ রাজ্যের একেবারে পিছিয়েপড়া মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছিলেন। বিরল প্রতিভাধর মানুষদের মধ্যে একজন হলেন কমরেড দশরথ দেব। শ্রমজীবী মানুষের জন্য আজীবন যে কাজ করে গেছেন তাকে এগিয়ে নেয়াই হবে কমরেড দশরথ দেবের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা।

ব্রজগোপাল রায়

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা ডঃ ব্রজগোপাল রায় তার স্মৃতিচারণায় বলেন, কমরেড দশরথ দেব আমাদের শিখিয়ে গেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র দৈহিক শক্তিতে কাজ হয়না। চাই মস্তিষ্কের। এজন্য এ রাজ্যের মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজ প্রথম শুরু করেন তিনি। আজও সেই মানুষদের পশ্চাৎপদতা ঘোচেনি। তিনি বলেন, রাজন্য শাসন থেকে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। উপজাতি থেকে গোটা রাজ্যের, বিশ্বের মানব সমাজের জন্য কাজ করে গেছেন। আজ যারা স্বাধীন ত্রিপুরার নামে সশস্ত্র লড়াই চালাচ্ছে তাদের আহ্বান জানাই ভুল পথ ছেড়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে সামিল হোন।

[ডেইলি দেশের কথা]

শ্রেণী সংগ্রামে গণমুক্তি পরিষদ

দশরথ দেব

গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব এটাও অনুভব করে যে কেবলমাত্র ট্রাইবেল জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেই এই শোষণের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ার আদর্শ প্রচার করতে থাকে। উপজাতি ভিন্ন অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামে সামিল করতে চায়।

চল্লিশের দশকের কথা। তখন ত্রিপুরায় চলছে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। অবশ্য ১৯৪৬ সালে ত্রিপুরার শেষ রাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর থেকে ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের সরাসরি শাসনের অবসান ঘটেছে। এরপর ত্রিপুরায় রাজবংশের আর কেউ ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা পান নি। দেওয়ানী শাসনের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকারের শাসন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু রাজার রাজত্ব চলে গেলেও সামন্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে নি আর্থিক ব্যবস্থায়, সামাজিক ব্যবস্থায় ও রীতিনীতিতে। মানুষের ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতিতে সামন্তবাদী চিন্তা ধারায় প্রচণ্ড প্রভাব রয়েই গেছে। তখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তেমনভাবে ত্রিপুরায় বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কৃষিতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্তবাদী চরিত্রই রয়ে গেছে। তাই অনগ্রসর কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী শোষণ আজকের মত তেমন তীব্রতা লাভ করেনি। তবে সামন্তবাদী মহাজনী শোষণ তীব্র ছিল। উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ চালাত প্রধানত অ-উপজাতি ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ। উপজাতিদের মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য অল্প বিস্তর সৃষ্টি হলেও শ্রেণি শোষণ তেমন তীব্র ছিল না। শ্রেণি সংগ্রাম চালানোর মত ক্ষেত্র তেমন উর্বর ছিল না। তাই তখন গণমুক্তি পরিষদের সামনে এই প্রশ্ন তেমন গুরুত্ব পায়নি।

সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল উপজাতি জনগণের আত্মবিকাশের প্রশ্নে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, জাতি হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। আপন স্বকীয়তা বজায় রেখে টিকে থাকার প্রশ্ন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর প্রশ্ন। তাই দাবি উঠেছিল দায়িত্বশীল সরকার চাই। এই আন্দোলন দমনের জন্য কংগ্রেস সরকার পুলিশী জলুম চালায়। তখন গণমুক্তি পরিষদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্ব লাভ করে কংগ্রেস সরকারের এই বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে উপজাতি জনগণকে রক্ষা করার প্রশ্ন। তাই মুক্তি পরিষদকে তখন প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করতে হয়েছিল উপজাতি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। তাই গণমুক্তি পরিষদের আহ্বানে ছিল জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধ। সেই

জাতীয়তাবাদী ধ্যান ও ধারণার বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রামের চেতনার উন্মেষ ঘটানোর একটা সচেতন প্রচেষ্টাও ছিল। তাই গণমুক্তি পরিষদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ যেমন সমাজ সংস্কারমুলক কতগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সেই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যেমন শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তেমনি উপজাতিদের দুর্বল অংশের সমস্যাবলী সম্পর্কেও চোখ বুঁজে থাকে নি। হাল চাষে যত বেশি সংখ্যক লোক নামছেন, হালের বলদ ইত্যাদির বর্গার হার, জমি বর্গার হার তত দ্রুত বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি কৃষক ত্রিপুরায় আসার ফলে হাল বলদের ভাড়া, জমি বর্গার হার প্রভৃতি বেড়ে যায়।

পূর্বে এক পুরা (৭ কেজি) ধানের মূল্য ছিল আট আনা থেকে দশ আনা। এক টাকার অনেক কম। এক জোড়া হালের বলদের বার্ষিক ভাড়া ছয় মণ থেকে সাড়ে সাত মণ ধান। এক কানি জমির বর্গার হার দেড় থেকে পৌনে দুই মণ ধান। ১৯৪৯ সাল থেকে তা হঠাৎ বেড়ে যায়। এক পুরা ধানের দাম দুই টাকা হতে আড়াই টাকা। এক জোড়া হালের বলদের ভাড়া বার মণ থেকে চৌদ্দ মণ ধান। এক কানি জমি বর্গার হার চার মণ থেকে সাড়ে চার মণ ধান। ফলে গরিব অংশের উপজাতিদের জীবনযাত্রার উপর হঠাৎ দারুণ আঘাত আসে।

গণমুক্তি পরিষদ ১৯৪৯ সালে সদর বিভাগের পাটনী পাড়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এর বিরুদ্ধে নির্ধারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে ধানের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেয়। হাল বলদের এবং জমি বর্গার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দেয়। এক পুরা ধানের দাম পাঁচ সিকার (এক টাকা চার আনা) বেশি হতে পারবে না। এক জোড়া হালের বলদের ভাড়ার হার নয় (৯) মণ ধানের বেশি হতে পারবেনা। আর এক কানি জমির বার্ষিক বর্গার হার তিন মণের বেশি হতে পারবে না। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য গণমুক্তি পরিষদ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে প্রতিটি এলাকায় প্রাথমিক কমিটিগুলি এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে। গরিব অংশের মধ্যে এই আন্দোলন দারুণভাবে সাড়া পায়। বড়কাঠাল এবং জিরানীয়ায় বড় তালুকদার জীবন ব্যানার্জিকে গণমুক্তি পরিষদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছিল।

তখন দাদন প্রথার খুবই প্রচলন ছিল। অর্থাৎ অগ্রিম ফসল বিক্রয়ের হিড়িক ছিল। উপজাতিদের জুম ফসল করা বা কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহ করার জন্য মহাজনের নিকট হতে দাদন নেয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। বাজার দরের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ মূল্যে ধান, পাট, তিল, কার্পাস, সরিষা প্রভৃতি অগ্রিম বিক্রয় করতে হতো উপজাতি গরিব অংশের লোকদের। উপজাতিদের মধ্যে দাদন দিতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। মূলত বাঙালি মহাজনদের হাতেই এই দাদনের ব্যবসা কেন্দ্রীভূত ছিল।

গণমুক্তি পরিষদ দাদন বা সুদের সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিল। গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে মহাজনদের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাবার আপাতত কোন পথ নাই। ওদের আর্থিক ঋণ বা কর্জ না দিয়ে বিরাট সংখ্যক উপজাতি গরিব কৃষক ও জুমিয়াদের পক্ষে কৃষি কাজ চালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব ছিল। তাই মুক্তি পরিষদ মহাজনদের পদ ও ঋণ জব্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে সুদের সর্বোচ্চ হার বেঁধে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহাজনদের ঋণ জব্দ করার সিদ্ধান্ত করা হলে কিংবা কেবল মূলধন পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে মহাজনদের কাছ থেকে আর ঋণ পাওয়া যাবে না। অথচ মুক্তি পরিষদও আর্থিক সহায়তা দেবার

বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারবে না। কাজেই মহাজনদের সাথে কিছুটা আপোষ আর কিছুটা সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করতে হয় গণমুক্তি পরিষদকে। শোয়াইয়া হারে সুদ বেঁধে দেয়া হয়। অর্থাৎ মূলধনের বার্ষিক ২৫ শতাংশ সুদ বেঁধে দেয়া, চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রথা বাতিল করে দিয়ে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে গণমুক্তি পরিষদকে বহু বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬/৫৭ সাল পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত সমূহ উপজাতি এলাকাগুলি, বিশেষত সদর, খোয়াই এবং কমলপুর যে তিনটি এলাকায় গণমুক্তি পরিষদের শক্ত সংগঠন ছিল সেই তিনটি মহকুমায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের পর থেকে গণমুক্তি পরিষদের এই কড়াকড়ি সিদ্ধান্তসমূহ লঙ্ঘিত হতে থাকে। উপজাতিদের কিছু সুবিধাবাদী লোক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেতে থাকে এবং প্রোটেকশন পাবার জন্য কংগ্রেসে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। আর কংগ্রেস সরকার এই সিদ্ধান্তগুলোকে অকেজো করে দেবার জন্য নানা কলা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। সমান্তরাল সরকার গঠন করে গণমুক্তি পরিষদ দেশদ্রোহিতা করছে এই অজুহাত তুলে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ গণমুক্তি পরিষদের বহু নেতা এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করে চূড়ান্ত রকমের হয়রানি করতেথাকে। এইভাবে কংগ্রেস সরকার গণমুক্তি পরিষদের সেই সিদ্ধান্তসমূহ অকেজো করে দেয়।

ভূমিহীন ও জুমিয়াদের জমি দেবার সংগ্রাম করে গণমুক্তি পরিষদ। একদিকে যেমন কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছে অপর দিকে জুমিয়া ও ভূমিহীনদের জমি বণ্টনের কাজও করেছে গণমুক্তি পরিষদ। উপজাতি বড় জোতদারগণ আপন জোতের সংলগ্ন খাস জমি অন্যদের দখল করতে দিত না। নিজ জোতের সংলগ্ন খাস জমি নিজেরাই দখল করার মতলবে আটকে রেখে দিতেন। মুক্তি পরিষদ সেই খাস জমি দখল করে তা ভূমিহীন হিন্দুস্থানী কৃষক এবং উপজাতি জুমিয়াদের মধ্যে বিলি করেন।

দৈনিক দিন মজুরির হার দৈনিক এক পুরা ধান দীর্ঘদিন ট্রাইবেলদের প্রচলিত রেট। কারণ টাকায় মজুরি দেবার প্রথা ট্রাইবেলদের এলাকায় কম চালু ছিল। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে তখন ট্রাইবেলদের পকেটে নগদ টাকা খুবই কম যেতো। ধান ইত্যাদি পণ্য থাকলেও তা বিক্রয় করা সহজ ছিল না। মাথায় বহন করে বাজারে এনে বিক্রয় করতে হতো। তাই মজুরি হিসাবে ধান (in kind) দেবার প্রথা চালু ছিল। এক পুরা (৭ কেজি) ধানের মূল্য দুই আড়াই টাকা হওয়ার পর আর কেউ একদিন কাজ করার বিনিময়ে এক পুরা ধান দিতে চাইতেন না। দৈনিক এক টাকা মজুরির হার চালু হয়ে গেল যারা মজুর খাটায় তাদের উদ্যোগে। গণমুক্তি পরিষদ এই শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে। এক পুরা ধানের মূল্য যাই হোক দৈনিক নিম্নতম মজুরি এক পুরা ধান দিতে হবে। অথবা এক পুরা ধানের বাজার দরে টাকা দিতে হবে। উপজাতি গরিব অংশের নারী - পুরুষ এই দাবিতে জোর আন্দোলন চালায়, উপজাতি পাড়ায় মিছিল সংগঠিত হয়। এই সিদ্ধান্ত উপজাতি এলাকাগুলির বেশির ভাগ স্থানেই চালু হয়ে যায়, এতে সবচেয়ে উপকৃত হন হিন্দুস্থানী দিন মজুরগণ।

ট্রাইবেলদের মধ্যে তখনও দিন মজুরদের সংখ্যা কম ছিল। জুমের জন্য প্রচুর জঙ্গল পাওয়া যেত। তাই অনাহারী দিন মজুরের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশি ছিল না। তখন মাটি কাটাবার কাজে ট্রাইবেল মজুর পাওয়া যেত না। মাটি কাটা এবং পাথর ভাঙার কাজকে ট্রাইবেলরা অপমানজনক কাজ বলে মনে করতেন। পুঁজিবাদী শোষণ ট্রাইবেলদের মনোভাব চুরমার করে দিল। আজ

মাটি কাটা, রাস্তা তৈরি করা ও পাথর ভাঙার কাজে ট্রাইবেল পুরুষ কেন, মেয়ে শ্রমিকও প্রচুর দেখা যায়।

গণমুক্তি পরিষদ দেখতে পায় মহাজনী শোষণ ট্রাইবেলদের এমন স্থানে দিয়ে গেছে, বেশির ভাগ জুমিয়া এবং সাধারণ কৃষকেরই খাজনা পরিশোধ করার সাধ্য ছিল না। প্রচুর খাজনা বকেয়া পড়ছে। আর সরকার তখন হাল সনের খাজনা এবং বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জোর জুলুম চালায়। এমনকি খাজনা আদায়কারী সরকারী কর্মচারীরা মহাজনদের সঙ্গে নিয়ে ময়ালে উঠতেন। নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের গরু, মহিষ, পাঁঠা, শূকর, থালা-ঘটি-বাটি মহাজনদের কাছে বিক্রয় করে খাজনা আদায় করতেন। গণমুক্তি পরিষদ এই জুলুমের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় এবং উপজাতি জনগণকে সংগঠিত করে এই জুলুমের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে। খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়। দাবি বকেয়া খাজনা মকুব চাই। কংগ্রেস সরকার এই বকেয়া খাজনা আর আদায় করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে বকেয়া খাজনা মকুব করতে বাধ্য হয়।

গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব এটাও অনুভব করে যে কেবলমাত্র ট্রাইবেল জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেই এই শোষণের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ার আদর্শ প্রচার করতে থাকে। উপজাতি ভিন্ন অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ করে এই সংগ্রামে সামিল করতে চায়। গণমুক্তি পরিষদই সর্বপ্রথম ত্রিপুরার চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টা নেয়। কাতলামারা, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি চা বাগানে সংগঠনকে গড়ে তুলে। তখন এই চা বাগান থেকে কিছু সংখ্যক জঙ্গি মেয়ে শ্রমিক এগিয়ে আসেন। চা শ্রমিকদের উপর মালিকদের শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগঠিত করে। আর এই শ্রমিকদের সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির উপজাতি কৃষক এবং বাঙালি কৃষকদেরও সংগঠিত করে। চা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির সংগ্রামে বাগানে ধর্মঘট করার সময় এলাকার কৃষকরাও তাদের সাহায্যার্থে নানাভাবে এগিয়ে আসে। অতীতে ত্রিপুরায় শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে গণমুক্তি পরিষদের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করলাম। **[ডেইলি দেশের কথা]**



শান্তি ও সম্প্রীতিই উন্নয়নের শর্ত

দশরথ দেব

"উগ্রপন্থার ভুল পথ আঁকড়ে থাকা যুবকদের উদ্দেশে বলতে চাই — সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে গণতন্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করুন। সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি বিদ্বেষের পথ ছোট বড় কোন জাতি গোষ্ঠীরই সমস্যা সমাধান করে না, বরং নিজেদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করে। সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই আবেদন করছি — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ, জাতি গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ, সর্বোপরি ত্রিপুরা ও দেশের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।"

সংহতি সভায় সমবেত সকলকে বামফ্রন্ট সরকার এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি।

কেন এই সংহতি সভার আয়োজন সে সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই।

উপজাতি জনগণের স্বার্থের কথা বলে আমাদের রাজ্যের কিছু যুবক হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, জঙ্গলে গেছে, সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করেছে। এরা 'স্বাধীন ত্রিপুরা' 'আলাদা রাজ্য' 'বিদেশি বিতাড়ন' ইত্যাদি দাবিকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। এদের কারো কারো বাংলাদেশে ঘাঁটি রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ সক্রিয় বিভিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে এদের সম্পর্ক রয়েছে। এরা অপহরণ করছে, যান-বাহন আক্রমণ ও লুট করছে। কোথাও কোথাও মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকায়, প্রধানত অনুপজাতি অংশের উপর আক্রমণ করছে, খুন করছে, বাজার লুট করছে। পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের অতর্কিতে আক্রমণ করছে, খুন করছে, অস্ত্র লুট করছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা প্ররোচনা ও প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনী ও জোয়ানরা এই অবস্থার মোকাবিলা ক'রে চলেছেন। কোথাও কোথাও অনুপজাতি অংশের কোন কোন পরিবারের কর্তাকে তাদের ভাষায় 'বিদেশি' চিহ্নিত করে এলাকা ও রাজ্য ছাড়ার হুমকি সম্বলিত চিঠি দিচ্ছে। সব মিলিয়ে এদের সমস্ত কার্যক্রমই চরম উস্কানিমূলক। এরা বুঝতে পারছে না, এদের অনুসৃত পথ সম্পূর্ণ ভুল এবং বিভ্রান্তিতে ভরা। সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘুতে

পরিণত হওয়া উপজাতি জনগণের বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও, ওদের নেয়া পথের মাধ্যমে এই সমস্যার যে সমাধান হতে পারে না, এটা ওরা বুঝতে পারছে না।

পৃথিবীর দেশে দেশে যেমন এই অভিজ্ঞতা রয়েছে, তেমনি আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এবং ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে। অস্ত্র হাতে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে, কিংবা বিদেশের মাটিতে বসে এই জাতীয় স্বাধীন রাজ্যের শ্লোগান অতীতেও আমরা শুনেছি। এই দাবিকে সামনে রেখে বিদেশের মাটিতে ঘাঁটি করে, তথাকথিত 'স্বাধীনতা', 'মুক্তি'র আন্দোলন পরিচালনা করতে দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্ত্র পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতোধারায় মিশে গিয়ে অতীতের ভুল পথকে শুধরে নেবার চেষ্টা করতে দেখেছি। এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে আমাদের রাজ্যের অস্ত্রধারী বিভ্রান্ত যুবকরা শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এটা শুধু তাদের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করছে না বিশেষভাবে উপজাতি সমাজ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি ও সর্বনাশ করছে।

ওরা উপজাতি জনগণের মুক্তির কথা বলছে। কিন্তু ওদের অনুসৃত উগ্র বাঙালিবিদ্বেষ প্রসূত সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপের জন্য সব চাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাহত হচ্ছে উপজাতি প্রধান এবং উপজাতি অনুপজাতি মিশ্রিত জনবসতির বাস — এমন এলাকার উন্নয়নের কাজ। কিছু কিছু এলাকায় স্কুল, সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কৃষি বিভাগের অফিস সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরকারী দপ্তরগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না। পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ প্রকল্প, রাস্তাঘাট মেরামত ও নতুন রাস্তা নির্মাণ, জলসেচ প্রকল্প সম্প্রসারণ-এর কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগও নষ্ট হচ্ছে। ওদের সন্ত্রাসবাদী এবং উস্কানীমূলক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য কোন কোন এলাকায় নিরীহ নিরপরাধ উপজাতি জনগণ নিজেদের বিপন্ন বোধ করছেন।

অপরদিকে বাঙালি জনগণের একাংশের মধ্যে উগ্র-উপজাতি বিদ্বেষ প্রসূত বাঙালি জাত্যভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও কোথাও কোথাও সশস্ত্র বাঙালি সেনাও তৈরি হচ্ছে। একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের উপজাতি যুবকদের সশস্ত্র উস্কানিমূলক কার্যকলাপের জন্য কোথাও কোথাও সমগ্র উপজাতি সমাজকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে ফেলা হচ্ছে।

এই উভয়বিধ কার্যকলাপের জন্য বিপদগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত উপজাতি-বাঙালি একতা-সম্প্রীতি ও সংহতি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্যের জনস্বার্থবাহী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। এতে পিছিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার অগ্রগতি।

ত্রিপুরার অগ্রগতি, ত্রিপুরাকে ভালবাসেন, এমন শান্তিপ্রিয় নাগরিক মাত্রই এই অবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন না। বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে।

বহুমুখী সমস্যার বোঝা কাঁধে নিয়েই আজ থেকে তিন বছর আগে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তার যাত্রা শুরু করেছিল। কাঁধে চেপেছিল পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া বিরাট ঋণের বোঝা। অর্থ ভাণ্ডার ছিল প্রায় শূন্য। অনাহার মৃত্যু, ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রি, কাজ ও খাদ্যের জন্য অহরহ রাজ্য ছাড়ার ঘটনা ঘটছিল। কোথাও কাজ ছিল না। সর্বত্র চলছিল সীমাহীন স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। ভোটের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। মা বোনদের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হচ্ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে খুন খারাবি হচ্ছিল। অপরাধীদের

গ্রেপ্তার বা সাজার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আইনের স্থান দখল করেছিল জঙ্গলের শাসন। এরকম একটি পরিস্থিতিতে জনকল্যাণকর উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ ও রূপায়ণ ছিল খুবই কঠিন কাজ। জনস্বার্থবাহী কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ আদায় স্থগিত রেখে অনুদান ও নতুনভাবে ঋণ হিসাবে অর্থ চেয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু এর জন্য কাজ বন্ধ থাকেনি। পরিস্থিতির মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনতে বামফ্রন্ট সরকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। গণতন্ত্র সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গ্রাম শহরে বহুমুখী জনহিতকর সরকারী কার্যক্রমই হচ্ছে এর নিদর্শন। কংগ্রেস (ই)-র উপজাতি শাখা সংগঠনের সম্মেলনে সাংসদ সুধীররঞ্জন মজুমদার বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ অর্থ উপজাতিদের জন্য খরচ না করে অন্যভাবে খরচ করেছে। এই বক্তব্য ঠিক নয়। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন সাংসদ সুধীররঞ্জন মজুমদার। উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ অর্থ সবটা উপজাতিদের জন্যই খরচ করা হচ্ছে। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরো অর্থ বরাদ্দের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে উপজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই সাংসদ সুধীররঞ্জন মজুমদার এসব অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

কিন্তু আমরা লক্ষ করছি বর্তমান ত্রিপুরায় জনস্বার্থবাহী কর্মসূচী নিয়ে আমাদের এগোবার পথে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিশেষ বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদিকে উন্নয়নের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, অপরদিকে বাঙালি-উপজাতি নির্বিশেষে সকল অংশের ত্রিপুরাবাসীর মধ্যেকার সম্প্রীতি ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলছে। কোথাও কোথাও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে তা স্বতঃস্ফূর্ত কর্মোদ্যোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। একে প্রতিহত করতে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই উগ্রপন্থার পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বিপথগামী যুবকদের আহ্বান জানিয়ে আসছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতি যুবক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। এটা ভারতবর্ষে একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু এদের পুনর্বাসনে বারবার বলেও কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত রেখে যারা শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের মোকাবেলা করতেও আধা-সামরিক বাহিনী প্রেরণ সহ সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখে কেন্দ্রে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র সহযোগিতা করছে না।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে কোন দায়িত্বশীল রাজ্য সরকার ও শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক জনগণ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন না। জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়ণের পাশাপাশি বিভিন্ন উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যকলাপ প্রতিহত করতে বামফ্রন্ট সরকার ও শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক ত্রিপুরাবাসী হাতে হাত রেখে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এতে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগকে আরো শতগুণ বাড়াতে হবে।

উগ্রপন্থার ভুল পথ আঁকড়ে থাকা যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই -- সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে গণতন্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করুন। সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি বিদ্বেষের পথ ছোট, বড় কোন জাতি গোষ্ঠীরই সমস্যা সমাধান করে না, বরং নিজেদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করে। সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই আবেদন করছি — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ, জাতি-গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ, সর্বোপরি ত্রিপুরা ও দেশের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। অস্ত্র পরিহার করে নিজের জীবনকে

গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিন। বামফ্রন্ট সরকার ও ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় জনগণ আপনাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।

যারা বিপথগামী হয়েছেন তাদের পিতা, মাতা-আত্মীয় পরিজন, শুভাকাঙ্ক্ষীদের আবেদন করছি, নিজের সন্তান, সন্ততি ও নিকট আত্মীয়কে ভুল ও সর্বনাশের পথ পরিহার করাতে উদ্যোগ নিন। বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা নিন, নিজেদের পরিবারের অনিশ্চয়তা দূর করে শান্তি স্থাপনে, সর্বোপরি সামাজিক সুস্থিতিকে সুরক্ষা করতে এগিয়ে আসুন। বামফ্রন্ট সরকার এই প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

যারা এই ক্ষুদ্র অংশের সশস্ত্র বিপথগামী উগ্রবাদী যুবকদের উস্কানীমূলক কার্যকলাপে প্ররোচিত হয়ে সমগ্র উপজাতি সমাজকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করছেন, বাঙালি জনগণের সেই অংশকে বলব — এটা আত্মঘাতী পথ। অতীতে বারবার এই পথে ঠেলে দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা উপজাতি-বাঙালি সহ গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মিলে সমগ্র ত্রিপুরার অশেষ ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। তাদের সেই চেষ্টা আজো অব্যাহত রয়েছে। স্বার্থান্বেষী মহলের এই প্ররোচনার ফাঁদে কারোরই পা দেওয়া উচিত নয়।

অপরাধীর কোন জাত-ধর্ম-বর্ণ- সম্প্রদায় নেই। অপরাধের নিরিখেই অপরাধীর বিচার হবে। কিন্তু তার জন্য কোন জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা শুধু অযৌক্তিক নয়, অন্যায় এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও বিপদজ্জনক। দলমত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে শান্তি-সম্প্রীতি-সংহতি ও অগ্রগতির যারা পরিপন্থী সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে সবাইকে মিলিতভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। জনগণ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে আমাদের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে জাতি-উপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য। কালের বিবর্তনে ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই সত্যকে কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে বাঙালিকে বাদ দিয়ে যেমন শুধু উপজাতি নিয়ে ত্রিপুরা ভাবা যায়না, তেমনি উপজাতিকে বাদ দিয়ে শুধু বাঙালি নিয়ে ত্রিপুরা ভাবা যায় না। ত্রিপুরা মানে সম্মিলিত ভাবে উপজাতি বাঙালিসহ সকলের। তাই, ত্রিপুরার ঐতিহ্যমণ্ডিত সংহতির মৌলমূলে যারা আঘাত হানতে চাইছে, ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে চাইছে, ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতিকে বিনষ্ট করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সকল অংশের ত্রিপুরাবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ●

[১২ ফেব্রুয়ারী '৯৬ জম্পুইজলায় সংহতি সভায় দশরথ দেবের ভাষণ]

শেষ প্রকাশ্য জনসভায় দশরথ দেবের আহ্বান

বিপথগামী যুবকরা জনগণের রায় থেকে শিক্ষা নিয়ে শান্তি ও উন্নয়নের কাজে অংশ নিক

[ডেইলি দেশের কথা]

এবারকার নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গণতন্ত্রের শত্রুরা প্রতিনিয়ত হিংস্র ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে। শোষক কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল কংগ্রেস (আই)-টি এন ভি টি ইউ জে এস জোট এবং বি জে পি, আমরা বাঙালী ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দলগুলো একের পর এক প্ররোচনা ও উসকানি সৃষ্টি করেছে। উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের দিয়ে নিরীহ নারী পুরুষকে খুন করিয়ে জাতি দাঙ্গা সৃষ্টির মারাত্মক উসকানি দিয়েছে। নির্বাচন বানচাল করে অগণতান্ত্রিক ভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রপতি শাসনজারির চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি গণতন্ত্রপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ঐতিহ্য অম্লান রেখে বামফ্রন্টকে বিজয়ী করে তাদের উন্নত রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজ্যের জনগণের এ রায় শান্তি-সম্প্রীতি সুস্থিতির পক্ষে। যারা উপজাতি অনুপজাতি ঐক্য ভাঙার অপচেষ্টা করেছিল, জনগণের রায় তাদের বিরুদ্ধে গেছে। রাজ্যের জনগণ ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা, উসকানি, অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে বামফ্রন্টকে বিজয়ী করে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের অনুসৃত উপজাতি অনুপজাতি জনগণের সম্প্রীতি ও ঐক্য সুদৃঢ় করে উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণের ধারাবাহিকতার পক্ষে রায় দিয়েছেন।

আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এবং বামফ্রন্টের উপর জনগণ পুনরায় বিপুল আস্থা ঘোষণা করায় আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরের মধ্যে ৪৫ বছর কংগ্রেস দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে আমাদের রাজ্যের প্রতি যে সীমাহীন বঞ্চনা ও অবহেলা করেছে, তার ফলে অনগ্রসরতার কারণে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অনগ্রসরতা দূর করতে রাজ্যের জনগণের যে দাবিগুলো কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলি দ্রুত রূপায়ণে কেন্দ্রের উপর

চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

যারা আমার দেশের একতা, সংহতি ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে সেই দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থবাদীদের মদতে একাংশের যুবক এখনো সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক কার্যকলাপে নিজেদের যুক্ত রেখেছে। এরা রাজ্যের যেমন ক্ষতি করছে, তেমনি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এসব সন্ত্রাসবাদী যুবকদের একাংশ নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল। ত্রিপুরাই সারা দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে আশি শতাংশের বেশি ভোট দাতা অংশ নিয়েছেন। নির্বাচন বয়কটের ডাক এ রাজ্যের মানুষ প্রত্যাখান করেছেন। আমি আশা করি, এই বিপথগামী যুবকরা জনগণের এই রায় থেকে শিক্ষা নেবেন এবং ভুল পথ ছেড়ে শান্তি-সম্প্রীতি গণতন্ত্র ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করবেন। আমাদের সরকার কেন্দ্রের সহযোগিতা নিয়ে তাদের পুনর্বাসনের যথাসাধ্য সাহায্য দেবে।

আমি আশাবাদী, উপজাতি-অনুপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী, উন্নয়নকামী ত্রিপুরাবাসী ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারকে জনকল্যাণ কর্মসূচী রূপায়ণে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

(১৮ই মার্চ, ১৯৯৮ চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর আস্তাবল ময়দানে বামফ্রন্টের বিজয় সমাবেশে দশরথ দেবের ভাষণের সংক্ষিপ্তসার।)



সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

[ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করা ও উভয় অংশের শোষিত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য মৈত্রীর সেতু দশরথ দেব আপোষহীন লড়াই চালিয়েছেন। কায়েমী স্বার্থান্বেষী বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তারই কিছু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হলো। — সংকলক]

"উপজাতি যুব সমিতির নেতারা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের দাবি আদায় করতে গিয়ে এটাও দেখাতে চান যে, অতীতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বাঙালীদের খুশি রাখার জন্য উপজাতিদের স্বার্থ নিয়ে দাবি করেন নাই। নতুবা বহু আগেই তা পাওয়া যেত, ত্রিপুরা থেকে বাঙালী নিশ্চিহ্ন করা যেত। মুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্টরা উপজাতিদের জন্য কিছুই করেন নাই এটা যেমন তথ্যগত ভাবে ভুল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, আবার ইচ্ছা করলেই এ রাজ্য থেকে বাঙালী নিশ্চিহ্ন করা যেত ইহাও মারাত্মক ভুল চিন্তাধারা। এই ভুল চিন্তাধারা অনুযায়ী ত্রিপুরার উপজাতিরা পরিচালিত হলে তারা মারাত্মক পথে পা বাড়াবেন।

...... লক্ষ্য করার বিষয় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সংগ্রামকে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত না করে গোটা বাঙালী জাতি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক সংগ্রামী ঐতিহ্যপূর্ণ উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে তৎপর হন।"

(উপজাতিদের ৪ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন জোরদার করুন, দশরথ দেব. ১৯৭৪)

*

"...... উপজাতি যুব সমিতির বক্তব্য ছিল তারা বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন চান। বাঙালীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এটাই তাদের মূল বক্তব্য। কাজেই সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনে বাঙালীদের অংশগ্রহণ তাদের কাছে অবাঞ্ছিত। উপজাতিদের দাবিতে বাঙালীরা অংশগ্রহণ করলেই উপজাতিদের দাবির গুরুত্ব হালকা হয় না, বরং আরো জোরালো হয় একথা উপজাতি যুব সমিতি স্বীকার করে না বলেই তারা ঘোর সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগানের মাধ্যমে আঁতাত করেছেন।"

(উপজাতিদের ৪ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন জোরদার করুন, দশরথ দেব, ১৯৭৪)

*

"এদের লক্ষ্য হলো শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা। তাদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার উপজাতি ও অ-উপজাতির শোষিত শ্রমজীবী মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামী জনগণকে পাহাড়ী ও বাঙালী এই দুইটি জাতি শিবিরে বিভক্ত করে রাখা। বিগত ৩০ বৎসরব্যাপী শাসনে কংগ্রেস ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনগণকে 'পাহাড়ী' এবং 'বাঙালী' এই দুই সাম্প্রদায়িক শিবিরে বিভক্ত করে রাখার

সবরকম অস্ত্রই প্রয়োগ করেছে।

প্রথম লোকসভার নির্বাচনের কয়েক বৎসর পর যখন আসামে প্রথম বাঙালী খেদার নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠে তখনো ত্রিপুরার আবহাওয়া শান্ত ছিল। কিন্তু কংগ্রেসীদের একাংশ তখনো চেষ্টা করেছিলেন ত্রিপুরায় পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের উপর নির্যাতন চালাতে সরকারকে সুযোগ করে দিতে। কমিউনিস্ট পার্টি ও উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে সেদিনও রাজ্যের সর্বত্র এই দাঙ্গার প্ররোচনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল।

'কেউ যদি ত্রিপুরায় পাহাড়ী ও বাঙালীর দাঙ্গা বাঁধাতে চান তা হলে তাদের তা করতে হবে কমিউনিস্টদের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে। একটি কমিউনিস্ট জীবিত থাকতে আমরা এই ত্রিপুরার মাটিতে দাঙ্গা হতে দেবো না।'

আমি এই দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম সেই সময় খোয়াই শহরের লালছড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত প্রায় দশ হাজার শান্তি সেনাদের সমাবেশে।"

(স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ও কায়েমী স্বার্থ, দশরথ দেব, শিক্ষক সংবাদ, ১৯৭৯)

*

"পাহাড়ী ও বাঙালী জনগণের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও গড়ে উঠবে। কেউ কাউকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তাধারা অবাস্তব। — দশরথ দেব।

(দেশের কথা, ৮ নভেম্বর, ১৯৭৪)

*

'উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জাতি ও উপজাতিকে আলগা করে নিজ নিজ জাতি বা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু এই বাস্তব বিরোধী চিন্তাকে আমরা মনে স্থান দিই না। আমরা একদিকে বর্ণাতীত কাল হতে পশ্চাৎপদ, অবজ্ঞাত, নির্যাতিত, সবরকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধালাভে বঞ্চিত পার্বত্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনা— অন্যদিকে তেমনই পাহাড়িয়া ছাড়া ত্রিপুরায় যে সব বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরী ও অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের স্বার্থ পায়ে মাড়াতে পারিনা 'ইয়া কুং বাই না গই মাঁয়য়া"

(ভাষা দরদী না বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ? — দশরথ দেব, ত্রিপুরার কথা ১৯ মে, ১৯৫৪)

*

"কেবল মাত্র স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের দ্বারাই উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে না বা উপজাতি স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হবে না। ত্রিপুরা তথা ভারতের শোষিত-বঞ্চিত অংশের জনগণের সার্বিক উন্নতির মধ্যেই নিহিত আছে উপজাতিদের সার্বিক উন্নতি ও স্বার্থ রক্ষা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ছাড়া অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া শোষিত-নিপীড়িত অংশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় না। আবার উপজাতিদের এটাও মনে রাখতে হবে যে কেবল উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারত এবং ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকার সম্পদের সাহায্যেই এই উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব। এর জন্যই চাই জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এই প্রক্রিয়াকে উন্নত করেই উপজাতি স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। তবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি এলাকার উন্নতি সাধনের অন্যতম ফলদায়ক এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে।...... "

(ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ কি ও কেন ? দশরথ দেব, ১৯৮১)

জেল থেকে দশরথ দেবের স্বহস্তে লিখিত চিঠি

জননেতা দশরথ দেব কংগ্রেস শাসনে বিভিন্ন জেলে দীর্ঘদিন আটক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রচুর চিঠি লেখেন। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় তার থেকে বাছাই করা দুটো চিঠির আংশিক মূল ইংরেজিতে এখানে মুদ্রিত হলো ঃ

To
The Chief Secretary,
Government of West Bengal
Calcutta — 2-9.68
through
The Superintendent,
Presidency Jail,
Calcutta

Sir,

The undersigned begs to state as follows

1) That the petitioner is a detenu (Classified 'C') who has been detained by the Govt of Tripura under Preventive Detention Act, 1950 (Act IV of 1950) and who at present has been lodged at Presidency J., Calcutta

2) That the petitioner is in need of a portable Typewriter for his own use in the jail as he has been doing some literary works, and the manuscript of the same needs to be multiplied

****

May your petitioner, therefore, request that you will kindly expedite the case in his favour so that he may be able to carry his works as stated above

Yours faithfully,
D. Deb.

Presidency Jail,
Calcutta-27
Dated, the 2nd September, 1968

To
The District Magistrate, 2-9-68
Government of Tripura
Agartala

Sir

With reference to your letter No 4160/DM/[illegible]/68 dated 26th August, 1968 I may state that my monthly average income has been [illegible] the sum of Rs 300/- (Rupees three hundred) till to the date when I was arrested and detained by your order and the sources of the income were — translation work, journalism, writings of books and pamphlets and occasional tuition etc. Now you can easily understand that my income from the above sources can not be continued without my physical participation in these works. Obviously, [illegible] from the sources stated above have been totally stopped since my detention.

****

Should it be wrong in me to expect that the Govt. should realise the grim reality that now-a-days no family consisting of more than three members can be managed with a monthly allowance of Rs 100/- particularly if such a family resides in urban area.

One can easily get an idea about the standard and mode of living of my family if one does not forget the fact that I had been the member of Lok Sabha for 15 years.

Presidency Jail
Calcutta
Yours faithfully
Dasarath Deb

Dated, the 2nd September, 1968

[প্রয়াত দশরথ দেবের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত]

মৈত্রীর সেতু দশরথ দেব

দিলীপ দাম



ছোটবেলায় সঙ্গীদের অন্যরা বইখাতা নিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেও দশরথের স্কুলে ভর্তি হওয়া ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল ১৪ বছর বয়সে। ১৪ বছর বয়সে আক্ষরিক জ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে খোয়াইয়েরই একটি স্কুলে ভর্তি করা হয়।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক সামাজিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম পুরুষ, দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, জাতি-উপজাতি মানুষের সম্প্রীতির সেতু, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জননেতা কমরেড দশরথ দেবের জন্ম ১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমার পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের আমপুরা গ্রামের বুলতলীতে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। তাঁর বাবা প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা এবং মা প্রয়াত কন্যাতি দেববর্মা।

আমপুরা গ্রামের বুলতলী একটি পাড়া। কেউ বলে এখানে একটি বকুল গাছ ছিল। যাতে নাকি বসত অনেক বুলবুলি। তাই থেকে সেই পাড়ার নাম বুলতলী। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই নামের পাড়াতেই কন্যাতি আর কৃষ্ণচন্দ্রের কোল আলো করে দরিদ্র কৃষকের ঘরে ১৯১৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়েছিল যে শিশুটি নাম রাখা হল তার দশরথ। কেউবা বলেন, পৌরাণিক রাজা দশরথের নামের সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল দশরথ। ছোটবেলায় সঙ্গীদের অন্যরা বইখাতা নিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেও দশরথের স্কুলে ভর্তি হওয়া ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল ১৪ বছর বয়সে। ১৪ বছর বয়সে আক্ষরিক জ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে খোয়াইয়েরই একটি স্কুলে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষায় বয়স কোন বাঁধা নয় তাই আক্ষরিক অর্থে প্রমাণ করে খোয়াইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমীতে এসে ভর্তি হন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর অধুনা বাংলাদেশের হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজে তিনি ভর্তি হন। বৃন্দাবন কলেজে পড়াশুনার সময় মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ঘটে এবং তখন থেকেই তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য পড়াশুনা শুরু করেন। হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও আইন বিষয়ক পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে গ্রেপ্তার এড়িয়ে হার্ডিঞ্জ হস্টেল থেকে ত্রিপুরায় চলে আসেন। ত্রিপুরায় এসে তিনি মুক্তি পরিষদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মুক্তি পরিষদ গঠনের আগে ১৯৪৫ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যুগান্তকারী জনশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন জনশিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি । ১৯৪৮ সালে দশরথ দেবের নেতৃত্বেই গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ। তিনি ছিলেন মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯ সালে খোয়াই বিভাগ সহ ত্রিপুরার একাংশে জারি হয় সামরিক শাসন। উপজাতি অঞ্চলে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ ব্যাপক গণহত্যা, গৃহদাহ এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। এই অত্যাচার প্রতিরোধ করতে এবং উপজাতিদের জীবন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য দশরথ দেব গেরিলা বাহিনী গঠন করে অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন।

কমরেড দশরথ দেব ১৯৫০ সালে মুক্তি পরিষদের সমস্ত সদস্যসহ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালেই তিনি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি আত্মগোপনে যান। তাঁর মাথার দাম তখন ঘোষণা করা হয় দশ হাজার টাকা। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায়ই ১৯৫২ সালে তিনি লোকসভার প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায়ই নির্বাচিত হবার পর দিল্লীর পার্লামেন্টে হাজির হয়ে তিনি সারা দেশকে অবাক করে দেন।

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগের পর মুক্তি পরিষদ থেকেই গঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। কমরেড দশরথ দেব প্রথম থেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কমরেড দশরথ দেব তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কৃষক আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এবং বহু বছর রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৬৪-তে পার্টি ভাগ হয়ে সি পি আই (এম) প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৮ সনে অনুষ্ঠিত ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। অসুস্থতার কারণে ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে তিনি যোগ দিতে পারেননি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন। সংশোধনবাদ ও বাম হটকারিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় পশ্চাৎপদ উপজাতি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, জাতি উপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলায় তাঁর ঐতিহাসিক অবদান অবিস্মরণীয়। আদর্শ কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে তিনি একদিকে উপজাতীয়তাবাদ এবং অন্যদিকে উগ্রজাত্যভিমান দুই-এর বিরুদ্ধেই আপসহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কমরেড দশরথ দেব ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা (উপজাতি সংরক্ষিত) আসনে চারবার (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৭১) নির্বাচিত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার উন্নয়ন তথা উপজাতি জনগণের স্ব-শাসনের অধিকারের দাবিতে সংসদে তাঁর কণ্ঠ ছিল সোচ্চার। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই-এ তিনি ছিলেন ঐক্য-সম্প্রীতির স্তম্ভ স্বরূপ। সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক হিসেবে

কংগ্রেস (আই) টি ইউ জে এস শাসনকালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামেও তিনি নেতৃত্ব দেন।

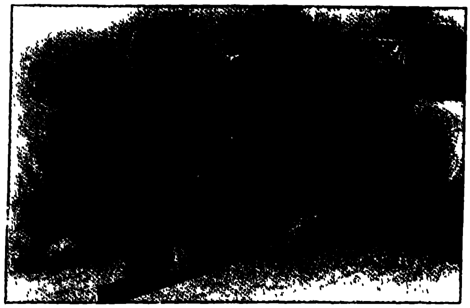
কমরেড দশরথ দেব রামচন্দ্রঘাট উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে রাজ্য বিধানসভায় একটানা চারবার নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৩ সালে)। ১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর তিনি হন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৯৩ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তিনি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান অসীম। প্রথমাবস্থায় টি ডি ব্লক গঠন এবং পরবর্তীকালে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

কমরেড দশরথ দেব তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রায় সাড়ে ছয় বছর আত্মগোপনে ছিলেন এবং কংগ্রেস শাসনে দীর্ঘদিন আটক ছিলেন কারাগারে। রাজ আমলে এ রাজ্যের শিক্ষা প্রসারে, উপজাতি ভাষা সংস্কৃতির বিকাশে, সামন্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং রাজ আমলের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সে সময় আন্দোলনের উপর নেমে আসে চরম দমন পীড়ন যার জন্য প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে তাঁকে সশস্ত্র সংগ্রামও পরিচালনা করতে হয়।

দশরথ দেব পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়াও ইংল্যাণ্ড, চীন এবং ইউরোপের প্রায় সব দেশ সফর করেন।

সুবক্তা এবং সুলেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি বাংলা ও ককবরক ভাষায় অনেক বই লিখেছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচনাশৈলী ছিল সাবলীল। প্রবন্ধকার হিসেবে সপরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত 'মুক্তি পরিষদের ইতিকথা', 'আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার গণ আন্দোলন', 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদের সংগ্রাম', 'ককবরকের জন্য বাংলা হরফ কেন চাই, এবং 'ককবরক লেখার পথরেখা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিংবদন্তি ঐতিহ্যের অধিকারী, ত্রিপুরার গণ-আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম মহান নেতৃত্ব, ত্রিপুরার উপজাতি-অনুপজাতি মানুষের মৈত্রী বন্ধনের মূর্ত প্রতীক কমরেড দশরথ দেবের জীবনাবসান ঘটে ১৯৯৮ সনের ১৪ই অক্টোবর। ভোর চার ঘটিকায় জি বি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভোরের সূর্যোদয়ের আগেই হঠাৎ সূর্যাস্ত হয় ত্রিপুরায়। কমরেড দশরথ দেবের জীবনাবসানে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। বাম আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, সুদক্ষ প্রশাসক, জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের সামগ্রিক বিকাশের অগ্রণী যোদ্ধা, উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক কমরেড দশরথ দেবের নাম ইতিহাসে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। কমরেড দশরথ দেব অমর রহে। ●



লেখক পরিচিতি

- **জ্যোতি বসু** — সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
- **হরকিষেন সিং সুরজিৎ** — সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর প্রবীণতম সদস্য এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
- **শৈলেন দাশগুপ্ত** (প্রয়াত) — সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক
- **বিমান বসু** — পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান, সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য
- **অনিল বিশ্বাস** — সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর সদস্য
- **বৈদ্যনাথ মজুমদার** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক, ত্রিপুরার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী
- **মানিক সরকার** — ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য
- **শচীন্দ্রলাল সিংহ** (প্রয়াত) — বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
- **বীরেন দত্ত** (প্রয়াত) — ত্রিপুরার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী।
- বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, প্রয়াত দশরথ দেবের সহপাঠী
- **দীনেশ দেববর্মা** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী
- **অঘোর দেববর্মা** (প্রয়াত) — সি পি আই কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ ও বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য
- **রঞ্জন রায় (প্রয়াত)** — বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য
- **সমর চৌধুরী (প্রয়াত)** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংসদ

- **ভানু ঘোষ (প্রয়াত)** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক
- **খগেন দাস** — সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সাংসদ, প্রাক্তন মন্ত্রী
- **অনিল সরকার** — তথ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন, তপশিলি জাতি ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- **সিতাংশুশেখর দাস** (প্রয়াত) — বিশিষ্ট লেখক, কবি, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা
- **প্রদীপ সরকার** — ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (এইচ বি রোড)-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
- **মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য, প্রয়াত দশরথ দেবের সহধর্মিণী
- **বিজন ধর** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- **অঘোর দেববর্মা** — সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমানে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য
- **বাদল চৌধুরী** — ত্রিপুরার অর্থ ও পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- **তপন চক্রবর্তী** — ত্রিপুরার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকম লীর সদস্য
- **গৌতম দাশ** — 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার সম্পাদক, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- **সরোজ চন্দ (প্রয়াত)** — প্রবীণ সি পি আই (এম) নেতা, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সভাপতি
- **জিতেন্দ্র চৌধুরী** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য, তপশিলি উপজাতি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি দপ্তরের মন্ত্রী
- **প্রাণেশ বিশ্বাস** — আসামের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা
- **ব্রজগোপাল রায়** — সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
- **মতিলাল সরকার** — সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য, রাজ্যসভার সদস্য
- **সুনীল দাশগুপ্ত** — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদের সদস্য

- **মুরারিমোহন সাহা** — আর এস পি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক
- **দুর্বাজয় রিয়াং** (প্রয়াত) — প্রাক্তন মন্ত্রী, সি পি আই নেতা
- **জ্যোতিষ সাহা** — সি পি আই (এম) উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
- **মোহনলাল সাহা** — বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও লেখক
- **রবীন সেনগুপ্ত** — ত্রিপুরার প্রথিতযশা আলোকচিত্র শিল্পী, বিশিষ্ট লেখক
- **হারাধন দেবনাথ** — প্রয়াত কমরেড দশরথ দেবের আপ্ত-সহকারী (সি. এ.), 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার সাংবাদিক
- **প্রবীর সরকার** — তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের কর্মী
- **সুরেন্দ্র পাল** — 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার সাংবাদিক
- **রমা দাস** — গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভানেত্রী, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য
- **সিরাজউদ্দীন আহমেদ** — বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
- **রমেন্দ্র বর্মন** (প্রয়াত) — বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব
- **সমীর পাল** — 'ডেইলি দেশের কথা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক, সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সদস্য
- **দীপক ভট্টাচার্য** — বিশিষ্ট লেখক ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দশরথ দেবের একান্ত সহায়ক
- **অশোক ভট্টাচার্য** — ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি

ত্রিপুরার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব (১৯১৬ - ১৯৯৮) ছিলেন ত্রিপুরার রবিন হুড, জনমানসে তুফান তোলা এক নায়ক, কিংবদন্তি এক ব্যক্তিত্ব।

রাজ আমলে এই রাজ্যে শিক্ষার প্রসারে, উপজাতি ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রাজন্য শাসনের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে দশরথ দেব ছিলেন এক অগ্রণী যোদ্ধা ও সেনাপতি। এ দেশে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত করে দিয়েছিলেন তিনি এক বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে (১৯৪৮-১৯৫০) নেতৃত্ব দিয়ে। একদিকে তিনি ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ, অন্যদিকে জাতি-উপজাতি জনগণের ঐক্য সংস্থাপনের কাজে এক নিরলস সংগ্রামী যোদ্ধা।

তাঁর জীবনের এই বহুমুখী, বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান প্রজন্মের কর্মীদের কিছুটা ধারণা দেবার লক্ষ্যে এই সংকলন। প্রবন্ধে, স্মৃতিকথায়, পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে, কবিতায় গড়ে উঠেছে এখানে 'নানা দশরথ দেবের মালা' যার সুগন্ধে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হবেন পাঠক।